শার্ল বোদলেয়ার
তাঁর কবিতা

Les Fleurs du Mal

অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা, কালপঞ্জি ও জীবনীপঞ্জি

বুদ্ধদেব বসু
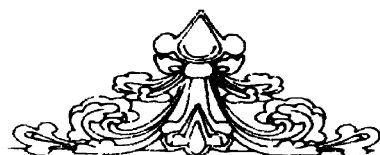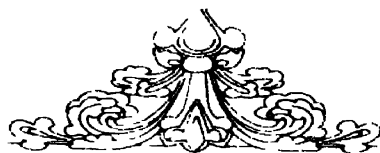
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা

বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

স্মরণে

এই অনুবাদগুচ্ছ

উৎসর্গ করলাম

১ ডিসেম্বর, ১৯৬০ বু. ব.

কলকাতা

অনুবাদকের বক্তব্য

'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৫৭) কবিতার সংখ্যা ছিলো একশো, আর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬১) একশো-উনত্রিশ। কবির মৃত্যুর পরে ১৮৬৮ সালে যে-তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে আরো অনেক রচনা সংযোজিত হয়েছিলো—যদিও প্রথম সংস্করণের ছয়টি দণ্ডিত কবিতা স্থান পায়নি, এবং কবিতাগুলিকে রচনার কালক্রম অনুসারে সাজাতে গিয়ে সম্পাদকেরা কবির একটি প্রধান অভিপ্রায় ব্যর্থ করেছিলেন। বিশ শতকে মুদ্রিত ও বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণগুলিতে কবিতার সংখ্যা কোথাও ১৫৮, কোথাও ১৬২, আর কোথাও বা—বেলজীয়দের উদ্দেশে রচিত ব্যঙ্গকবিতা যুক্ত হবার ফলে—১৯০-এর কাছাকাছি। 'Les Epaves' ('বেওয়ারিশ মাল') নামে যে-কাব্যগ্রন্থটি বোদলেয়ার ১৮৬৬ সালে বেলজিয়মে প্রকাশ করেন, তার অন্তর্ভূত কবিতাগুলিও (তার মধ্যে ছয়টি দণ্ডিত কবিতা ছিলো) 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর বর্তমান সংস্করণসমূহে গৃহীত হয়েছে। মোটের উপর ধ'রে নেয়া যায় যে কাব্যপ্রেমিকের পক্ষে আদরণীয় কবিতার সংখ্যা দেড়শোর কাছাকাছি বা কিছু বেশি ; তা থেকে একশো-আটটির অনুবাদ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হ'লো।

অধিকাংশ আধুনিক সম্পাদক 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর 'স্থাপত্য' বিষয়ে মনোযোগী, মূল সংস্করণে কবি নিজে যে-ভাবে কবিতাগুলিকে সাজিয়েছিলেন সেই পারম্পর্য তাঁরা ব্যাহত করেন না, কবি-কৃত খণ্ডবিভাগ ও খণ্ডগুলির নামকরণও মেনে নেন, শুধু তাঁর মৃত্যুর পরে সংযুক্ত রচনাবলি 'আরো কবিতা' নামে চিহ্নিত হ'য়ে থাকে। আমি অনুবাদ করেছি 'বিতৃষ্ণা ও আদর্শ' অংশের আটাশিটি কবিতার মধ্যে একষট্টিটি, 'প্যারিস-দৃশ্যে'র সতেরোটির মধ্যে চোদ্দটি, 'মদ' অংশের পাঁচটির মধ্যে চারটি, 'ক্লেদজ কুসুমে'র বারোটির মধ্যে আটটি, 'বিদ্রোহে'র তিনটির মধ্যে একটি, 'মৃত্যু'র ছয়টির মধ্যে সব ক-টি, এবং 'আরো কবিতা' (যার কবিতার সংখ্যা কোনো সংস্করণে পঁচিশ, কোনোটিতে উনতিরিশ এবং কোনোটিতে বা আরো বেশি) অংশ থেকে তেরোটি। তাছাড়া প্রথম কবিতা, 'পাঠকের প্রতি', যথারীতি স্বতন্ত্রভাবে স্থান পেয়েছে। যে-সব কবিতা বোদলেয়ারের প্রতিভূস্বরূপ, তাঁকে জানবার পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য এবং যেগুলি পরবর্তী কাব্যের উপর প্রভাবের জন্ত স্মরণীয়, তার কোনোটি যাতে বাদ না যায় সে-বিষয়ে সাধ্যমতো লক্ষ

রেখেছি। বলা বাহুল্য, নির্বাচনে আমার ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব এড়াতে পারিনি— কেনই বা তা এড়াতে চাইবো— কিন্তু আশা করি ফরাশিতে বা ইংরেজি অনুবাদে বোদলেয়ার যাঁদের পরিচিত তাঁরা তাঁদের বহু প্রিয় কবিতা এই গ্রন্থে খুঁজে পাবেন, এবং যাঁরা এই প্রথম বোদলেয়ার পড়ছেন তাঁরাও একেবারে নিরাশ হবেন না।

'ফ্ল্যর দ্য মাল'-এর প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ চোখে দেখার মতো সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু কবিতাগুলির সংস্থানে যে-সব সম্পাদক কবির মূল পরিকল্পনাটি অনাহত রেখেছেন, আমি তাঁদেরই অনুসরণ করেছি। শুধু একটি স্থলে আমাকে স্বাধীনতা নিতে হ'লো: গ্রন্থের শেষ কবিতা হিশেবে আমি স্থাপন করেছি 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা', যে-কবিতা, আমার মনে হয়েছে, উপসংহারের পক্ষে অনুপযোগী নয়। মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু কবিতা বর্জিত হবার ফলে কবির 'স্থাপত্য'কর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ-কথা ব'লে যাঁরা আপত্তি করবেন তাঁরা বোদলেয়ারে বিশেষজ্ঞ, আর এই গ্রন্থ তাঁদেরই উদ্দেশে রচিত, যাঁরা আমার মতোই সাধারণ পাঠক, কবিতা ভালোবাসেন ব'লেই কবিতা প'ড়ে থাকেন। তাঁদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে 'ফ্ল্যর দ্য মাল'-এর প্রতিটি কবিতার আমি অনুবাদ করিনি, ইচ্ছার অভাবে নয়, গ্রন্থের আকার সম্ভবপরতার সীমা ছাড়াবার আশঙ্কায়, অথচ চেষ্টা করেছি ন্যূনাধিক একশো কবিতার মধ্যে বোদলেয়ারের সম্পূর্ণ স্বাদ পৌঁছিয়ে দিতে। একই প্রেরণা থেকে চারটি বা পাঁচটি কবিতা যেখানে জন্মেছে, সেখানে আমি কোনো-কোনো স্থলে একটি বা দুটিকে বেছে নিয়েছি; আবার যেখানে মনে হয়েছে (যেমন 'মৃত্যু' অংশে) যে প্রেরণা এক হ'লেও প্রতি কবিতাই অনন্য, সেখানে একটিও বাদ দিইনি। 'মদ' অংশের ভূমিকাস্বরূপ প্রথম কবিতাটি ('L' Ame du Vin') আমার অপরিহার্য মনে হ'লো না; তেমনি, সুগন্ধ বিষয়ে এত উল্লেখ অন্যান্য কবিতায় ছড়িয়ে আছে যে 'Le Flacon' কবিতাটি বর্জন করতে আমার বিবেকে বাধেনি। কবিতার নির্বাচনকালে আমার মন কী-ভাবে কাজ করেছে তা বোঝাবার জন্য এই দুটি উদাহরণ দিলাম।

এই পুস্তকে গদ্য অংশ কিছু বেশি দিয়েছি, কেননা আমাদের দেশে বোদ-লেয়ার এখনো সুপরিচিত নন। ভারতে আমরা গত দেড়শো বছর ধ'রে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা ক'রে থাকলেও প্রায় একান্তভাবে ইংরেজি সাহিত্যেরই চর্চা করেছি; তুলনীয় ও সম্পৃক্ত অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগ বিশেষ পাইনি। এর ফলে আমাদের বিশ্ববোধ নির্জীব থেকে গেছে, ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানও যথাযোগ্য হ'তে পারেনি। অতএব আমার

মনে হ'লো এই অনুবাদ-গ্রন্থে যথাসম্ভব অকৃপণভাবে তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন, যাতে অনূদিত কবির দেশ, কাল, ব্যক্তিত্ব ও অব্যবহিত পরিবেশের চিত্রটি পাঠকের মনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে। বাঙালি পাঠকের সুবিধার জন্য কোনো-কোনো কবিতার সম্পর্কেও কথঞ্চিৎ টীকা যোগ ক'রে দিলাম; কতিপয় অপ্রচলিত উল্লেখ উদ্ধার ক'রে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন ফাদার পিয়ের ফালঁ, এস্. জে.।

কবিতার অনুবাদ বিষয়ে আমার কী ধারণা তা ইতিপূর্বে 'মেঘদূতে'র মুখবন্ধে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'প্রতিধ্বনি'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছি, এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন দেখি না। তবু, বোদলেয়ার অনুবাদ করতে গিয়ে যে-সব বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি সে-বিষয়ে দু-এক কথা বলা যেতে পারে। ফরাশি ভাষা আমি বিধিবদ্ধভাবে কখনো শিখিনি, কিন্তু অভিধান ও একাধিক ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে (প্রধানত নিউ ডিরেকশন্স ও রয় ক্যাম্বেল-এর সংস্করণ দুটি) প্রতিটি মূল রচনা প্রণিধান ক'রে নিয়েছি; লক্ষ রেখেছি, ইংরেজি অনুবাদ কোথায় এবং কী-ভাবে মূলকে লঙ্ঘন করেছে, এবং অনুবাদকালে বোদলেয়ারের নিজস্ব ভাষার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে ভুলিনি। অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাশিতে ঠিক ততটা হ'লেও, আমার এই অনুবাদগুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হ'তো না। নিশ্চয়ই এমন অনেক অংশ থেকে গেছে যেখানে অনুবাদ মূলের সঙ্গে হুবহু মেলে না—কিন্তু যে-কোনো অনুবাদেই সে-রকম অংশ অনিবার্য, এবং আমার তৃপ্তি এইটুকু যে ইংরেজি অনুবাদে অনেক স্থলে যে-সব ব্যতিক্রম দেখা যায় (বিশেষত মিলের ব্যাপারে), আমি, বাংলা ভাষার স্বভাবগুণে, তার অনেকগুলোকেই এড়াতে পেরেছি।

গ্রন্থের অন্তর্ভূত অধিকাংশ অনুবাদের রচনাকাল ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮; অল্প কয়েকটির প্রথম খশড়া সাত থেকে দশ বছর আগে 'কবিতা' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে-সময়ে 'আলবাট্রস', 'এক শব' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার গদ্য অনুবাদ ক'রে ছাপিয়েছিলাম; সম্প্রতি সেগুলিকে নতুন ক'রে ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়েছি। সর্বত্র অবিকল রেখেছি বোদলেয়ারের স্তবকসজ্জা ও মিলের বিন্যাস, চিত্রকল্পের ব্যবহারেও নিজেকে কোনো স্বাধীনতা নিতে দিইনি, যদিও বিশেষণ বা বিশেষ্যপদের সংখ্যায় বা সংস্থাপনে আক্ষরিক অনুকরণের চেষ্টা কোথাও-কোথাও অসম্ভব বুঝে ত্যাগ করেছি। বোদলেয়ারে কোনো-কোনো শব্দ অক্লান্তভাবে ফিরে-ফিরে দেখা দেয়: যেমন 'ennui',

'funèbre', 'volupté', 'mystique', 'azur'; এদের প্রত্যেকটিকে একই বাংলা শব্দের দ্বারা সর্বত্র প্রকাশ করা সম্ভব হ'লো না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণে 'ennui' অর্থে 'নির্বেদ' লিখেছি এবং 'নির্বেদ' ছাড়া অন্য কিছু লিখিনি; 'azur' অর্থে 'নীলিমা'র দাবিও চরম; কিন্তু 'volupté' বোঝাবার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে 'বিলাস', 'ইন্দ্রিয়বিলাস', বা অন্য কোনো অনুষঙ্গময় শব্দ, আর 'mystique' হয়েছে কোথাও 'অতীন্দ্রিয়', কোথাও 'রহস্যময়' আর কোথাও বা 'অলৌকিক'। তাছাড়া, বিশেষ্য কোথাও রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষণে, এবং বিশেষণ বিশেষ্যে; প্রতিটি স্তবকের সত্তা অব্যাহত থাকলেও পঙক্তিগুলির পারম্পর্যে বদল ঘটেছে। এর কারণ, বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষার প্রকৃতি, বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য, ও ছন্দ-মিলের অনুশাসন। সচেতন ও সকর্ণ পাঠক পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ করবেন; সম্প্রতি আমার নিজের কবিতায় যে-গুণটি বিরল হ'য়ে এসেছে এই অনুবাদকর্মে তা ব্যবহার করতে পেরে আমি আনন্দ পেয়েছি। অবশ্য ভাব-গম্ভীর কবিতার জন্য আঠারো মাত্রার পয়ার ভিন্ন উপায় নেই; কিন্তু 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর যে-সব কবিতা বিলাসী বা রতিমদির বা অসমান পঙক্তির স্তবক-বিন্যাসে হিল্লোলিত, সেখানে আমি ব্যবহার করেছি মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত, মাঝে-মাঝে বাউল-ছন্দ ও সাত-পাঁচের বিজোড় মাত্রা। যিনি ছিলেন ছন্দে ও মিলে পরম শিল্পী, যিনি বলতেন কবিতা লিখতে হ'লে প্রতিটি শব্দের প্রতিটি সম্ভবপর মিল না-জানলে চলে না, তাঁর উদ্দেশে বাঙালি কবির এই ছন্দোনিবেদন সৌজন্যসম্মত হবে ব'লে আমার মনে হ'লো। মোটের উপর, আমার বিশ্বাস এই অনুবাদগুলি বোদলেয়ারের ভাবনা বা অভিপ্রায় থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হয়নি, এবং উপমায়, চিত্রকল্পে ও প্রতিটি কবিতার রূপকল্পে এরা বিমুগ্ধভাবে মূলের অনুগামী। তাছাড়া, বাংলা ভাষার কবিতা হিশেবে এদের পাঠযোগ্য ক'রে তোলার জন্য আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি; কোনো-কোনো অনুবাদ তিন-চারবার নতুন ক'রে লিখে-লিখে তবে চলনসই গোছের দাঁড়িয়েছে। গত তিন বছর ধ'রে এরা যখন 'কবিতা'য় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন উভয় বাংলায় কোনো-কোনো তরুণ লেখক বোদলেয়ারের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ ক'রে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এই সুযোগে তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। আর প্রণতি জানাই সেই কবির অমর আত্মাকে, যাঁর সঙ্গজনিত অবিরল অনুপ্রেরণা ছাড়া এই অনুবাদ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ ক'রে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না।

এই পুস্তকে দুটি নতুন অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে : জ় ও জ়্। 'জ়'র উচ্চারণ ইংরেজি z-এর মতো, আর 'জ়্' মানে ফরাশি 'j' (zh), ইংরেজি 'pleasure' শব্দের s-এ যে-ধ্বনিটি বর্তমান।

অগস্ট, ১৯৫৯
কলকাতা

বু. ব.

বর্তমান সংস্করণের নিবেদন

শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো কুড়ি বছর আগে। পরে বুদ্ধদেব বসু, তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় অন্তর্ভুক্তিকালে, কোনো-কোনো অনুবাদের ঈষৎ পরিমার্জনা করেছিলেন ; তাদের সেই পরিমার্জিত রূপই এখানে ছাপা হ'লো। বানান এবং বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে যে-বদল ঘটেছিলো তাঁর পরবর্তী রচনায়, সেই বদলও, বুদ্ধদেব বসুর সংস্করণকালীন অভ্যাস অনুযায়ী, এখানে গৃহীত হ'লো। তাছাড়া মুদ্রণসংক্রান্ত যে-দু'একটি রীতি তিনি তাঁর রচনায় পরে শুরু করেছিলেন—যেমন, পৃষ্ঠার গোড়ায় কোনো স্তবক সূচীত হ'লে সেই স্তবকের প্রথম পঙক্তি একটু ভিতরে ঢুকিয়ে ছাপা—তাও এখানে অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এই সংস্করণ রচনা করলে, নতুন কোনো পরিমার্জনা না-ক'রে, এর যে-রূপ দিতেন বুদ্ধদেব বসু, তা-ই দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি। অনবধানতাবশত যে-অসংগতিসমূহ র'য়ে গেলো, এবং যে-সকল মুদ্রণপ্রমাদ, তার জন্যে আমি একান্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সংস্করণের প্রস্তুতিপর্বে কয়েকবার পাণ্ডুলিপি দেখবার সুযোগ দিয়েছেন প্রতিভা বসু ; তাছাড়া নানাভাবে সাহায্য করেছেন নরেশ গুহ, সুবীর রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগন্নাথ ভট্টাচার্য—তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অমিয় দেব

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

বলো আমাকে, রহস্যময় মানুষ, কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো :

তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, অথবা ভগ্নীকে ?

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী – কিছুই নেই আমার।

তোমার বন্ধুরা ?

ঐ শব্দের অর্থ আমি কখনো জানিনি।

তোমার দেশ ?

জানি না কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান।

সৌন্দর্য ?

পারতাম বটে তাকে ভালোবাসতে – দেবী তিনি, অমরা।

কাঞ্চন ?

ঘৃণা করি কাঞ্চন, যেমন তোমরা ঘৃণা করো ভগবানকে।

বলো তবে, অদ্ভুত অচেনা মানুষ, কী ভালোবাসো তুমি ?

আমি ভালোবাসি মেঘ ··· চলিষ্ণু মেঘ ··· ঐ উঁচুতে ··· ঐ উঁচুতে ···

আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল !

(শার্ল বোদলেয়ার : 'অচেনা মানুষ' :
'প্যারিস স্প্লীন'-এর প্রথম কবিতা)

ভূমিকা : শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা।' কথাগুলো লিখেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত পরবর্তী এক কবি, আর্তুর র‍্যাবো, তাঁর প্রথম সন্তানগণের অন্যতম। আর যেহেতু একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হ'লেও, ভ্রান্ত হ'লেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে), তাই আমি এই চিরচেনা উক্তি দিয়েই আমার এই বহুবিলম্বিত প্রবন্ধ আরম্ভ করছি। যে-পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে তা ছত্রে-ছত্রে বোদলেয়ারে ভারাক্রান্ত; দু-দিন আগে অন্য এক ব্যক্তিকে লেখা দোসর-পত্রটিও তা-ই; আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো, ব'য়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের উপর দিয়ে—কুঁড়ি ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, ফুল ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো মরা ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি অকালপক্ব রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলছে। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে,' 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়,' 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে,' 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হ'তে হবে মহা-রোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি ক'রে অজানায় পৌঁছনো!'—আবার বোদলেয়ারীয় জগতে প্রবেশ করছি আমরা, পান করছি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সারাৎসার; আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ' ও 'সিথেরায় যাত্রা', মদ ও মৃত্যুর কবিতাগুচ্ছ; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্যকবিতা ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র সেই সব অংশ (আর কোন অংশই বা তেমন নয়), যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে। আত্মসন্ধান, আত্ম-পরীক্ষা; দুঃখ, রোগ, মত্ততা; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়: সূত্রগুলি সবই বোদলেয়ারের, কিন্তু কণ্ঠস্বর নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন, তাঁর 'শৌখিনতা' বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্পচেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সন্ত-জেগে-ওঠা সহজ আত্মচেতনা, যার তীব্র চাপে সারা অতীত, রাসীন ও ভিক্তর উগো শুদ্ধ, বন্যার মুখে মস্ত বুড়ো গাছের মতো ধ্বংসে পড়ছে।

তখন ১৮৭১ ; ছয় বছর আগে, যখন পর্যন্ত বোদলেয়ার অন্তত শারীরিক অর্থে জীবিত, তেইশ বছরের যুবক মালার্মে একটি গদ্যকবিতায় প্রথম প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর গুরুকে, আর প্রায় সমবয়সী ভের্লেন ঘোষণা করেছেন যে 'ফ্ল্যর দ্য-মাল'-এর রচনারীতি 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন'। যে-খ্যাতিকে, আঁদ্রে জীদের ভাষায়, তাঁর জীবৎকাল এক পবিত্র শুদ্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভাবীকাল ছিনিয়ে নিয়েছে সেই নামটিকে, সহজীবীরা যার বানান পর্যন্ত নির্ভুল লেখার প্রয়োজন দ্যাখেননি। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করলেন উইসমান্স, ল্যমেৎর, লাফর্গ ; আর লণ্ডনে, রাইমার্স ক্লাবের পত্তনের সময়, ইয়েটস অনুভব করলেন যে, বোদলেয়ার ও ভের্লেনের অনুসরণে, 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে।' ইয়েটস ফরাশি জানতেন না ; তাঁকে আর্থার সাইমন্স প'ড়ে শোনাতেন ফরাশি কবিতা, আর তাঁর স্বকৃত অনুবাদ ; আর এমনি ক'রেই, বোদলেয়ারের প্রবর্তিত ধারা থেকে, ইয়েটস তাঁর নিজের কবিতার পক্ষে জরুরি দু-একটা ব্যাপার শিখে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের অভিঘাতে ইংলণ্ডে আরো প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিলো, সেই 'নব্বুই'-যুগের পীতাভ পাংশুতা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই ; কিন্তু সেই ব্যর্থতাও অন্তত পক্ষে নতুন একটি চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা সেটাই সেই সময়, যখন ইংরেজি ভাষার কোনো-কোনো লেখকের মনে এই সত্যটি প্রথম উঁকি দেয় যে টেনিসন থেকে সুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা শুধু রোমান্টিকদের চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন, যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ও সপ্রাণ কবিতার জন্য তাকাতে হবে সেই দেশের দিকে, যে-দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষতবিক্ষত এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় বহু দূরে পেছিয়ে-থাকা। এ-কথাও স্মর্তব্য যে বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, যখন পর্যন্ত তিমিরলিপ্ত ইঙ্গ-দ্বীপতটে দুই মার্কিন ত্রাতা এসে পৌঁছননি, তখনই ইয়েটস ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্ভব ক'রে তুলছেন ; আর প্রায় একই সময়ে এক রুগ্‌ণতনু জর্মান ভাষার কবি প্যারিসে ব'সে রচনা করছেন 'মাল্টে লাউরিড্‌স ব্রিগ্‌গে' নামক গদ্যগ্রন্থ, যার কোনো-কোনো অংশে বোদলেয়ারের স্তবগান ধ্বনিত হ'লো। আর তার পর থেকে পশ্চিমী কবিতায় এমন কিছু ঘটেনি, সত্যি যাতে এসে যায় এমন কিছু ঘটেনি, যার মধ্যে, কোনো-না-কোনো স্তরে বা সূত্রে, বোদলেয়ারের সঞ্চার আমরা দেখতে না পাই। আজকের দিনে কারোরই জানতে বাকি নেই যে তিনি শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা।

অনুভব না-ক'রে উপায় নেই পরবর্তী ফরাশি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে-আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্তনির্যাস। এবং শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে; তাঁর কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন রদাঁ, রুয়ো ও মাতিসের মতো শিল্পীরা; এবং রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে-ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি তিনি, এত বড়ো বৈদেশিক বিস্তার তাঁর আগে অন্য কোনো ফরাশি কবির ঘটেনি। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর, সাহিত্যিকেরা বংশপরম্পরায় তা ক'রে গেছেন, ইংরেজিতে এক-একটি কবিতার শতাধিক অনুবাদ পর্যন্ত হয়েছে। এই বাংলাদেশেও কোনো-এক লেখক, পঞ্চাশের প্রান্তে এসে, আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও, তাঁর কবিতার অনুবাদে অনেক ঘণ্টা, সপ্তাহ ও মাস সানন্দে নিবেদন ক'রে দিলেন। আজ, তাঁর জগৎ-জোড়া প্রতিপত্তির দিনে, এই কথাটা মেনে নেয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হ'য়ে গেছে যে তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা।'

২

কিন্তু 'প্রথম' কেন? 'দ্রষ্টা'—সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা; আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হ'তে পারেন? পারেন না তা নয়; অনেকে, শুধু রচনার নৈপুণ্যের বলে, কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন: ঈশপের ছন্দোবদ্ধ প্রকরণ লিখে লা ফঁতেন, সুবুদ্ধিকে আঁটো ঝিপদীর চুড়িদার পরিয়ে আলেকজাণ্ডার পোপ। ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদেরও কবি ব'লে মানতে বাধ্য; কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্টা, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের 'সমিল-গদ্যলেখক' ব'লেই জানেন। যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি', সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠলো, তখনও, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও, কবিতা ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারলে না, তার দেহে লগ্ন হ'য়ে রইলো আঠারো শতকের অনেক উচ্ছিষ্ট: জ্ঞানের ভার, উপদেশের ভার, হিতৈষণার জঞ্জাল। প্রভেদ এই যে 'আলোকপ্রাপ্ত' কবিরা মাস্টারি ধরনেই মাস্টারি করতেন, তাঁদের কবিতা ছিলো শিক্ষিত সালঁর সংলাপ, শ্রোতাদের বিষয়ে সচেতন; আর রোমান্টিকেরা উপদেশ দিতেন মন্ত্রের ভঙ্গিতে, প্রবক্তার ধরনে, আর তাঁদের কবিতা ছিলো

রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি। কবিতাকে এবার স্বগতোক্তি হ'তে হবে—সামাজিক আলাপ আর নয়—এই সূত্রটি তাঁরা ধরেছিলেন, কিন্তু 'স্ব' কথাটির অতিব্যাপ্ত অর্থ করেছিলেন তাঁরা। বলা যেতে পারে যে অকবি ও কবির মধ্যে যা তফাৎ, সেই তফাৎই পোপের সঙ্গে শেলির, এবং লা ফঁতেনের সঙ্গে ভিক্তর উগোর; আমরা মানতে বাধ্য যে রোমান্টিকেরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, তাঁরাও চেয়েছেন অদৃশ্যকে দেখতে এবং অশ্রুতকে শুনতে; কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধান-কর্তা', আর কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই, যা কবিতা নয় এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হ'তে পারেনি। জগৎটাকে বদলানো যে কবির কাজ নয়, এই ধারণা গোতিয়ে-র ছিলো, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা মনোমুগ্ধকর পদ্যের স্তর ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠতে পারেনি ব'লে, তাঁকেও পরিহার না-ক'রে তরুণ র‍্যাঁবোর উপায় ছিলো না। উপায় ছিলো না, উগোর উচ্ছ্বাস, লেকঁৎ দ্য লিল্-এর কারুকার্য ও গোতিয়ে-র এলাচগন্ধী সন্দেশের মতো উপভোগ্যতার পর, 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কবিকে প্রথম দ্রষ্টা ব'লে ঘোষণা না-ক'রে। র‍্যাঁবো যা বলতে চেয়েছিলেন (প্রায় তাঁর নিজেরই ভাষায় বলছি) তা এই যে রোমান্টিকেরা যা জানতেন না তা বোদলেয়ার জেনেছিলেন—যে কবি বক্তা অথবা প্রবক্তা নন, দ্রষ্টা, অর্থাৎ বিশ্বজগতে লুকায়িত সম্বন্ধসমূহের আবিষ্কারক, যে তাঁর স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীত ভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর স্বধর্ম। 'বাগ্মিতার শিরশ্ছেদ করো,' 'আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা'—ভের্লেন ও মালার্মের পক্ষে এ-রকম কথা বলা সম্ভব হ'তো না যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন।

রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। 'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির

নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো-কোনো যুগে—যেমন শেক্সপিয়রের ইংলণ্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুসোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠলো। আরম্ভ হ'লো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যে বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে-পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা ভালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষাব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্বয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমাংশে রোমান্টিকতার চেহারা ছিলো বন্যার মতো; যেমন তা অনেক বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলো তেমনি টেনে তুলেছিলো বহু আবর্জনা; মুছে দিয়েছিলো, উৎসাহের প্রথম নেশায়, অনেক প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান, যাকে ভের্লেন বলেছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্য', তার সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটিকে স্পষ্ট হ'তে দেয়নি। বাকি ছিলো বোদলেয়ারের জন্য এই কাজ—রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন; তার সব অবান্তরতা বর্জন ক'রে কবিতাকেই সর্বস্ব ক'রে তুললেন—তিনিই প্রথম। রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমণ্ডিত রচনা, যার কোনো-কোনো পঙক্তি বা অংশ কবিতা হ'লেও, অনেক অংশই কবিতা নয়; কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পঙক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ব ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত। তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্ল্যর দ্যু মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭।

আমি ভুলিনি যে পূর্ববর্তী অনেক কবিতে আধুনিকতার পূর্বাভাস আছে, তার কোনো-কোনো লক্ষণে তাঁরা সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডে ব্লেক, কীটস, কোলরিজ; জর্মানিতে নোভালিস ও হ্যেল্ডার্লিন; ফ্রান্সে নের্ভাল ও গোতিয়ে, আমেরিকায় পো এবং হুইটম্যান—এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিক থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হ'তে দেখেছি আমরা। কিন্তু এঁদের পাশে বোদলেয়ারকে যদি রাখি, আর বোদলেয়ারের কবিতার পাশে তাঁর শিল্প-সমালোচনাকে, তাহ'লে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিচ্ছিন্ন ও কিছুটা আকস্মিকভাবে, কবিতার যে-সব নতুন সূত্র এঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলিকে যেন এক আশ্চর্য শুভক্ষণে, বোদলেয়ার বেঁধে দিলেন এক অনন্ত গুচ্ছে, এমনভাবে সমন্বিত ক'রে দিলেন যাতে তা ভাবীকালের

ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠলো। এঁরা কী করছেন, এঁদের কৃতির কলাফল বা তাৎপর্য কী, সে-বিষয়ে এঁদের চেতনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ক্ষীণ অথবা খণ্ডিত; কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্ত তাঁর নিজের বিষয়ে ও কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। কোলরিজ কবিতাকে ত্যাগ করলেন, ব্লেক চাইলেন নতুন ধর্মের প্রবর্তক হ'তে, হুইটম্যান নিজেকে ধ'রে নিলেন বিশ্বমৈত্রীর দূতপ্রধান; অগ্রজদের মধ্যে একমাত্র যিনি সন্দেহ করেছিলেন—যদিও কাজে তা ক'রে উঠতে পারেননি—যে সবচেয়ে জরুরি কথা হ'লো কবিতাকে নতুন ক'রে তোলা, তিনি অ্যালান পো। আমরা জানি এই মার্কিন কবির বিষয়ে বোদলেয়ারের উৎসাহ ছিলো সীমাহীন, এবং পূর্বোল্লিখিত কবিদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী তাঁদের আর কারো সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিলো কিনা, তা আমরা জানি না। ব্লেক অথবা কোলরিজকে জানলে, মনে হ'তে পারে, তিনি পো-র দ্বারা অত দূব পর্যন্ত মুগ্ধ হতেন না; এবং এমন মতও আমরা শুনেছি যে এই মুগ্ধতার গূঢ় কারণ তাঁর (ও পরে মালার্মের) ইংরেজি ভাষায় যথোচিত জ্ঞানের অভাব। সত্য, বোদলেয়ার পো-র রচনায় অংশত এমন কিছু পড়েছিলেন যা তাতে নেই; কিন্তু তার জন্য দায়ী কি ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনভিজ্ঞতা, না কি তাঁর স্পর্শময় কবি-মন, যা অন্য এক সবর্ণ কবিকে নিজের মধ্যে শোষণ ক'রে নিতে উৎসুক? ভাষা এক হ'লেও, একজন কবি অন্য এক কবিকে দিয়ে নিজের কথাই বলিয়ে নিতে চান, ভাবনার কোনো স্তরে মিল দেখলে—বৈসাদৃশ্যগুলি ভুলে গিয়ে—তাঁকে কল্পনা ক'রে নেন নিজেরই বিকল্প ব'লে। আর পো-র বিষয়ে তা-ই করেছিলেন বোদলেয়ার। পো-র মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'সেই আধুনিক কবিকে, যিনি সর্বমানবের হ'য়ে দুঃখ পান'; অর্থাৎ, পো-র মধ্যে নিজেকেই দেখেছিলেন। স্মর্তব্য, তাঁর মনে প্রথম প্রবল নাড়া দিয়েছিলো অ্যালান পো-র দুঃখময় জীবন, আর তিনি অনুবাদ করেছিলেন প্রধানত পো-র গল্পকাহিনী, যার রহস্যময় ইন্দ্রিয়বিলাসে বোদলেয়ারের একাত্মবোধ অনিবার্য ছিলো। কবি হিশেবে দু-জনের মধ্যে তুলনার প্রস্তাব হাস্যকর; অনর্থক, বোদলেয়ারের কবিতায় পো-র 'প্রভাব' সন্ধান করা*, কেননা পো-র সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি অধিকাংশ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'

* প্রসঙ্গত উল্লেখ না-ক'রে পারছি না যে অ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি: 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me', এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বতঃপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ', এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু, যেমন 'হায়, চিল' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে

রচনা শেষ করেছিলেন। 'কবিতার মূলসূত্র' প্রবন্ধে পো দু-একটি অভিনব ও আমাদের পক্ষে আদরণীয় কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাতেও এমন কিছু নেই যা বোদলেয়ার স্বাধীনভাবে নিজেই আবিষ্কার করেননি। কবিতা দীর্ঘ হ'লে যে আর কবিতা থাকে না—যে-কথা কোলরিজও প্রকারান্তরে বলেছিলেন—তা বোঝার জন্য পো-পঠনের প্রয়োজন ছিলো না তাঁর; 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত ক'রে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে প'ড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি তাঁর—এই সবই নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ, কিন্তু এই কঠিন রূপকল্পের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন রোমান্টিকতার আত্মা—এক দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্য। আছেন রোমান্টিক ও ক্লাসিক গ্যেটে, রোমান্টিক ও ক্লাসিক রবীন্দ্রনাথ; দুয়ের পার্থক্য—অন্তত অস্পষ্টভাবে—আমরা অনুভব করতে পারি; এঁদের প্রত্যেক রচনায় সম্পূর্ণভাবে কবিদের পাই না। কিন্তু বোদলেয়ারের প্রায় প্রতিটি কবিতা—এবং অনেক গদ্যরচনাও—তাঁর পূর্ণ সত্তাকে ধারণ ক'রে আছে, আর সেইজন্যই তারা এমন প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময়; যিনি প্রথম বার 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' পড়ছেন তিনি প্রায় যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলেই উত্তীর্ণ হবেন এক অজ্ঞাতপূর্ব, রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে। 'আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে—একা আমি, গুরু নেই, নেই কাণ্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে'—এই হ'লো রোমান্টিকতার মর্মকথা; কিন্তু এর উচ্চারণ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের কারো কাব্যেই সে-রকম নয়।

অথচ, নানা দিক থেকে, রোমান্টিকদের সঙ্গে দুস্তর তাঁর ব্যবধান। রোমান্টিকেরা ভালোবেসেছেন গ্রাম ও গ্রাম্যতাকে; তাঁর ছন্দে প্রথম ধরা পড়লো, সব ক্লেদ ও সন্তাপ নিয়ে, আধুনিক নগরজীবনের চঞ্চলতা। প্রকৃতির, নগ্নতার,

বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছেন। জীবনানন্দর প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীকতা ও সমকালীনতায় (রূপসী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড়ো জিৎ উক্ত স্তবকের শেষ পঙক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।

স্বাভাবিকের পূজক ছিলেন রোমান্টিকেরা, আর বোদলেয়ার বন্দনা করেছেন প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার—তাঁর বিখ্যাত ড্যাণ্ডীজ্‌ম-এর অর্থই এই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন, 'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', সেখানে তরুণ বোদলেয়ারের নায়ক, বহুবাঞ্ছিতা প্রণয়িনীকে প্রথম বার বিবসনা দেখে, সরোষে প্রতিবাদ করে। রোমান্টিকেরা স্বাভাবিককেই সুন্দর ব'লে—এমনকি ভালো ব'লে—জেনেছেন, কিন্তু বোদলেয়ারের কাছে তা-ই শুধু শ্রদ্ধেয়, যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়। যে-কামকূপ নারীকে ভিক্তর উগো মহিমান্বিত করেছেন 'স্বর্গীয় ভাস্করের আঙুলে গড়া আদর্শ কর্দম' ব'লে, তাকে বোদলেয়ার বলেছেন 'প্রোজ্জ্বল ক্লেদ', 'স্বাভাবিক ব'লেই ঘৃণ্য'। 'নারী চায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, যৌন কামনার তৃপ্তি—অতএব সে ড্যাণ্ডির ঠিক বিপরীত'—তাঁর এই বাক্যটি আঠারো-শতকী যুক্তিবাদের যেমন বিরোধী, তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদেরও তেমনি প্রতিকূল। দুই যুগেরই উপাস্য ছিলো প্রকৃতি; কিন্তু যুক্তিবাদীরা প্রকৃতি বলতে বুঝতেন স্বভাবী ও সংগতকে, আর রোমান্টিকেরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তকে। আর উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ এই যে মানুষের মধ্যে সেই অংশই তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, যা স্বভাবের বিরোধী। যে-ভাষা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সংবাদ-জ্ঞাপনের নির্বিশেষ বাহনমাত্র, কেউ-কেউ, স্বভাবের বিরোধিতা ক'রে, তাকে রূপান্তরিত করেন ছন্দোবদ্ধ ও চরিত্রবান কবিতায়। যে-সব প্রাকৃত ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন অধিকাংশ মানুষের নিত্যকর্ম, কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে উপবাসী থাকেন বা ব্রহ্মচারী হন। শুধু কবিতা বা সন্ন্যাসই নয়; প্রকৃত পাপও চৈতন্যের ফল; তাই পাপকে বোদলেয়ার—প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন; তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, হুইটম্যানের মতো, পাপবোধহীন পশুদের প্রতি অনুরাগ। তাঁর কাব্যে নারী যেমন জৈবতার, পশু তেমনি মনোহীনতার প্রতীক; একমাত্র যে-পশুকে তিনি ভালোবেসেছিলেন সে গৃহপালিত মার্জার, যার দৃষ্টির বহুলাঙ্গ দ্যুতিকে প্রায় একটি শিল্পকর্ম ব'লে ভুল হ'তে পারে। রোমান্টিক গ্যেটের সব-পেয়েছির দেশ সেখানে, যেখানে নীলিমার নিচে, কালো পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে, জ্বলজ্বল করে সোনালি রঙের কমলালেবু; রবীন্দ্রনাথের, যেখানে প্রণয়ীযুগল আধো-আলোয় ঘুরে বেড়ায় আর 'পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা'; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে যেতে চান এক দর্পণশোভিত সুপ্রসাধিত ওলন্দাজ অন্তঃপুরে, যার জানলা দিয়ে দেখা যাবে—প্রকৃতির

দান তরুপল্লব নয়, বুদ্ধির সৃষ্টি অর্ণবপোত। ওঅর্ডস্বার্থ ভজনা করেছেন 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু'কে, রবীন্দ্রনাথ গাছ হ'য়ে জন্মাতে চেয়েছেন; আর বোদলেয়ার ইচ্ছা করেছেন সব উদ্ভিদের উচ্ছেদ, শিল্পিত ধাতু ও প্রস্তরময় এক প্যারিস। একটি পাখির পালক বা ফুলের পাপড়িকে রোমান্টিকেরা যেমন ক'রে বর্ণনা করেন, তেমনি সপ্রেম মনোযোগ বোদলেয়ার অর্পণ করেন আসবাব-পত্রে ও নারীর বেশবাসে; পর্দার বর্ণ ও ঘনতা, রেশম ও সাটিনের স্পর্শ, ধাতুর দীপ্তি, রত্নের রশ্মিময়তা—প্রথম তাঁর কাব্যেই মানুষের আত্মা এ-সবের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের ধারণাকে মূর্ত করেছিলেন উর্বশীতে, যার নাচের ছন্দে পুরুষের রক্ত 'আত্মহারা' হ'য়ে সাড়া দেয়, আর বোদলেয়ারের সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্ফিঙ্কসের মতো স্থির ও দুর্বোধ, যে বলে: 'পাছে রেখা ত্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা', আর যাকে দেখে কবিরা উদ্বুদ্ধ হন, রতিবিলাসে নয়, 'পাঠে ও কঠিন চিন্তায়'। 'ইন্দ্রিয়ে যখন আগুন ধরে তখন সৌন্দর্যকে বাহুবন্ধে বেঁধে ভগবানকেই আলিঙ্গন করি আমরা'—এই হ'লো যৌন বৃত্তি বিষয়ে উগোর ধারণা; কিন্তু বোদলেয়ার বলেন যে 'পাপকর্মের চৈতন্যই মহত্তর রতিসুখদার'। আর সর্বোপরি, রোমান্টিকেরা যেখানে কবিকে ভেবেছিলেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম স্থপতি ব'লে, সেখানে বোদ-লেয়ার কবিকে বললেন পরম ড্যাণ্ডি, যে দর্পণের সামনে দিনযাপন করে ও নিদ্রা যায়। দর্পণের সামনে: তার মানে, আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষাই কবি-কৃত্য; কবির চৈতন্য এমন ক্ষমাহীন যে ঘুমিয়েও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না। যে-মধ্য-উনিশ শতকে ইংলণ্ডে উপযোগবাদের অভ্যুদয় হ'লো, সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন যে কবি কোনো 'কাজে লাগেন' না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, অতএব একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস-স্প্লীন' ভ'রে তাদেরই দেখা পাই আমরা, যারা নির্বাসিত ও নির্যাতিত: বন্দী পশু, বৃদ্ধ ভাঁড়, উন্মাদ নারী, ভিনদেশী বেশ্যা, রোগী, মাতাল ও নাস্তিমানেরা—আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এদের সকলের সঙ্গেই কবির একাত্ম-বোধ নিবিড়, এবং এরা, এদের বাস্তব আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখেও, 'কবি' নামক ধারণাটিরই চিত্রকল্পের কাজ করছে। কবির বিষয়ে যে-বিশেষণটি বোদলেয়ার বার-বার ব্যবহার করেছেন তা 'পুণ্যবান' (pieux); কিন্তু তাঁর পুণ্য তাঁর কর্মে নয়, চৈতন্যে; সেই বিবেকময় চৈতন্যময় পুরুষ তিনি, যিনি, ডস্টয়েভস্কির

প্রিন্স মিশকিনের মতো, জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম, অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকেও তিলতম পরিবর্তন যিনি ঘটাতে পারেন না, অথচ নিজের মধ্যে নিখিলবেদনাকে ধারণ করেন। তাঁর কাজ জগৎকে বদলানো নয়, জগৎকে অনুভব করা। এবং সেই জ্ঞানের ও অনুভূতির শক্তিতেই তাঁর মহিমা।*

শুধু রোমান্টিক ও ক্লাসিকের ধারণাকে নয়, আরো কোনো-কোনো বিপরীতকে তিনি মিলিয়েছিলেন: কঠিন ছন্দোবন্ধের সঙ্গে ভাষার নির্ভার মৌখিকতা, এবং মৌখিকতার সঙ্গে অভিজাত শুদ্ধতাবোধ—যাকে লাফর্গ আখ্যাত করেন একাধারে 'ইয়াঙ্কি' ও 'হিন্দু' ব'লে। মিল ও স্তবকবিন্যাসের নৈপুণ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকদের সমকক্ষ; কিন্তু আপন ক্ষমতায় মোহিত হ'য়ে স্তবকসংখ্যা তিনি এমনভাবে বাড়িয়ে চলেন না যাতে রচনার আয়তন বৃদ্ধি পেলেও, কবিতার ক্ষতি হয়। তাঁর রচনায়, উগো বা রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রূপকরণের বৈচিত্র্য কম, আর এতেও বোঝা যায় তাঁর চরিত্র কত নির্লোভ ছিলো, কত বিনয়ী, রোমান্টিক অহমিকা থেকে কত সুদূর। নিরন্তর তাঁর ধ্যানের বিষয় তাঁর কবিতাই—কবিতা-রচনায় উপলক্ষের মতো যা কাজ করে, সেই জীবনীগত ঘটনা নয়—তাই আবেগের নিবিড়তম মুহূর্তেও উচ্ছ্বাসের হাতে ধরা দেন না তিনি, কবির উপরে কবিতাকে স্থাপন করেন। 'সুন্দর জাহাজ' কবিতাটি, যাতে একটি তরণী বা তরুণীর গতিভঙ্গি যেন ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তার মনোমুগ্ধকর দোলাচল, মাত্র দশ স্তবকে সীমিত হ'য়ে, এবং বহু একতাল সনেটের পরে এসে, আমাদের মনের মধ্যে এক অপূর্ব আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। যদি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যা কম হ'তো, বা স্তবকের বৈচিত্র্য আরো বেশি, তাহ'লে ঠিক এই অভিঘাতটি ঘটতো না; তাহ'লে হয়তো, দক্ষতায় বিস্মিত হ'য়ে কবিতাকে ভালো-বাসতে আমরা ভুলে যেতাম। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কোনো-কোনো লক্ষণ স্পষ্টত আঠারো-শতকী: আবাহন, সম্বোধন, অমূর্তকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা—এগুলি বোদলেয়ার বর্জন করেননি (কবিতার পক্ষে একেবারে বর্জন করা সম্ভবও নয়); তবু লক্ষণীয় যে 'O wild west wind' বা 'হে নূতন, এসো তুমি'-র মতো উচ্চস্বর তাঁর কাব্যে একবারও ধ্বনিত হয় না; তাঁর কণ্ঠস্বর নিরন্তর মৃদু, বাচন-ভঙ্গি স্বগতোক্তির; তিনি যখন বলেন, 'দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে' তা একটি

* এই অনুচ্ছেদে আমি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নাম করেছি, কেননা যদিও তিনি বোদলেয়ারের চল্লিশ বছর পরে জন্মেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক স্থান ওঅর্ডস্বার্থ, উগো শেলি প্রভৃতি য়োরোপীয় প্রথম-রোমান্টিকদেরই সঙ্গে।

অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়। 'মতো'-বিদ্বেষী হ'য়ে কবিতায় নূতনত্ব আনতে চাননি তিনি—তাঁর কাব্যে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রচুর—উপমাকে অনিবার্য জেনে তিনি উপমাকেই নতুন জন্ম দিয়েছেন। কী অর্থে নতুন, তার উপলব্ধির জন্য শুধু প্রয়োজন আমাদের পূর্বপরিচিত প্রিয় কবিতাগুচ্ছকে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করা। শেলির কবিতায় হেমন্ত ঋতু মূর্ত হ'য়ে ওঠে 'প্রেতের মতো পলায়মান, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ রাশি-রাশি ঝরা পাতা'র চিত্রকল্পে; আর বোদলেয়ার, আঁটিবাঁধা জ্বালানি কাঠ নামাবার শব্দে, শুনতে পান ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, কবরে পেরেক ঠোকার শব্দ, কার প্রস্থানের অলক্ষ্য পদপাত। যাকে রবীন্দ্রনাথ আবাহন করেন 'বন্ধু' ও 'জ্যোতির কনকপদ্ম' ব'লে, সেই সূর্য, বোদলেয়ারের কবিতায়, 'উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে/আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।' প্রভেদ শুধু এখানে নয় যে বোদলেয়ারের ভাষা ও ভঙ্গি অনেক বেশি ঘরোয়া, এবং তিনি অনুকম্পায় বিশ্বস্তর; গভীরতর প্রভেদ এই যে রোমান্টিকদের উপমা বর্ণনাধর্মী, আর বোদলেয়ারের উপমা উপমেয়র বিষয়ে যতটা বলে কবির আত্মার বিষয়ে ততোধিক। 'সাবিত্রী' প'ড়ে ধারণা হয়, কোনো-এক কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা জোগানোই সূর্যের কাজ; কিন্তু বোদলেয়ারের সূর্য খঞ্জকেও 'শিশুর আহ্লাদে' মাতিয়ে তোলে, এবং 'কবির মতো' হীন বস্তুকে মূল্য দেয়, অথচ খড়খড়ির আড়ালে কোনো-এক 'গোপন কাম'কে ব্যাহত করতে পারে না। কবিতাটির বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ও ভিন্নধর্মী তথ্যের সমাবেশে, এবং তথ্যগুলিকে পরস্পরে প্রবিষ্ট করার ক্ষমতায়; আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ কবি, রাজা, খঞ্জেরা ও গুপ্ত লম্পট—এদের সকলের মধ্যে বোদলেয়ারই বিরাজমান। চারটি 'বিতৃষ্ণা'য় ও একাধিক 'প্যারিস-চিত্রে' একই প্রক্রিয়া লক্ষ করি আমরা; কবিতার লেখক ও তথ্যের মধ্যে যে-ব্যবধান শেলি অথবা রবীন্দ্রনাথে অনুভাব্য, সেটি সরিয়ে দেবার ফলে বোদলেয়ারের উপমাসমূহে আত্মোদ্ঘাটনের গুণ বর্তেছে, যেন আত্মার কোনো গোপন স্থলে হঠাৎ আলো ফেলা হ'লো; তাঁর উপমাও এক প্রকার স্বীকারোক্তি। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করি 'সুন্দর জাহাজ' কবিতার সেই আশ্চর্য স্তবক:

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমাঘন এক পাঁচনে।

চলার সময়, বসনের আচ্ছাদনে, পদযুগ যে-ভাবে আন্দোলিত হয়, তার ছবিটি অতিকৃত সিনেমার মতো স্পষ্ট, অথচ উপমাটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির এই ধারণা যে যৌন কামনা যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয়, মদির ও মারাত্মক। তেমনি, 'কবরের মতো গভীর' বাসরশয্যা, 'দরগলমান গ্রেসিআরে'র মতো চুম্বনজনিত নিষ্ঠীবন, বা 'কামুক ঝর্নার মতো' কঙ্কালের 'লেস-বোনা গলবন্ধ'। রতি ও ধ্বংসের একতা বোদলেয়ারের মনে নিত্যজাগ্রত; মার্লো, রেনেসাঁসের সরল সন্তান, এক অমর পঙ্‌ক্তিতে মানবের এক শাশ্বত আকৃতিকে বিধৃত করেন; আর বোদলেয়ার, উনিশ শতকের নষ্ট, পরিশীলিত ও সজ্ঞান প্রতিভূ, যাতনাকে বর্জন ক'রে কামনাকে ভাবতে পারেন না। তাঁর কবিতায়, যেন 'make me immortal with a kiss'-এর প্রত্যুত্তরে, গরল ও ছুরিকা বলে :

> পারিস তার রাজ্য থেকে পালাতে
> আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
> কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
> বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া !

৩

যাকে বৈচিত্র্য বলে, বিস্তার বলে, এমনকি সাধারণত মৌলিকতা বলে, তার কিছুই বোদলেয়ারে নেই। ওঅর্ডস্বার্থের মতো, প্রায় পূর্ণ এক শতক পরে, তিনি নতুন একটি কাব্যরীতির প্রবর্তন করেননি; হুইটম্যানের মতো, কবিতার প্রকরণে ও বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করেননি অপূর্বতা; গোতিয়ে বা মালার্মের মতো কোনো গোষ্ঠীর গুরু নন তিনি; পাউণ্ড অথবা এলিয়টের মতো, কোনো 'আন্দোলনে'র নায়কও নন। এই মহত্তম ফরাশি কবিকে বিনয়ীতম কবিও বলা যায়; গোতিয়ে ও ভিক্তর উগোকে ভক্তি ক'রে পরিতৃপ্ত তিনি, স্যাঁৎ-ব্যভের তুষ্টিসাধনে অনবরত সচেষ্ট, এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণে পরিশ্রমী। স্বল্প তাঁর কাব্যের উপকরণ; মিল, উপমা, চিত্রকল্প, এমনকি শব্দের সংখ্যাও পরিমিত। 'নির্বেদ', 'শূন্যতা', 'গহ্বর'; 'সমুদ্র', 'জাহাজ', 'মাস্তুল'; 'শব', 'কফিন', 'কবর', 'কঙ্কাল'; 'তিক্ত', 'মধুর', 'কৃষ্ণ', 'শীতল', 'সুগন্ধি'; 'ডাইনি', 'পিশাচী', 'স্ফিঙ্কস'; 'গভীর', 'বিলাসী', 'অন্ধকার', 'উজ্জ্বল', 'রহস্যময়'—এ-সব শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ না-করা অসম্ভব। কোনো পঙ্‌ক্তির শেষে 'mer' (সমুদ্র) বা 'amer' (তিক্ত) থাকলে আমরা প্রায় ধ'রে নিতে পারি যে অন্তটি আসন্ন; 'ténèbre' (অন্ধকার) ও 'funèbre'-এর (funereal, বাংলায়

শোকাবহ বলা যায়) সহবাসেও অভ্যস্ত হ'তে হয়; té-প্রত্যয়ান্ত যে-কোনো বিশেষ্যপদের কাছাকাছি 'volupté'-র (ইন্দ্রিয়বিলাস) ব্যবহারও, তাঁর রচনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হ'লে, আর আশাতীত থাকে না। আর তাঁর কাব্যের বিষয় হিশেবে যা-কিছু উল্লেখ্য, তার একটি বড়ো অংশ—বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, কামোন্মাদ ও কামদ্রোহ, ইন্দ্রিয়বিলাস ও 'শয়তানপন্থা', দরিদ্র ও পতিতের জীবন, মৃত্যু ও দূরপ্রয়াণ—এই সবই, উত্তরাধিকারসূত্রে, উগো, গোতিয়ে, স্যাঁৎ-ব্যভের কাছে তিনি পেয়েছিলেন, পেত্রুস বরেল ও তেয়োফীল ও'নেভির মতো ঐকাহিক কবিদের কাছেও। তিনি, চিত্রকর কঁস্তাঁতা গী-র বন্ধু ও ভক্ত, যিনি সব ফ্যাশানকেই 'মনোমুগ্ধকর' বলেছিলেন, দেখেছিলেন প্রসাধনকলায় 'মানবাত্মার মহিমার একটি লক্ষণ', সাহিত্যিক ফ্যাশানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন তিনি: 'ড্যাণ্ডি', 'ছোটো গোষ্ঠী', 'তরুণ ফ্রান্স'—তাঁর বালকবয়সে উচ্ছ্রিত এই সব প্যারিসীয় চলোর্মির বেগেই তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধি; মনে হয় এ-সব গোষ্ঠী ও কবিদের পুঁজিপাটা সব তিনি তুলে নিয়েছিলেন—তাঁদের ইংরেজিয়ানা, বিতৃষ্ণাবোধ, মরণোল্লাস, কিছুই বাদ দেননি। হয়তো আরো বেশি বলা যায়: সমগ্র রোমাণ্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ ক'রে নেন—তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব সুদ্ধ, সেই বহুব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে-কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বহুনিন্দিত 'ক্লিশে' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিছুটা বদলে যায়; আমরা দেখতে পাই যে 'ক্লিশে'কে সভয়ে পরিহার ক'রে চলেন ক্ষুদ্র কবিরা, আর প্রতিভাবানেরা তাকে হাত পেতে নিয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমাণ্টিকতার সূত্রগুলিকে কেমন ক'রে তিনি রূপান্তরিত করলেন, আর তাঁর নিজস্ব সংযোজনাই বা কতটুকু, প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে তা-ই আমার আলোচ্য হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও—অথবা সেইজন্যেই—বোদলেয়ারই পরম রোমাণ্টিক, তাঁর কবিতা রোমাণ্টিকতার—'কামস্কাটকা' নয়—কৈলাস; রোমাণ্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত। তাঁর রচনায় রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা; তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্তস্থল, অথচ ঘন ও গভীর, আকারে ক্ষুদ্র হ'য়েও ইঙ্গিতে দূরপ্রসারী। কোনো দৈব বরপ্রাপ্ত রাজপুত্রের মতো, তিনি যেন সহজেই কবিতাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন: গ্যেটের দার্শনিকতা, হাইনের কৌতুক, গোতিয়ে-র চাপল্য, উগোর গুরুমশাইগিরি—এই সব সংকট

কাটিয়ে তিনি কবিতাকে ক'রে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভার ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য। এবং তাঁর উত্তরসাধকদের মধ্যেও, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই গুণগুলির সমন্বয় আমরা পাই না; তাঁর তুলনায় ভের্লেন কোমল, র‍্যাঁবো উদ্বেল, এবং মালার্মে নিস্তাপ। কবিতায় সাড়া দিতে পারলেই তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া যায়; কিন্তু মালার্মে ভাষ্যনির্ভর, এলিয়ট পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী, এমনকি ইয়েটস অথবা রিলকেরও কোনো-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা, তাঁদের জীবনী অথবা 'দর্শন' না-জানা পর্যন্ত, চাবি লুকিয়ে রাখে। তর্কাতীত এই কবিদের গৌরব, এবং এও স্বীকার্য যে দুর্বোধ্যতা, বিশেষ এক অর্থে, আধুনিক কবিতার মূল্য বাড়িয়েছে; কিন্তু যে-দুর্বোধ্যতা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা অতিক্রম্য, তাকে, শেষ পর্যন্ত, কবিতার একটি দুর্বলতা ব'লে আমরা মানতে বাধ্য। তাঁর কবিতার উঁচু মিনারটিকে বোদলেয়ার সোপানহীন ক'রে গড়েননি; তিনি বর্জন করেননি কাহিনীর সূত্র, চিন্তার পারম্পর্য, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা: আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাঁর কোনো-কোনো গদ্যকবিতাকে প্রায় ছোটোগল্প বলা যায়, এবং তাঁর প্রাবন্ধিক গদ্য প্রসাদগুণে দীপ্যমান। এই গুণটি, আমরা জানি, প্রতিভার অপরিহার্য লক্ষণ নয়, একই লেখকের গদ্যে ও কবিতায় তা সমানভাবে বিরাজ করে না, কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতা—এলিয়ট থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে—তাঁর গদ্যের মতোই সুলিখিত। অর্থাৎ, তাঁর কাব্যে হেঁয়ালি নেই, নেই অতিসূক্ষ্ম সাহিত্যিক বা আত্মজৈবনিক উল্লেখ; তাতে গভীরতরভাবে প্রবেশ করার জন্য যা প্রয়োজন তা মল্লিনাথগণের মন্তব্য নয়, তাঁরই সঙ্গে দীর্ঘতর, নিবিড়তর সহবাস;—তাঁর প্রতিটি কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোভাসিত। এবং সেইজন্যেই তাঁর আবেদন আজ বিশ্বব্যাপী।

৪

'রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যে এক বিরাট ঘটনা'—আমার এই উক্তির সমর্থনে এবার দু-একটি কথা বলতে চাই। ভাবতে অবাক লাগে যে শিল্পকলা, বহু সৃষ্টিশীল শতাব্দী ধ'রে, এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে অস্পৃষ্ট রেখে গেছে, যা মহত্তম অর্থে মানবিক। গ্রীক শিল্পে মৃদুহাস্য নেই; মানব-মুখে সভ্যতার এই আশ্চর্য স্বাক্ষরটি, যাতে বহু বিরোধী ভাব যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে, তা খ্রিষ্টপূর্ব দেহপূজকদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়নি। আর যদিও, রীমস ক্যাথিড্রলের 'সহাস্য দেবদূতে'র বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পে মৃদুহাসি উদ্ভাসিত হয়েছিলো, অন্য একটি ভাব, যা মৃদুহাসির সহচর ও পরিপূরক, মানবজীবনের বড়ো একটি তথ্য,

হিন্দু, গ্রীক, চৈনিক ও খৃষ্টান শিল্পের পূর্ণোত্তম সত্ত্বেও, যুগের পর যুগ প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। সেই ভাবটির নাম বিষাদ। বিষাদ, যা য়োরোপীয় রেনেসাঁসের একটি আবিষ্কার, যার প্রথম উদাহরণ পেত্রার্কার কবিতায়, তাকে, মানুষের এক জন্মান্তরক্ষণে, দা ভিঞ্চি হাসির মধ্যে দ্রব ক'রে দিলেন; কোনারকের বাদিনী-মূর্তির হাস্য যেমন আনন্দময়, তেমনি মোনা লিসার হাসি বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এমনকি বত্তিচেল্লির ভেনাসের মুখেও আমরা নির্ভুলভাবে বিষাদের আভাস দেখতে পাই, যার জন্যে মনে হয় যে প্রতীচীর আনুপূর্বিক শিল্পধারায়, প্রেমের দেবী এই প্রথম একটি আত্মা লাভ করলেন। রেমব্রাণ্টের সারি-সারি প্রতিকৃতি, সারি-সারি বিষণ্ণ চোখ খুলে রেখে, আমাদের ভুলতে দেয় না মানুষ কত রহস্যময়; আর শেক্সপিয়র, সাহিত্যে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁর বিশাল অর্কেস্ট্রার মধ্যে একটি মৃদু ও নিঃসঙ্গ বংশীধ্বনি মাঝে-মাঝে শুনতে পাই আমরা—যা ব'লে যায় মানুষের মনে এমন কোনো-কোনো স্বর আছে যা কার্যকারণের অতীত। যে-বিষাদ, বেন জনসনের নাটকে, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার মতো এক ধাতু বা 'humour' মাত্র, যান্ত্রিক ও বিবর্তনহীন এক উপসর্গ, তাকে শেক্সপিয়র দিলেন প্রাণ, গতি ও আধ্যাত্মিক অর্থ, প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি কুললক্ষণ ব'লে। হ্যামলেট, যাকে সাহিত্যে প্রথম আধুনিক মানুষ বলতে আমরা লুব্ধ হই, তার ব্যাপ্ত বিষাদের তবু একটা কারণ বা উপলক্ষ ছিলো; কিন্তু 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর অ্যাণ্টনিও চরিত্র—নাটকের প্রারম্ভেই যে ঘোষণা করে, 'In sooth I know not why I am so sad'—তার বিষয়ে কী ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? শেক্সপিয়রের আশ্চর্য এক সৃষ্টি এই অ্যাণ্টনিও, হয়তো আরো আশ্চর্য 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' নাটকের এনোবার্বস। যে-ঘটনাচক্রে অ্যাণ্টনিও প্রথম থেকে লিপ্ত, তাতে তার নিজের লভ্য বা অংশ বলতে কিছু নেই; য়োরোপীয় খৃষ্টান হ'য়েও, সে যেন বিশুদ্ধভাবে গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম ক'রে যাচ্ছে; যেমন সে অবিচলভাবে বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত হ'লো, সেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মিলনমোদিত পঞ্চমাঙ্কেও তেমনি অনাসক্ত সে; অন্যেরা যেখানে সুখী বা সন্তুপ্ত হয়, শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে, সেই রঙ্গমঞ্চে অ্যাণ্টনিও (নামকরণ অনুসারে যে নাটকের 'নায়ক') যেন অর্ধাচ্ছাদিত এক মূর্তি, তার পা যেন ভূমিস্পর্শ করে না, এক নেপথ্য থেকে আর-এক নেপথ্যে ভেসে যাবার সময়টুকুতে, তাকে বার-বার দেখেও, তার বিষয়ে আমরা কিছুই প্রায় জানতে পারি না: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝি না তার এই বীর্যনাশক বিষাদের উৎস কোথায়। আর এনোবার্বস যেন উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখি, যে কর্ম

করে না শুধু লক্ষ করে, চৈতন্যের প্রতিভূ সে; ঘটনাবহুল নাটকটির মধ্যে একমাত্র সে-ই কষ্ট পাচ্ছে নিজের অথবা প্রভুর কর্মফলে নয়, বিবেকের দংশনে; একমাত্র সে-ই নয় দাস অথবা রাজা, বীর অথবা আজ্ঞাবহ; আর সেইজন্যই, কোনো পূর্বচিহ্নিত স্থান নেই ব'লে, তাকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় 'কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান অর্জনে'র জন্য। আমরা মনে-মনে বুঝি যে এই স্থানটুকু 'অর্জন' করা তার পক্ষে অসম্ভব—কেননা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপের মধ্যে কোনোটাকেই সে বেছে নিতে পারবে না; কিন্তু তবু, চতুর্থ অঙ্কের সেই অবিস্মরণীয় ক্ষুদ্র দৃশ্যটিতে—যা মনে হয় শেক্সপিয়র তাঁর কলমের এক আঁচড়ে শেষ ক'রে নায়কনায়িকার গ্রন্থিমোচনের দিকে ছুটেছিলেন, অথচ যার মধ্যে মানবাত্মার এক মর্মবেদনা প্রোথিত হ'য়ে আছে—সেই দৃশ্যে তার প্রবেশমাত্র আমরা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যাই, কেননা তখন, রোমক কূটনৈতিকের ছদ্মবেশ সরিয়ে ফেলে, সে রেনেসাঁসের প্রতিভূ হ'য়ে দেখা দেয়; 'O sovereign mistress of true melancholy', চাঁদের উদ্দেশে এই একটি পঙক্তি উচ্চারণ ক'রে, আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চার করে এমন এক গভীর অনুভূতি, নাটকের ঘটনাসংস্থানে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-ক্ষণে এনোবার্বস কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক না আত্মহত্যা—এই সবই শেক্সপিয়র অস্পষ্ট রেখেছেন ব'লে আমাদের রহস্যবোধ আরো ঘনীভূত হয়; আমরা যেন অনুভব করি যে এই বিষাদ ও মৃত্যুর অর্থ শুধু এনোবার্বসের আত্মশুদ্ধি নয়, নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীদের পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত।

শিল্পকলার পূর্ব-ইতিহাসে আমরা কিছুই খুঁজে পাবো না, যা এই সব নিদর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে কষ্ট আছে, আর্তি আছে, মনস্তাপ আছে, কিন্তু বিষাদ নেই। ধ'রে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান; কিন্তু সে-বিষয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে, আর পূর্ণ বিকাশ রোমান্টিকতায়। লা রশফুকো বলেছিলেন যে মানুষ যদি প্রেমের কথা এত না শুনতো তাহ'লে সে প্রেমে পড়তো না। যা সাহিত্যে নেই তা জীবনেও অনুভূত হয় না: রেনেসাঁস-শিল্পে বিষাদের উদ্ভাস দেখে, তবে মানুষ জানতে পারলো যে বিষণ্ণ হওয়া তার স্বভাবের একটি লক্ষণ। এবং এই জ্ঞানকে যাঁরা চরমে নিয়ে গেলেন, তার সব সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখালেন যাঁরা, তাঁরাই রোমান্টিকতার প্রবর্তক। রুসো, শাতোব্রিয়াঁ, 'হ্বের্টে'র'-এর কবি গ্যেটে, জর্মান 'বিশ্ব-বিষাদ', বায়রনি জীবনক্লান্তি; অশ্রু, হতাশা, আত্মহত্যা;—এই সবের মধ্য দিয়ে অন্তত এই মহাসত্য প্রতিভাত হ'লো যে ভলতেয়ারি 'ক্ষেত্র-

কর্ষণ'ই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। রোমান্টিক অনুভূতি ততদূর পর্যন্ত পৌঁছলো যেখানে পুলকদেউলের মণিকোঠায় ঘোমটা-পরা বিষাদের দেবী বিরাজ করেন, আর বিষণ্ণতম সংগীতই মধুরতম হ'য়ে ওঠে।

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি?
হও রূপসী, বিষাদময়ী। অশ্রুজল
নতুন রূপে করুক তোমায় শ্রীমতী — ('বিষাদগীতিকা')

চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন। ('কোয়ারা')

ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন

বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
কোনো সন্ধ্যায়— নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী!—
ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি। ('সে-রাতে ছিলাম…')

বার-বার, বোদলেয়ারের কাব্যে, আমাদের পক্ষে এই সুপরিচিত ধারণাটি ধ্বনিত হয়েছে যে কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হ'তে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী' প্রায় সমার্থক, এবং যে-নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন। 'সৌন্দর্য', একটি 'স্ফুলিঙ্গে' তিনি লিখেছিলেন, 'আনন্দ তার এক ইতরোচিত ভূষণ, কিন্তু বিষণ্ণতা তার মহীয়সী পত্নী। যার সঙ্গে দুঃখের কোনো সম্বন্ধ নেই এমন কোনো সৌন্দর্য আমার ধারণাতীত।' প্রেমের পূর্ণতাও বিষাদসাপেক্ষ, কেননা, 'কখনো তাদের মিলন-সুখ এত মধুর হয়নি, যেমন বিষাদে ও ক্ষমায় ভরা সেই রাত্রে—দুঃখে ও মনস্তাপে পরিপ্লুত সেই সুখ।' এবং এ-সব ধারণায় তিনি তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদের সধর্মী।

কিন্তু বোদলেয়ারের অন্বেষণ আরো দূরস্পর্শী, মানবস্বভাবের আরো গভীরে তিনি নেমেছিলেন। রোমান্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে; আছে ব'লে নিন্দা করি না তাঁদের, কেননা বিলাস বস্তুটিকে শুধু সুখের আনুষঙ্গিক

ব'লে তাঁরাই ভাবতে পারেন যাঁরা আত্মার রহস্য বিষয়ে অজ্ঞান। তবু এ-কথাও স্বীকার্য যে বায়রনি বিষাদ একেবারে নির্তান নয়, এবং শেলির খেদময় উক্তি-সমূহ একটি বালকোচিত সরলতায় আচ্ছন্ন। শেলি, বায়রন, ওঅর্ডস্বার্থ—এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে, এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে; তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে প্রায় যেন এই ভাবটি ধরা পড়ে যে তাঁরাই একমাত্র ভালো এবং অন্য সবাই অসাধু। কিন্তু বোদলেয়ার সেই রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে তাঁর যন্ত্রণার কারণ তিনি নিজেই, এবং ডস্টয়েভস্কির নায়কনায়িকাদের মতো, দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্রয়োজন ব'লে অনুভব করেন। অর্থাৎ—আর এটাই রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য—যে-মানবস্বভাব রোমান্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ ব'লে। 'What man has made of man', তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন; তাঁর জিজ্ঞাসা: 'আমি নিজেকে নিয়ে কী করেছি?' ওঅর্ডস্বার্থ, তাঁর নিজের সুবিধেমতো, 'মানুষ' নামক ধারণাটিকে দুই অংশে ভাগ ক'রে নিয়েছেন, এবং নিজের উপর কোনো দায়িত্বই রাখেননি, কিন্তু এই নিশ্চিন্ত আক্ষেপের বদলে আমরা বোদলেয়ারে পাই 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা' বা গদ্যকবিতা 'রাত একটাতে'-র মতো রচনায় নিজের প্রতি ক্ষমাহীনতা, পাই, যেন বিশ্বমানবের মর্মপীড়া থেকে উত্থিত এই ক্রন্দনধ্বনি: 'ভগবান, ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি / দেখে নিতে আমার শরীর মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।' রোমান্টিকেরা আত্মকরুণা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা; তাঁরা দোষ দেন অন্যদের, তিনি নিজেকে; তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র—যার প্রভাবে সাপ পর্যন্ত নির্বিষ হবে—আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা আত্মশোধন; তাঁরা—ও পরে প্রকৃতিপন্থীরা—যেখানে পূজা করেছেন য়িহুদি সুবিচারের ধারণাকে, সেখানে বোদলেয়ার বেদি গড়েছেন খ্রিষ্টীয় করুণার জন্য। তাই তাঁর দরিদ্রবিষয়ক কবিতায় উগো অথবা ওঅর্ডস্বার্থের ভাবালুতা নেই; ঐ কবিদের মতো তিনি ভাবেন না যে দরিদ্র বা গ্রাম্য হ'লেই সাধু হবে, বরং তাঁর 'কেক' নামক গদ্যকবিতায় দারিদ্র্যের পৈশাচিকতার এক ভীষণ ছবি এঁকেছেন তিনি। সত্য, 'গরিবের চোখ' গদ্যকবিতায় ধনীর নিঃসাড়তাও দুঃসহ; কিন্তু 'ধনী' ও 'নির্ধন' শব্দ দুটিকে মানুষের অভিজ্ঞান ব'লে কখনোই তিনি স্বীকার করেননি; তাঁর লাল চুলের ভিখারিনীর চোখেও গৃধ্নুতা প্রকাশ পায়, বস্তিবাসী ন্যাকড়া-কুড়ুনিরাও সুরার প্রভাবে বীরত্ব লাভ করে, এবং ক্ষুধিতেরাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের স্বপ্ন দ্যাখে। আদিপাপে বিশ্বাসী ব'লে, তিনি কদর্যতা বা

মহিমায় ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন; বুঝেছেন যে শুধু তা-ই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

এবং একই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়—শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি; এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ—সেই বিরাট, বহুকথিত, বোদলেয়ারীয় নির্বেদ—যা 'ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।' নির্বেদকে তিনি বলেছেন 'জড়ের সন্তান', যার প্রভাবে 'সময়ের মন্থরতা' অসহ্য হ'য়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখণ্ড' মাত্র। কিন্তু আসলে—'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর ছত্রে-ছত্রে তার প্রমাণ আছে—এই নির্বেদেরও উৎসস্থল চেতনার অবলুপ্তি নয়, চেতনার আতিশয্য। চেতনা যার ক্ষীণ, সে-মানুষ তার নির্বেদকে 'অমরতার সমায়তন' ব'লে অনুভব করে না; আড্ডা, নেশা বা যৌনতায় ম'জে তা থেকে অব্যাহতি পায়। 'পশুর মতো ঘুম', চুম্বনলব্ধ 'বলীয়ান বিস্মরণ', 'সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি' তাঁর অনায়ত্ত ব'লেই এ-সবের জন্য বোদলেয়ারের প্রার্থনা এমন অবিরাম। সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকা নিয়ে, আমরা জানি, বহুবিধ পরীক্ষা তিনি করেছেন—প্রায়, তাঁর নিজেরই উপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; সে-সবের উদ্দেশ্য চৈতন্যেরই তীক্ষ্ণতা-সাধন; তিনি যেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন এক তুরীয় অবস্থা যাতে সময় পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হবে না, অনুভূত হবে প্রতিটি মুহূর্তের নিঃসরণ, শ্রুতিগম্য হবে বর্ণ, এবং শব্দ দৃশ্যমান। সফল হয়নি সে-সব পরীক্ষা, হ'তে পারে না—'কৃত্রিম স্বর্গে' তার নিষ্করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন—কিংবা শুধু সার্থক হয়েছে যন্ত্রণাকে তীব্রতর ক'রে, যে-যন্ত্রণা, অন্য সব অভিজ্ঞান যখন হারিয়ে যায়, চৈতন্যের সর্বশেষ প্রতিভূরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি, তাঁর পক্ষে যৌনতাও আত্মনির্যাতনেরই একটি উপায়; 'পাপকর্মের চৈতন্য' তার পরম সুখ; যদি তা পাপ হয়—আর বোদলেয়ারের তা-ই বিশ্বাস ছিলো—তাহ'লে তাকে পাপ ব'লে জানতে পারাটাই মনুষ্যত্ব*। 'কঙ্কাল', 'সিথেরায় যাত্রা', 'এক

* ইতিহাসের একটি কৌতুক এই যে যৌনতান্বেষী বোদলেয়ার তাঁর জীবৎকালে—এবং মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত—সাধারণের মনে চিত্রিত হয়েছেন যৌনতার একটি 'রাক্ষস' রূপে; অনুরাগী পাঠকরাও তাঁকে 'গণিকালয়ের সন্ত' ব'লে ভুল করেছেন। এও স্মর্তব্য যে পো, কোলরিজ বা ডিকুইন্সির মতো তিনি জীবনের কোনো অধ্যায়েই নেশার দাসত্ব নেননি, এবং নেশার প্রভাবে চৈতন্যের কী অবস্থা হয় তার অমন নির্মম বিশ্লেষণ ডিকুইন্সিতেও নেই। ডিকুইন্সির 'কনফেশন্স' প'ড়ে যাঁরা অহিফেনসেবনে লুব্ধ হবেন তাঁদের মোহভঙ্গ হবে 'কৃত্রিম স্বর্গ' পাঠ করলে। বস্তুত, বোদলেয়ারের চরিত্র ছিলো যুগপৎ বিলাসীর ও সন্ন্যাসীর; তাঁর কাব্যের তীব্রতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বপ্রসূত।

শহীদ', এই সব কবিতায়, নানা ভয়াবহ চিত্রকল্পের সাহায্যে, তিনি তাঁর এই ধারণাটি উপস্থিত করেছেন যে কামনা ও যাতনা অন্যোন্যনির্ভর; কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্মল ও নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি পাই 'আত্ম-প্রতিহিংসা' নামক কবিতাটিতে:

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
আমি জল্লাদ, আমিই বলি।

রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো; ছিলো, কৃতী যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রণীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা; কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন নিষ্পাপ হরিণ ও 'পৃথিবী'কে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু বোদলেয়ার যেহেতু নিজেকে একাধারে বলি ও জল্লাদ ব'লে উপলব্ধি করেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশি সত্যবাদী, এবং দুশ্চিকিৎস্য।

কিন্তু অচিকিৎস্য নয়। 'প্রগতি'—অর্থাৎ রোমান্টিক সংস্কারস্পৃহার প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর 'উন্মোচিত হৃদয়ে' লিখেছেন—'সত্যকার প্রগতির অর্থ নৈতিক প্রগতি, এবং তা সাধিত হ'তে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।' 'সত্যকার সভ্যতা,' একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠা পরে আমরা পড়ি, 'আদি-পাপের লক্ষণহ্রাসেরই নামান্তর।' মানুষের পাপবৃত্তি যদি অমর হয়, তাহ'লে পুণ্যের প্রতি তার আকর্ষণও মৌলিক, এবং পাপলিপ্তি অনিবার্য হ'লে, পুণ্যের দিকে অগ্রসৃতিও সম্ভব। 'মাতাল হও,' একটি গদ্যকবিতায় তাঁর আজ্ঞা শুনি আমরা, 'সুরা, কবিতা, পুণ্য, যার দ্বারাই হোক, মাতাল হও।' 'ভগবান যদি না-ও থাকেন,' 'স্ফুলিঙ্গে'র প্রথম উক্তিটি এই, 'তাহ'লেও ধর্ম কম পবিত্র নয়।' আর 'উন্মোচিত হৃদয়ে', শেষ পর্যন্ত, তাঁর সব অবমাননাকে 'ঈশ্বরের করুণা' ব'লে তিনি অঙ্গীকার করেন, লিপিবদ্ধ করেন এই অভিলাষ যে 'দিনে-দিনে, নিজের ধরনে, মহাপুরুষ ও সন্ত হ'য়ে উঠতে হবে,' কেননা 'তা-ই একমাত্র, যাতে এসে যায়।' কেমন ক'রে, পাপ থেকে স'রে এসে, মানুষ পুণ্যের দিকে পা ফেলতে পারে, তাঁর মনে এই চিন্তা ছিলো নিত্যজাগত। কোনো সংঘবদ্ধ উপায়ে, কোনো সামাজিক 'প্রগতি'র দ্বারা তা সাধিত হ'তে পারে না, তা সম্ভব শুধু 'ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে'। অতএব তাঁর 'বিতৃষ্ণা'র পাশে তাঁ' 'আদর্শ'কেও স্থাপন করতে হ'লো—একটি না-থাকলে অন্যটির অর্থ থাকে না—রতিপ্রতিমা 'কৃষ্ণ ভেনাস'-এর মুখোমুখি এক 'শ্বেত ভেনাস', ম্যাডোনা যিনি,

সরস্বতী ও দেবদূত, ভোগক্লান্ত 'আধ্যাত্মিক উষা'য় মানসপটে যাঁর মূর্তি 'সূর্যের মতো' প্রতিভাত হয়, এবং যাঁর উদ্দেশে, বহু নরক মন্থন করার পর, ধ্বনিত হয় এই নম্র স্তবগান :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা খেঁয়োরির ক্ষণে লম্পটের অনুতাপ নয়, বহু বিপরীতকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন তেমন এক ভাবুক ব্যক্তির মুমুক্ষা। 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র 'সংশোধক'রূপে এলিয়ট প্রস্তাব করেছেন 'ভিটা নুওভা' ও 'ডিভাইন কমেডি'; তাঁর কথার আমরা এ-রকম অর্থ করতে পারি যে বোদলেয়ারে নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই, আর সেখানেই তাঁর কাব্যের ঊনতা। কিন্তু নরক, শোধনাগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিকভাবে সত্য ছিলো, আধুনিক মানুষ বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না; বরং তাঁর বিশেষ গৌরব এখানেই যে, শেক্সপিয়র ও ডস্টয়েভস্কির মতো, তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর ব'লে চিনেছিলেন : ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ—এই বিরোধী ভাবগুলি, তাঁর ধারণায়, পরস্পরসংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। 'মানবহৃদয় সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম চিরকাল ধ'রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে,' দমিত্রি কারামাজভ-এর এই ঘোষণার পাশেই প্যারিসীয় কবির উচ্চারণ স্মর্তব্য : 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, নিরন্তর, দুই যুগপৎ আসক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে—একটি ঈশ্বরের, অন্যটি শয়তানের প্রতি।' যে-মহিলাকে 'অমৃতের প্রতিমা' জ্ঞানে বোদলেয়ার নমস্কার জানিয়েছেন তাঁরই উদ্দেশে যখন তিনি বলেন, 'আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা?' তখন ঐ প্রশ্নের পিছনে অনুক্ত কথাটি আমাদের অজানা থাকে না; তিনি চান 'আনন্দময়ী'ও জানুন কাকে বলে ব্যাধি, দুঃখ ও বিতৃষ্ণা, আর কাকে বলে মৃত্যুভয়, নয় তো তাঁর মানবতা খণ্ডিত থেকে যাবে। এই বৈপরীত্যবোধ, বা বিপরীতের সংযুক্তি-বোধের আর-একটি উদাহরণ 'ভ্রমণ' কবিতা—যার রঙ্গমঞ্চ সমগ্র নরজীবন; ঘাতক যেখানে সপ্রেম, উৎসব শোণিতগন্ধি, শক্তিমানেরা অবসাদগ্রস্ত, এবং সন্ন্যাসীর 'চটের কণ্টক' কামস্রাবী। স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে, বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই; নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো, ঈশ্বরের

সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা; কিন্তু তার সমগ্র দেহ থেকে, মেঘের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মতো, তীব্র, প্রোজ্জ্বল ও পৌনঃপুনিক, এই সত্যটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষ্যত্বের পরম অভিজ্ঞান। দান্তের কাব্যে কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছনো আছে; আর বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ, যা আমাদের মনে হয় আরো বেশি মানবিক ও মনস্তত্ত্বের অনুগামী। বোদলেয়ারের দুঃখ, সর্বশেষ বিচারে, অমৃতের জন্য বিরহবেদনা ছাড়া আর-কিছু নয়—মানুষের সব দুঃখই মূলত তা-ই—আর সেইজন্যই, গভীরতম আধ্যাত্মিক অর্থে, তাঁর দুঃখ মূল্যবান. শুধু প্রেম বা সৌন্দর্য নয়, তার দ্বারা প্রজ্ঞাও লভ্য। 'হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও'—এই পবিত্র দীর্ঘশ্বাস শেলি অথবা বায়রনে আমরা শুনি না, এবং বোদলেয়ারে শুনি ব'লেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর দুঃখসাধনা কত সার্থক।

৫

রোমান্টিক বিষাদের চরিত্রলক্ষণ এই যে তা অহেতুসম্ভব। কোনো কারণ যদি নির্দেশ করা গেলো তাহ'লেই ছিন্নমূল হবে সেই বিষাদ, যা, বর্ষার আকাশে মেঘের মতো, অলক্ষ্যে, অগোচরে, স্তরে-স্তরে, সমগ্র সত্তায় ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। হেতু যে নেই সেটাই তার অস্তিত্বের হেতু। 'আমার মন ভালো নেই।' 'কেন?' 'জানি না।' 'আমি একজনকে ভালোবাসি।' 'সে কে?' 'কী ক'রে বলি। আমি কি তাকে দেখেছি?'—এই যুক্তিরহিত মনস্তত্ত্ব, আরব, বৈষ্ণব ও ত্রুবাদুর মরমীরা যার আভাস দিয়ে গেছেন, য়োরোপের যুক্তি-যুগের অবসানকালে তা সংহত ও বলীয়ানভাবে প্রকাশ পেলো রুসোর সেই প্রখ্যাত বাক্যাংশে, যার অনুকম্পন পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে অবিরল। 'Je ne sais quoi'—আমি জানি না কী—যা শেক্সপিয়রের অ্যান্টনিওতে ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি—এই কথাটি রোমান্টিকতার মূলমন্ত্র। বাঙালি পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথে 'অকারণ' বিশেষণটি অসংখ্যবার ধ্বনিত হয়েছে—এক-এক সময় প্রায় অকারণেই; মনে করিয়ে দিতে হবে না যে 'কী জানি', 'কে জানে', 'না জানি' প্রভৃতি সমাবেশ তাঁর শব্দরচনার মধ্যে সবচেয়ে ক্লান্তিহীন, যে এই অস্পষ্ট ব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যকে সেই আস্বাদ দিয়েছে যাকে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক ব'লে আমরা চিনতে পারি। 'নিশীথে কী ক'য়ে গেলো মনে / কী জানি, কী জানি'—ঠিক এই রকম সূচিমুখ অস্পষ্টতা অধিকতর যুক্তিনির্ভর য়োরোপীয়

ভাষায় সম্ভব না-হ'লেও, পশ্চিমী রোমান্টিক কাব্যে তুলনীয় মনোভাব আমরা অনেক পেয়েছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে মানুষের মনের প্রক্রিয়ায় সত্যি কিছু অহেতুক হয় কিনা, এবং কবিরা যখন তাঁদের পুলক অথবা বিষণ্ণতাকে 'অকারণ' ব'লে ঘোষণা করেন, সেটাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে, না কি উৎপ্রেক্ষা হিশেবে গ্রহণ করবো।

রোমান্টিক কবিরা দূরপ্রেমিক; বৈষ্ণব কবিদের মতো, কিন্তু কিছুটা ভিন্ন অর্থে, তাঁরা 'ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর' করেছেন—কিংবা কোনোখানেই বাসা বাঁধেননি। পার্নেসিয়ান, সিম্বলিস্ট, প্রি-র‍্যাফেলাইট—নাম যা-ই হোক না—টেনিসন ও ইংরেজ 'চার্টিস্ট'দের বাদ দিয়ে সমগ্র উনিশ শতকের কবিতাই এই লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত। যেমন পেত্রার্কার আগে, নিছক কৌতূহলবশত, কেউ কোনো পর্বতে আরোহণ করেনি, তেমনি অন্য কোনো যুগে, নিরন্তর দিগন্তরেখা দেখেও, মানুষ এমন ক'রে দিগন্তকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি পাহাড়ের ওপার বা সমুদ্রের অন্য তীর। 'জীবনকেন্দ্রে গ্রামের বদলে নগর, সমাজে স্থিতির বদলে অস্থৈর্য এলে এমনিই হয়'—এই ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হ'তে পারি না আমরা, কেননা আথেন্স বা রোমেও নাগরিক জীবন ছিলো, রোমের ছিলো বহু বৈদেশিক সংস্রব, কিন্তু সাহিত্যে এই দূরতৃষ্ণা ছিলো না। কিংবা, রোমান্টিকদের 'বিরুদ্ধে' যীশুর এই অনুজ্ঞা উপস্থিত ক'রেও লাভ নেই যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে, কেননা নিকটের প্রতি ঈর্ষা যেমন মানুষের একটি কুবৃত্তি, অপরিচিতের প্রতি অবিশ্বাসও তা-ই। রোমান্টিকেরা, সন্দেহ নেই, দূরকে ভালোবেসে মানুষের সংবেদনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন অসীমের দিকে একটি বাতায়ন। এই দূর, দেশে বা কালে বাস্তব আকার পেয়েছে মাঝে-মাঝে: প্রাচীন গ্রীস, খ্রিষ্টান মধ্যযুগ, ইটালি, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত—এরা প্রত্যেকে, কোনো-না-কোনো সময়ে, ধারণ করেছে রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে, আসলে যার কোনো আধার নেই। আধার নেই—কেননা ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে, বা কোনো ভৌগোলিক মণ্ডলে, হৃদয়ের 'আদর্শ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কল্পলোক কল্পনাতেই থেকে যায়; শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতিবেগ, শুধু সন্ধান, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ওভিদের বিখ্যাত উক্তি, 'অজানাকে কেউ ভালোবাসতে পারে না'*—এই ক্লাসিক সূত্রের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ ক'রে রোমান্টিকেরা তারই জয়ধ্বনি তুললেন যা অজানা ও অসীম, অনির্ণেয় ও অপ্রাপণীয়। যা সীমিত,

---

* ওভিদের 'বিষাদ' কাব্যে যে-কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, বা 'মেঘদূতে'র যক্ষের মুখে যে-অশ্রুল বিলাপ আমরা শুনতে পাই, তার বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে রোমে অথবা অলকায় প্রত্যাবর্তনমাত্র

তাকে শাতোব্রিয়াঁর নায়ক কোনো মূল্য দেয় না, এক 'অজানা' তাকে নিরন্তর তাড়না করে। 'আমি বাসনায় দগ্ধ হচ্ছিলাম,' রুসো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কিন্তু বাসনার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিলো না।' এই মনোভাবের চরম পরিণতি কোনখানে তাও রুসোরই একটি মুখের কথায় ধরা পড়েছে: 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়।'

শুধু যদি আমরা চিন্তা করি যে রোমান্টিক কাব্যে বায়ু অথবা ঝটিকা কত বার এবং কত বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তাহ'লেই আমাদের সন্দেহ থাকে না যে গতিসাধনা রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। ওঅর্ডস্বার্থের 'ইমর্টেলিটি', কোলরিজের 'ডিজেকশন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড' ও রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'— এই চারটি প্রতিভূস্বরূপ কবিতা, বাতাসকে অবলম্বন ক'রেই, তাদের আবেগের চাপ সহ্য করতে পেরেছে। অন্যান্য প্রিয় চিত্রকল্পের মধ্যে নৌকো বা জাহাজ উল্লেখ্য, আর স্রোত, নির্ঝর বা নদী। তিনটি যাত্রার কবিতা অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত আছে আমাদের মনে: বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ', র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ও রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। নানা রূপে ভ্রমণে আমরা অভিজ্ঞ হয়েছি: স্কটে ঐতিহাসিক, বায়রনে ও শাতোব্রিয়াঁতে ভৌগোলিক, কোলরিজে আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত, বোদলেয়ারে ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক। আর রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাকে একত্র ক'রে নিয়ে 'ভ্রমণ' নাম দিলে ভুল হয় না; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে 'পূরবী'র 'ঝড়' পর্যন্ত এক অবিরাম আন্দোলনে আমরা প্রহৃত হচ্ছি; ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে; ঔপনিষদিক ভারত, কালিদাসের কাল, মোগল-পাঠানের ভারত, বহুলক্ষণযুক্ত ভৌগোলিক পৃথিবী—এক-একটি স্তম্ভ রচনা ক'রে দিয়ে একে-একে এরা স'রে যাচ্ছে; আর যা স্থায়ী, যা অনবরত ও অপ্রতিহত, যা তাঁর উদ্‌ভ্রান্তিজনক বৈচিত্র্যের মধ্যে ভক্ত পাঠকের আশ্রয়স্বরূপ, তারই নাম তিনি যৌবনে দিয়েছিলেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। লক্ষণীয়, ঐ কবিতার যাত্রা শুধু নিরুদ্দেশ নয়, রহস্যময় কাণ্ডারিণীটি বিদেশিনী। এবং সেই নারীও 'বিদেশিনী', যাকে—আসলে চেনেন না ব'লেই—কবি চেনেন ব'লে আপন

তার চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু রোমান্টিক কবি নিজেকে অনুভব করেন আদিস্বর্গ থেকে নির্বাসিত ব'লে—শুধুমাত্র কোনো রাজধানী বা ভূখণ্ড থেকে নয়। তাই, নিজে লাতিন সংস্কৃতির প্রেমিক ও উত্তরাধিকারী হ'য়েও, বোদলেয়ার বলতে পারেন:

বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন স্বর্গ থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না। ('অনুকম্পায়ী ত্রাস')

ক্রন্দনের এত গভীরতর কারণ আছে যে 'লাতিন স্বর্গ' সে-তুলনায় তুচ্ছ; তাঁর 'দুরদৃষ্ট' মৌলিক।

মনে অনুমান করেন, 'শারদপ্রাতে' বা 'মাধবীরাতে' মাঝে-মাঝে যাকে দেখা যায়, আর যার কাছে, শেষ পর্যন্ত, অতিথির অধিক মর্যাদা মেলে না। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে / এসেছি নূতন দেশে / আমি অতিথি তোমারি দ্বারে / ওগো বিদেশিনী'— এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে একাধিক ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত; 'ভুবনভ্রমণ' শেষ ক'রে যদি 'নূতন' দেশে আসা যায়, তার মানে সেই 'দেশ' পৃথিবীর বাইরে, এবং যা পৃথিবীর বাইরে তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই। 'আমি অতিথি তোমারি দ্বারে—' অতিথি, অর্থাৎ অস্থায়ী আগন্তুক; এবং সে 'দ্বারে' মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করছে প্রবেশের অধিকার, সে-প্রার্থনা পূরণ ক'রে দ্বার মুক্ত হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। এবং, বলা বাহুল্য, 'বিদেশিনী' শব্দটিতেই এক গভীর, গম্ভীর অপরিচয়ের দ্যোতনা আছে; গন্তব্য যেমন অজানা, প্রেমাস্পদাও তেমনি অনির্ণেয়। আমরা অবাক হই না, যখন স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে বিদীর্ণ ক'রে এই কবি বাঁশির মতো ব'লে ওঠেন: 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'; বা, আরো কিছুকাল পরে, ঘোষণা করেন 'ঝঙ্কারসমদমত্ত বলাকা'র উৎকাঙ্ক্ষা: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

৬

এলিয়টের গুরু নব্যক্লাসিক আর্ভিং ব্যাবিট, কতিপয় বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ক'রে, এই গতিস্পৃহাকে 'ঘূর্ণিপূজা' নামে ব্যঙ্গ করেছিলেন। গতি আছে, গন্তব্য নেই; বাসনা আছে, তার আধার নেই; প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের পাত্রকে শনাক্ত করা যায় না—এই ভাবটিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতা নয়, অবমানবিক উন্মাদনা। তিনি লক্ষ করতে ভুলেছিলেন যে গতিস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠলে সেই সঙ্গে স্থিতিলিপ্সা অনিবার্য, এবং রোমান্টিকতার কোনো-কোনো চরম মুহূর্তে তা-ই ঘটেছিলো। রবীন্দ্রনাথে—যদি 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায় ছেড়েও দিই—এর নিদর্শনের অভাব নেই; 'চিত্রা'য় তিনি সেই সত্তার উপাসক, যা বহির্জগতে বহুবিচিত্র এবং অন্তরে এক ও অন্তরতম; বেদুইনের মাতাল মধ্যাহ্নের অনতিপরেই সন্ধ্যালগ্নে তিনি চান নতশিরে শান্তি ও মৌনতা; তাঁর 'নিষ্ফল কামনা'র দাবদাহের সমান্তর সেই 'ধ্যান', যাতে 'সমস্ত প্রাণ মম / চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত / একটি নয়ন-সম।'* 'মানসী'র 'ধ্যান' প'ড়ে

* কথাটাকে 'সরল গদ্যে' বলতে হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণপঞ্জিগুলির দ্বারস্থ হবো; সেখানে গতি ও স্থিতি সাকার হয়েছে য়োরোপে ও ভারতবর্ষে, এবং লেখকের মনে পশ্চিমী জঙ্গমতার প্রতি আকর্ষণ যেমন দুর্বার, তেমনি দূরপনেয় বাংলার নিস্তরঙ্গ গৃহকোণের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বহু

অসম্ভব নয় বোদলেয়ারের 'স্তোত্র' মনে পড়া, 'চিত্রা'র 'সন্ধ্যা' প'ড়ে 'আত্মস্থতা' -
কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় সর্বদাই দু-একটি কাঁটা লুকোনো থাকে ব'লে আমরা রক্তপাতে তাঁর বেদনা উপলব্ধি করি, আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অবিরল-ভাবে মসৃণ ও কমনীয়, তাই, আরামে ম'জে, আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না তিনি কী বলছেন। একই কারণে, এই গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব বোদলেয়ারে অনেক বেশি প্রখর ; রবীন্দ্রনাথে দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে ভাগ ক'রে নিতে পারি, দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না, তাঁর মন যখন যেদিকে উন্মুখ হয় তখনকার মতো সেখানেই আত্মসমর্পণ করে ; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর সমগ্র রচনায়, আর কখনো বা একই কবিতার মধ্যে, বুঝিয়ে দেন যে তাঁর পক্ষে গতি যেমন নিরন্তর মোহময়, স্থিতিও তেমনি ক্ষমাহীনরূপে আহ্বানকারী, এবং উভয় আকর্ষণ তাঁর মনে যুগপৎ বিরাজমান। 'সিন্ধু ও মানব' কবিতায় অবিরাম আন্দোলনের ছবিটিকে একই সঙ্গে সুন্দর ও মারাত্মক ব'লে আমরা অনুভব করি, একই বিড়াল তাঁর মুগ্ধতা কাড়ে 'মাথার মধ্যে আনাগোনা'র জন্য ও 'ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরে থাকে' ব'লে, আর প্যাঁচারা প্রশংসা পায় যেহেতু তারা নিশ্চল ও আত্মদর্শী :

> জ্ঞানীর চোখ, তা দেখে যায় খুলে,
> হাতের কাছে যা আছে নেয় তুলে,
> থামায় গতি, অবুঝ আন্দোলন ;

রচনাই এই দুই প্রবল উন্মুখতার দ্বন্দ্বপ্রসূত। হয়তো এমন প্রশ্ন করাও অবান্তর হয় না তাঁর 'বিদেশিনী' কেন 'সিন্ধুপারে' থাকেন, আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র তরণীটি কেন পশ্চিমগামী। বোটে বাসকালীন কোনো চোখে-দেখা সূর্যাস্তের স্মৃতি নিশ্চয়ই কাজ করেছে তার মধ্যে, কিন্তু আমরা কি অত্যন্ত নিশ্চিত হ'তে পারি যে কোনো য়োরোপগামী জাহাজের স্মৃতিও কাজ করেনি, বা 'যাত্রা' বলতেই অস্পষ্টভাবে পশ্চিমী গতিধর্ম মনে পড়েনি তাঁর? বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'য়োরোপীয়' রবীন্দ্রনাথ—এই সত্যের একটি ঘোষণা হিশেবেও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পাঠ করা অসম্ভব নয়। সত্য, বৃদ্ধ বয়সে লেখা 'যাত্রী' গ্রন্থের কয়েক লাইন কবিতায় ('রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উচ্চস্বরে ডাকি') তিনি আক্ষরিকভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতিবাদ করেছিলেন ; কিন্তু সেই রচনা গতির বিরুদ্ধে ততটা নয় যতটা প্রগতি ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে : রোমান্টিক গতিপ্রবণতা থেকে তিনি যে কখনোই মুক্ত হননি সমকালীন 'পূরবী' গ্রন্থে তার বহু প্রমাণ আছে। সেই গ্রন্থে ঝ'রে-পড়া শিউলিরা শুধু 'চলো, চলো' বলে, 'ঝড় বলে অবিশ্রান্ত, / তুমি পান্থ, আমি পান্থ, / জয়, তব জয়।' আর, যেন বৃদ্ধ কবিকে মন্থন ক'রে উচ্ছ্রিত হয় 'বাসা'র জন্য অভিলাষ। যে-মানুষ বাসা পেয়েছে, সে বাসা নিয়ে কবিতা লেখে না।

এই প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথকে বন্ধনীভুক্ত করেছি ব'লে কেউ যেন না ভাবেন যে এ-দুয়ের বিপুল বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। কিন্তু সেখানেই সাদৃশ্য সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময়, যেখানে আকারে-প্রকারে শুধু পার্থক্যই ধরা পড়ে।

হায়, মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
শান্তি তার এ-ই তো চিরন্তন—
কেবল চায় বদল, বাসা-বদল! ('প্যাচারা')

এবং লক্ষণীয় যে বোদলেয়ারের সুন্দরীরা যদিও চঞ্চলা, নর্তকী সাপিনী বা তরঙ্গাহত তরণীর সঙ্গে তুলনীয়, যদিও প্রায়ই আমরা তাদের দেখতে পাই ঠাণ্ডা প্যারিসে অথবা রৌদ্রময় প্রাচ্য পুলিনে পথচারিণীরূপে, তবু তাঁর সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্তব্ধ, হিম ও ধবল, সব আবেগজনিত হৃৎস্পন্দনের অতীত। সুদূরের সেতুবন্ধ তাঁর রূপসীরা, ভ্রমণের উদ্বোধিনী, তাদের সংসর্গে কবি চ'লে যাচ্ছেন 'মোহন মণ্ডলে', শিথিল এশিয়া ও প্রদীপ্ত আফ্রিকায়, 'সুদূর, অনুপস্থিত ও লুপ্তপ্রায়' এক জগতে, কিন্তু সেই সব রূপের যিনি আবহমান অন্তঃসার, তিনি কবিকে বলছেন: 'পাছে রেখা ভ্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা।' বোঝা যাচ্ছে, গতির অন্তরে স্থির কেন্দ্রের ধারণাটি বর্ষ্টনীয় ব্রাহ্মণবংশের একাধিকার নয়, বোদলেয়ারে তা সোচ্চার, এবং যে-নবোদ্গত ভারতীয় কবিকে আর্ভিং ব্যাবিট ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও তা সুস্পষ্ট।

'নিরন্তর আমার মনে হয় যে আমি যেখানে আছি সেখানে ছাড়া অন্য যে-কোনো দেশে আমি সুখী হ'তে পারি।' কে বলছেন? রোমান্টিকতার জনক জঁা-জাক নন, ঐতিহাসিকেরা যাঁকে রোমান্টিকতার অবসান ব'লে চিহ্নিত করেন, সেই শার্ল বোদলেয়ার। কিন্তু, 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়', এই কথার প্রতিধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে না? কিন্তু একটু অপেক্ষা করা যাক, আর-একবার পড়া যাক সেই গদ্যকবিতাটি, উপরোক্ত পঙক্তিটি যার অংশ, বোদলেয়ার যার শিরোনামা দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায়: 'পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে'। 'জীবনটা এক হাসপাতাল যেখানে প্রত্যেক রোগী অবিরাম চায় শয্যা-বদল। কারো ইচ্ছে চুল্লির উল্টোদিকে শুয়ে কষ্ট পায়, কেউ ভাবছে জানলার ধারে গেলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।' এই মুখবন্ধেই ব'লে দেয়া হ'লো—যা 'প্যাচারা' কবিতাতেও বলা আছে—যে মানুষের মনে বাসা-বদলের ইচ্ছেটা যেমন দুর্মর তেমনি নির্বোধ। অন্য এক ফরাশি বচন মনে প'ড়ে যাচ্ছে আমাদের: 'মানুষের সব দুর্ভাগ্যের একটিই কারণ: সে তার ঘরে টিকতে পারে না।' পাস্কাল, মনে হ'তে পারে, রুসো জন্মাবার অনেক আগেই রুসোর উত্তর লিখে গিয়েছিলেন; কিন্তু আসলে এই দুটি উক্তি পরস্পরের পরিপূরক, আমাদের অভিজ্ঞতায় এই দুই ভাবই সমান সত্য; আমাদের হৃদয়ের তারা মৌলিক গুণ; আমাদের জীবনে তারা প্রতিবেশী ও পরস্পর-প্রবিষ্ট। এবং

বোদলেয়ারের কবিতাটি এই দুই বিপরীতের টানে তীব্র হ'য়ে আছে ; দূর, অজানা ও আশ্চর্য যার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠলো সেই ভৌগোলিক সুখধামগুলির বর্ণনা আমাদের শুধু প্রস্তুত ক'রে তুলছে সর্বশেষ ও সর্বনাশী বিস্ফোরণটির জন্য : 'যে-কোনোখানে ! যে-কোনোখানে ! পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে !' কিন্তু—কোথায় ? পৃথিবীর বাইরে না-গেলে যার তৃপ্তি নেই তার তৃষ্ণা কোথায় মিটবে ?

একটি গম্ভীর ও ভয়াবহ শব্দ আমাদের ঠোঁটে উঠে আসছে, হাওয়ায় হানা দিচ্ছে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সেই মহান কবিতাগুচ্ছ, যার নামপত্রে কবি লিখে দিয়েছিলেন : 'মৃত্যু'। কী আছে পৃথিবীর বাইরে, জীবনের বাইরে ? যে-সব কবি শাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আস্থাবান, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে স্বর্গরাজ্য, সুরলোক অথবা ব্রহ্মলোক ; ব্রাউনিঙের জন্য মৃতা প্রিয়ার বাহুবন্ধ ; ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের জন্য সেই সব সাধনা, যা জীবনে সারা হ'তে পারেনি। মৃত্যু মানে আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পুনর্মিলনের মুহূর্তটির নামই মৃত্যু—এই ধারণার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য টেনিসনের 'ক্রসিং দি বার' ও 'গীতাঞ্জলি'র ১১৬ নম্বর কবিতাটি পড়াই যথেষ্ট। এর 'বিরুদ্ধে' আমরা দাঁড় করাতে পারি মরণমোদিত পূর্ব-রোমান্টিকদের, যাঁদের কাছে মৃত্যু দেখা দেয় 'নিদ্রার মতো সুন্দর' হ'য়ে, প্রেয়সীর মতো কাঙ্ক্ষণীয়, প্রেম ও মৃত্যুকে যাঁরা সম্পৃক্ত ক'রে, এমনকি প্রায় এক ক'রে দেখেছেন, কিংবা জর্মান কবি প্লাটেন-এর মতো যাঁরা অনুভব করেছেন যে 'একবার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মৃত্যুর কাছে উৎসর্গিত হ'তে হয়।'* বোদলেয়ারে দুই দিকেরই লক্ষণ আছে, কিন্তু কোনো দিকেই তিনি পুরোপুরি ধরা দেন না। তাঁর কাছেও মৃত্যু একটি পরম নেশা, কিন্তু সে-নেশা শুধু ইন্দ্রিয়বিলাসের নয়, তাতে মিশে আছে মানবাত্মার দুরন্ত আবিষ্কারধর্মিতা। ধর্মকে পবিত্র ও যীশুকে 'তর্কাতীত দেবতা'

* লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ দুটি মনোভাবেরই অধীন হয়েছেন ; কীটসের প্রতিধ্বনি ক'রে জীবনানন্দ দাশ যে-কথা লিখেছিলেন—'মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে—' তা রবীন্দ্রনাথেরও হ'তে পারতো। 'মরণ' কবিতায় ('অত চুপি-চুপি কেন কথা কও') মৃত্যু প্রেয়সীরূপে কল্পিত ; 'গীতাঞ্জলি'তেও এই ভঙ্গি নেই তা নয়, কিন্তু সেখানে মৃত্যুর অর্থ বদলে গেছে। 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা / মরণ, ওগো মরণ, তুমি কও আমারে কথা'—এখানে যা ধরা পড়েছে তা প্রেমের চাপে বিলীন হ'য়ে যাবার আবেগ নয়, ঈশ্বর যে আছেন, এবং মৃত্যুর পরে তাঁর মধ্যে বিসর্জন সম্ভব, ধর্মের এই দুটি সূত্রই এখানে নিঃশব্দে স্বীকৃত।

ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি শাস্ত্রোক্ত ধ্রুবলোকের দিকে তাকিয়ে থাকা, বরং 'এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন' নামক নিষ্করুণ কবিতায় তিনি রূঢ়ভাবেই বলেছেন যে মৃত্যুর পরে আর-কিছু নেই—কিছুই নেই।

> ঘটলো ভীষণ মরণ, এবং সেই ঊষায়
> শুষ্ক, আবৃত, বিস্ময়হীন আমার মন; —
> স'রে গেলো পট, আমি তবু ব'সে প্রত্যাশায়।

কিন্তু—আরো কথা আছে। 'পৃথিবীর বাইরে' একমাত্র যে-সত্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি তার বিষয়ে বোদলেয়ারের ভাবনা—বা গবেষণা—আরো বিস্তীর্ণ। নিঃস্বের তা সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ, প্রেমিকের পক্ষে পুনরুজ্জীবনের আশা, শিল্পীর পক্ষে এক অতীন্দ্রিয় প্রতিশ্রুতি: এ-সব কবিতায় মৃত্যু যে-আসন পেয়েছে সেখানেই ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঈশ্বরকে বসিয়েছেন। 'না-জেনে ধায় তোমার পানে / সকল ভালোবাসা', 'গীতাঞ্জলি'র এই পঙক্তিতে মৃত্যু ও ভগবানকে প্রায় অভিন্ন ক'রে তোলা হয়েছে, কেননা কিছুক্ষণ আগেই কবির প্রার্থনা আমরা শুনেছি: 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা / প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।' টেনিসনের মতো—প্রায় টেনিসনের অনুসরণে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম যাত্রায় মুক্তিদাতাকেই কর্ণধার ব'লে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' কবিতায়—যাকে বলতে পারি মৃত্যুর মহিমায় উদ্ভাসিত এক জীবনবেদ—মানবজীবনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অভিজ্ঞ হ'তে-হ'তে আমরা অকস্মাৎ মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করি যে এই মাতাল তরণীর যে হাল ধ'রে আছে সে আর-কেউ নয়—মৃত্যু, বৃদ্ধ, অমর ও সনাতন মৃত্যু। হাইনে তাঁর 'বিমিনি'তে মৃত্যুকে জীবনের গন্তব্যরূপে নির্দেশ করেছিলেন; বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের জীবন—তাঁর কবিতাটির মতোই—এক বিরাট ঠাট্টা, যে কায়াকল্পের সন্ধানে বেরোলে কালসদনেই পৌঁছতে হবে। স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রবণতা এড়াতে পারেননি ব'লে হাইনের কবিতাটিকে আমরা একটি নীতি-কথারূপে গ্রহণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু বোদলেয়ারে যেহেতু ব্যঙ্গের আভাস-মাত্র নেই, তার বদলে আছে 'শহীদ ও ঘাতকে'র আবেশ, তাই তাঁর কবিতাটির অভিঘাত প্রচণ্ড, তা আমাদের নিয়ে যায়—নিশ্চিত মৃত্যুতে নয়—জীবন ও মৃত্যুর এক রহস্যময় সম্বন্ধসাধনে। জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্যের বদলে বোদলেয়ার লক্ষ করেছেন এ-দুয়ের সহবাসিতা; জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ঘটছে আমাদের, বেঁচে থাকা নামক অবস্থাটাকে মৃত্যুরই একটা প্রক্রিয়া বলা যায়,

তাকে আরো একটু কাছে না-টেনে কোনো কিছুই করতে পারি না আমরা, অতএব মৃত্যুই আমাদের সাধের তরণীর কাণ্ডারী। এই কথাটা একটা আদি-সত্য, পূর্বযুগেও কবিদের মনে প্রতিভাত হয়নি এমন নয়; কিন্তু বোদলেয়ারে তা এমনভাবে সোচ্চার হয়েছে যে তার পর থেকে এই ধারণাটি আধুনিক চৈতন্তের অংশ হ'য়ে গেছে। বোদলেয়ারে যা রশ্মির মতো নিঃসৃত, তাকে আমরা নক্ষত্রের মতো জ্বলতে দেখি রিলকের কাব্যে, যেখানে মৃত্যু আমাদের অন্তর্ভূত এক বীজ, যাকে আমরা অনবরত লালন ক'রে ফলিয়ে তুলছি, এবং যা সুপক্ব হ'লে আমাদের বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসবে। টোমাস মান্‌-এর 'ভেনিসে মৃত্যু' গল্পে গুস্টাফ আশেনবাখ অকস্মাৎ ভ্রমণলালসায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; জানলো না, তার সত্য বাসনা মৃত্যুর জন্ম। এই অতল ও নামহীন লিপ্সাটি জীবনানন্দর আত্মঘাতী যুবকও অনুভব ক'রে গেছে ('আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে'), এবং রবীন্দ্রনাথও যৌবনে একবার লিখেছিলেন: 'ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে / বেঁধেছিস বাসা।' কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যখন 'জীবনবধূ'কে 'নিত্য অনুগতা' ব'লে চিহ্নিত করলেন, যার সঙ্গে 'একটি শুভ দৃষ্টিপাতে' মৃত্যুর মিলন হবে, তখন, পূর্ববর্তী 'খেয়া'র 'বালিকা বধূ' ('ওগো বর, ওগো বঁধু,') কবিতাটি স্মরণে রেখে, আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না 'মৃত্যু' এখানে কিসের নামান্তর।

মানুষের মনে সত্যি অকারণ কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছি। রোমান্টিকের দুরন্ত বাসনা কিসের জন্ম? কিছুতেই কেন তৃপ্তি নেই তার? 'পৃথিবীর বাইরে' কিসের সন্ধানে যেতে চায়? আকাঙ্ক্ষা তার অমেয়র জন্ম, পরমের জন্ম, অমরতার জন্ম। তৃপ্তি নেই, কেননা সংরাগের চরম আনন্দ ও চরম নির্যাতন সহ্য ক'রেও, কাম, কোহল ও দুষ্ক্রিয়ার পরিক্রমী সোপান পার হ'য়েও, এবং ত্যাগের, দুঃখের, প্রায়শ্চিত্তের কণ্টকশয্যা বরণ ক'রেও, সে অমেয়কে, পরমকে, অমরতাকে লাভ করে না। কিন্তু তাই ব'লে আকাঙ্ক্ষা তার নষ্ট হয় না, বন্ধ হয় না সাধনা, নূতন থেকে নূতনতরতে অনবরত চলে তার সন্ধান—তার ভ্রমণ। সেই নূতন, সেই নিত্য অজানা, সেই অবিরল- দূরে-স'রে-যাওয়া দিগন্ত—তারই মধ্যে বোদলেয়ার দেখেছেন মৃত্যুর সার্থকতা ও অন্তঃসার:

> হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
> এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
> কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর সিন্ধুর
> অন্তরালে রৌদ্রবহ আমাদের প্রাণের পুলিন।

ঢালো সে-গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা !
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন !
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন ! ('ভ্রমণ')

এই সঙ্গে 'আলোকস্তম্ভ' কবিতার শেষ স্তবকটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে বোদলেয়ার যাকে মূল্যবান ব'লে জেনেছেন, তা প্রাপ্তি নয়, অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ :

আর কী প্রমাণ আছে ? ভগবান, এ-ই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিভ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার !

এই 'প্রমাণ'গুলি, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই, চিত্রকলার বিবিধ নিদর্শন, রচিত শিল্পকর্ম, চৈতন্যের প্রসূন। কিন্তু রুবেন্স-প্রমুখ মহাশিল্পীরা শুধু নন, বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই—খুনে, মাতাল, লম্পট কিংবা অভাজন,* কেউ নেই যে চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত নয়, ভাবনা যার অস্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ-কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী ; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী ; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন ; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু ; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী : বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না ; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।

* ব্যতিক্রম শুধু নারীরা, কিন্তু নারী তো 'স্বাভাবিক', অর্থাৎ মনোহীন। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস স্প্লীন'-এ নারীদের উদ্দেশে বা বিষয়ে অনেক কবিতা আছে, কিন্তু নারীর কোনো স্বগতোক্তি নেই ; একমাত্র 'বিধবারা' নামক গদ্যকবিতাটিতে ছাড়া, কোথাও নারীকে আমরা চিন্তা করতে শুনি না।
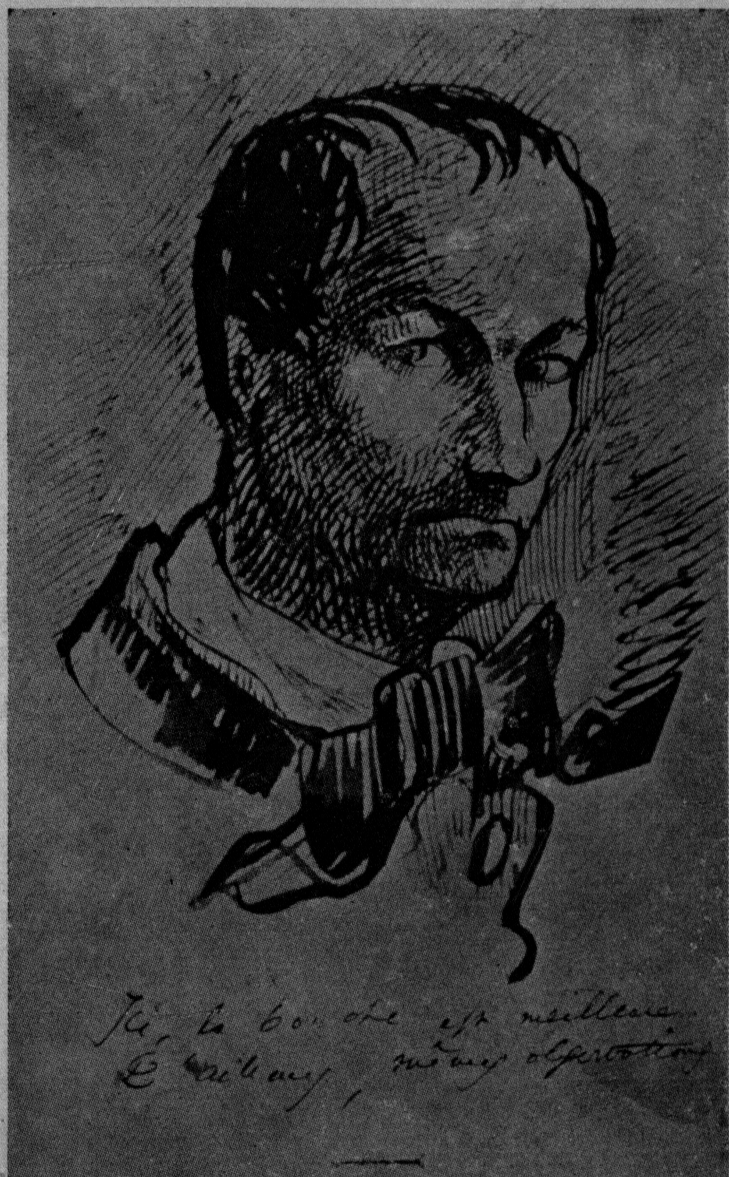
শার্ল বোদলেয়ার : আত্ম প্রতিকৃতি

জান দ্যুভাল

বোদলেয়ার কর্তৃক স্মৃতি থেকে অঙ্কিত রেখাচিত্র

ক্লেদজ কুসুম

(LES FLEURS DU MAL)

পাঠকের প্রতি

মূঢ়তা, প্রমাদ, কার্পণ্যের পাপে
পূর্ণ হৃদয়, দেহ তিলে-তিলে ধ্বংস,
ভিখিরি যেমন পোষে উকুনের বংশ
আদরে জোটাই খাদ্য মনস্তাপে।

দুর্মর পাপ, অনুতাপ সন্ত্রস্ত,
ঘৃতান্নভোজে পণের মূল্য মানি,
পচা কান্নায় ধুয়ে যাবে সব গ্লানি—
এই ভেবে, হেসে, ফের হই পঙ্কস্থ।

মূঢ় আত্মাকে দোলায় পাপের তল্পে
ত্রিগুণমায়াবী শয়তান, তমিস্র ;
সে-বিজ্ঞানীর বিদ্যায় হয় পিষ্ট
কোনো খাঁটি সোনা থাকে যদি সংকল্পে।

বীভৎসে বাঁধে রমণীয় নির্বন্ধে,
যেখানেই যাই, সে-পিশাচ টানে দড়ি !
দিনে-দিনে তাই নরকে গড়িয়ে পড়ি
আতঙ্কহীন, তমসার পূতিগন্ধে।

বুড়ি বেশ্যার শুকনো শহীদ-স্তনে
দীন লম্পট চুম্বনে করে দীর্ণ ;
আমরাও চাপি গোপন সুখের জীর্ণ
বাসি ফলে আরো কঠিন নিষ্পেষণে।

মগজে, মত্ত পিশাচেরা দল বাঁধে,
যেন কোটি কৃমি, ফেনময়, পরিকীর্ণ ;
নিশ্বাস নিই— ফুশফুশে অবতীর্ণ
অদৃশ্য নদী, মরণ, ফুঁপিয়ে কাঁদে।

হায়, আমাদের নেই যথোচিত দৃপ্তি,
নিয়তির পট তাই মালিন্তে মাখা,
ফোটাতে পারে না কোনো মনোজ্ঞ রেখা
ধর্ষণ, বিষ, ঘর-পোড়ানোর দীপ্তি।

কিন্তু পাপের জঘন্য সংসারে
যত শার্দুল, শৃগাল, শকুন, সর্প,
বৃশ্চিক, কীট, মর্কট করে দর্প
নেচে, কুদে, ফুঁশে উৎকট চীৎকারে,

সেই দলে এক রয়েছে পরম ঘৃণ্য—
হাঁকে না, ছোটে না, ব'সে থাকে একভাবে,
হাই তুলে যেন সৃষ্টিরে গিলে খাবে,
জঞ্জাল বিনা রাখবে না কোনো চিহ্ন;

—নির্বেদ! চোখে অনভিপ্রেত অশ্রু তার,
হুঁকো টানে আর ফাঁসিকাঠ দ্যাখে স্বপ্নে।
পাঠক, তুমিও চেনো এ-পিশাচরত্নে,
—কপট পাঠক,—দোসর,—যমজ ভাই আমার!

বিতৃষ্ণা ও আদর্শ

আলবাট্রস

মাঝে-মাঝে, সকৌতুকে, নাবিকেরা তাকে ধ'রে ক্যালে।
বিশাল আলবাট্রস, সমুদ্রের বিহঙ্গপুঙ্গব,
তিক্ত ফেনা পেরিয়ে যে চ'লে আসে মৃদুমন্দ তালে,
জাহাজের সহযাত্রী, সঙ্গদাতা পথের বান্ধব।

যে-মুহূর্তে ওরা তাকে ধ'রে এনে রাখে পাটাতনে,
লজ্জায় বিকল এই নীলিমার সম্রাট তখনঃ
বিরাট, করুণ, শুভ্র ডানা তার, ক্ষুব্ধ নিপাতনে
নাড়ে, যেন দাঁড়-ভাঙা, অসহায় সন্ত্রস্ত তরণী।

এই সে-আকাশযাত্রী, কত রূপ ছিলো সম্প্রতিও!
অপ্রতিভ কুশ্রীতায় প্রহসন-পুত্তলি এখন!
কারো বা খুঁড়িয়ে-চলা বিদ্রূপে সে অনুকরণীয়,
অথবা হুঁকোর নল চঞ্চুপুটে দেয় কণ্ডুয়ন!

—মেঘলোকে যুবরাজ! এইমতো, কবিও হেলায়
তুফানে ঝাপট দেয়, ব্যর্থ করে কিরাতের কলা;
কিন্তু এই মৃত্তিকার নির্বাসনে, উল্লোল মেলায়
মহান ডানার ভারে অবরুদ্ধ হয় তার চলা।

প্রতিষঙ্গ

প্রকৃতি, মন্দির এক; স্তম্ভরাজি, প্রাণের কম্পনে
মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট প্রলাপে দেয় সংকেত ছড়িয়ে;
সেখানে মানুষ আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে
যে-অরণ্য দ্যাখে তাকে অনুক্ষণ অভ্যস্ত নয়নে।

বহু ভিন্ন প্রতিধ্বনি—দূরাগত, গভীর, অম্বর,
অবশেষে খুঁজে পায় অন্ধকার, গাঢ় সমতান,
নিশীথের মতো ব্যাপ্ত, স্বচ্ছতার মতো মহীয়ান—
সেইমতো বর্ণ, গন্ধ পরস্পরে জানায় উত্তর।

কোনো-কোনো গন্ধ যেন অর্গানের নিস্বনে কোমল,
প্রেইরির সবুজে মাখা, শিশুর পরশে সুখময় ;
অন্যেরা—বিজয়ী, খিন্ন, কলুষিত, ঐশ্বর্যে উচ্ছল,

এনে দেয় অসীমের আদিগন্ত বিরাট বিস্ময়—
অম্বর, কস্তুরী, ধূপ, পরিকীর্ণ গম্ভীর লোবান
গুঞ্জরে আনন্দময় আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের গান।

আলোকস্তম্ভ

রুবেন্স, সুখের শয্যা, তনুমাংসে স্নিগ্ধ উপাধান,
আলস্যের কুঞ্জবন, বিস্মৃতির মধুর নির্ঝর,
প্রেম নেই, আছে শুধু অবিরাম আন্দোলিত প্রাণ—
যেমন আকাশে হাওয়া, কিংবা মহাসাগরে, সাগর ;

দা ভিঞ্চি, দর্পণ এক, অন্ধকার, গভীর আকাশ,
ছায়া ফ্যালে গ্লেসিয়ার, দিগন্তরে পাইনের বন,
সেখানে দেবদূতের অপরূপ হাসির উল্লাস
সংকেতে জানিয়ে দেয় অন্তরালে তাদের ভবন ;

বিষণ্ণ হাসপাতাল, রেমব্রাণ্ট, দীর্ঘশ্বাসে ভরা,
অতিকায় ক্রুশকাষ্ঠে একমাত্র অলংকার ধরে,

বিষ্ঠায় উদ্গত কান্না, প্রার্থনার সজল পসরা—
একটি শীতের রশ্মি অকস্মাৎ তাকে দীর্ণ করে ;

বিস্তীর্ণ অস্পষ্ট দেশ, অনির্ণেয় : মিকেলাঞ্জেলো :
খ্রিষ্ট আর অসুর সেখানে মেশে, প্রখর বিক্রমে
উদ্ধত প্রেতের দল ভ'রে দেয় গোধূলির আলো,
ছিন্ন করে শবাচ্ছাদ নখরের ভীষণ উদ্যমে ;

মল্লের আরক্ত রোষ, কিন্নরের উল্লোল নয়ন,
চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট—
এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন
প্যুজে, সব কয়েদির মনঃক্ষুণ্ণ, বিধুর সম্রাট ;

ওয়াতো, মদনোৎসব ; খ্যাতিমান হৃদয় কত না
আলোয় হারিয়ে পথ দগ্ধ হয় পতঙ্গ-প্রথায়,
চটুল, মোহন দৃশ্যে উদ্ভাসিত দীপের দ্যোতনা
ঘূর্ণিত নৃত্যেরে আরো গূঢ়তার আবেশে মাতায় ;

দারুণ দুঃস্বপ্ন, গইয়া, অজানার নিপট সঞ্চয়,
ভ্রূণমাংসে অন্নপাক ডাকিনীর পূজার থালায়,
দর্পণে নিবদ্ধ বৃদ্ধা, বালিকার নগ্ন অভিনয়
পা তুলে, মোজার বন্ধে, পিশাচের লালসা জ্বালায় ;

ভ্রষ্ট দেবতার বাসা, দ্যলাক্রোয়া, শোণিতের হ্রদ,
চিরশ্যাম তরুশ্রেণী তাকে রাখে ছায়াচ্ছন্ন ক'রে,
অসুখী আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে ধ্বনির সম্পদ
অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে, হ্বেবারের অদ্ভুত ঝংকারে।

এই সব অভিশাপ, অবিশ্বাস, নারকী শপথ,
পুলক, চীৎকার, কান্না, অনুতাপ, উন্মাদ বন্দনা,

পার হ'য়ে প্রতিধ্বনি-পরিকীর্ণ অন্তহীন পথ
এনে দেয় মর প্রাণে আফিমের স্বর্গীয় সান্ত্বনা !

হাজার শান্ত্রীর কণ্ঠে এই বাণী আবার উত্তাল,
হাজার তূর্যের মুখে পুনরুক্ত এক অভিযান,
হাজার দুর্গের 'পরে অনির্বাণ প্রোজ্জ্বল মশাল,
বিরাট অরণ্যে লুপ্ত শিকারির উদাত্ত আহ্বান !

আর কী প্রমাণ আছে ? ভগবান, এই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার !

রুগ্ন কবিতা

আহা রে, কবিতা, বল, কোন ব্যাধি তোকে আজ দহে ?
নয়নকোটরে দেখি দলবদ্ধ নৈশ মতিভ্রম,
আর তোর গাত্রে খেলে, একান্তর, সমান আগ্রহে
মূঢ়, মূক অপস্মার, আতঙ্কের হিমেল বিক্রম ।

এলো কি সবুজ প্রেত, কিংবা কোনো লোহিত প্রমথ,
কটাহমন্থনে তোর লালসার সন্ত্রাস জ্বালাতে ?
অথবা দুঃস্বপ্ন, এক বদ্ধমুষ্টি দানবের মতো,
তোরে কি ডুবিয়ে দিলো মিণ্টার্ন-এর বিশ্রুত জলাতে ?

মনে হয় তোর বুকে ভাবনার গভীর উল্লাস
নিশ্বাসে বিলায় যদি একবার স্বাস্থ্যের সুবাস !
এবং সরল ছন্দে ঢেউ তুলে খ্রিষ্টান শোণিত

শিখে নেয় সেই দূর অতীতের দীপক-সংগীত,
যখন ছিলেন প্রভু, একান্তর এবং স্বরাট,
কীবাস, গানের পিতা, আর প্যান, শস্তের সম্রাট।

পণ্য কবিতা

কবিতা, মানসী, তুই প্রাসাদের উপাসক, জানি।
কিন্তু বল, যখন প্রদোষকালে, হিমেল বাতাসে,
নির্বেদে, নীহারপুঞ্জে জানুয়ারি কালো হ'য়ে আসে—
নীলাভ চরণে তোর তাপ দিবি, আছে তো জ্বালানি ?

মর্মরে নিটোল তনু ; কিন্তু তার পুনরুজ্জীবন
হবে কি বাতায়নের রন্ধ্রে বেঁধা দীপের শিখায় ?
যেমন রসনা নিঃস্ব, সেইমতো শূন্য পেটিকায়
ভরাবি, আকাশ ছেঁকে, নীলিমার উদার কাঞ্চন ?

না, তোকে যেতেই হবে, দিনশেষে অন্ন জোটে যাতে,
মন্দিরে, দাসীর মতো, আরতির কাঁসর বাজাতে,
যে-মন্ত্রে বিশ্বাস নেই, মুখে তা-ই জপ ক'রে যাবি,

কিংবা, উপবাসী তুই, প'রে বিদূষকের বসন,
না-দেখা চোখের জলে ভিজিয়ে রঙিন প্রহসন,
ইতর জনগণের তিক্ততায় আমোদ জোগাবি।

শত্রু

আমার যৌবন ছিলো শুধু এক আঁধার তুফান,
তির্যক সূর্যেরা যাকে কদাচিৎ করেছে উজ্জ্বল ;
বজ্র আর বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হ'য়ে, আমার বাগান
ফলিয়েছে কেবল একটি-দুটি রক্তরঙা ফল।

এদিকে, মনের প্রান্তে, হেমন্ত যে আগত এখনই,
শাবল, কোদাল নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে এইবার—
তবে যদি রক্ষা পায় ধারাজলে ভেসে-যাওয়া জমি,
ফাটা কবরের মতো খানাখন্দ খুলে আছে যার।

যে-নূতন ফুলদলে স্বপ্নে আমি নিরন্তর দেখি,
সৈকতের মতো সিক্ত এ-মাটিতে, তারা কখনো কি
পাবে সে-অলোকপথ্য, যা তাদের শক্তির সঞ্চয় ?

—আক্ষেপ, আক্ষেপ শুধু! সময়ের খাদ্য এ-জীবন,
যে-গুপ্ত শত্রুর দাঁতে আমাদের জীবনের ক্ষয়
বাড়ায় বিক্রম তার আমাদেরই রক্তের তর্পণ।

দুরদৃষ্ট

সিসিফাস, তোর সাহসের সর্বস্ব
হার মানে এই বিরাট বোঝার কাছে!
একান্ত মনে যতই লাগি না কাজে
শিল্প বিশাল, আয়ু অতিশয় হ্রস্ব।

বিখ্যাত স্মৃতিফলকের দূরবর্তী
পরিত্যক্ত কবর আমাকে ডাকে,
শবযাত্রায়, চাপা শব্দের ঢাকে,
তাল দিয়ে চলে হৃৎস্পন্দের আর্তি।

—তথাপি আমার তন্দ্রাবিলীন খনি
বুকে ঢেকে রাখে কত বিস্মৃত মণি,
খন্তা, কোদাল কখনো পায় না জানতে;

এবং অনেক ক্ষুদ্র কুসুমদল
গোপনে বিলায় খেদময় পরিমল
রিক্ত, গভীর নির্জনতার প্রান্তে।

পূর্বজন্ম

সরল স্তম্ভের সারি অলিন্দের বিরাট নির্ভর,
রঞ্জিত সিন্ধুর সূর্যে অন্তহীন রঙিন শিখায়,
সন্ধ্যারাগে কঠিন গুহার মতো—দৃপ্ত, অতিকায়—
আমি সেই মায়ালোকে কাটিয়েছি হাজার বৎসর।

আকাশের চিত্রাবলি তরঙ্গের বেগে ওঠে দুলে,
সে-গূঢ় গম্ভীর ছন্দে মিশে যায় অচিরে আমার
নয়নে প্রতিফলিত সূর্যাস্তের বর্ণের সম্ভার,
পরম ক্ষমতাময় সংগীতের কলতান ভুলে।

সেখানে পেয়েছি আমি ইন্দ্রিয়ের প্রশান্ত বিলাস,
নীলিমার কেন্দ্রে ব'সে, চারদিকে উজ্জ্বলতা, গতি,
আর নগ্ন দাসীদের গন্ধভারে মন্থর প্রণতি—

যাদের অনন্ত ধ্যান, অবিরল সেবার প্রয়াস,
তালপত্র সঞ্চালনে, সে-গোপন দুঃখের উদ্গার
যার তাপে তিলে-তিলে অবসন্ন হৃদয় আমার।

যাত্রী বেদেরা

কাঁধে সন্ততি, দৃষ্টিতে দুর্মদ,
দল বেঁধে কাল বেরিয়েছে দৈবজ্ঞ,
ঝুলিয়ে, শিশুর হিংস্র ক্ষুধার ভোগ্য
স্তনবিস্ফারে অফুরান সম্পদ।

যানে পরিজন গচ্ছিত ; পুরুষেরা
হাটে পাশে-পাশে, অস্ত্রঝলকে দীপ্ত,
আর্ত নয়নে খোঁজে নভতলে লিপ্ত
অনুপস্থিত অলৌকিকের ডেরা।

পতঙ্গ, তার রুক্ষ বিবর থেকে,
চৌদুনে তান লাগায় ওদের দেখে ;
এবং সিবেলী যেহেতু প্রণয়াসক্ত,

ঘাস হয় আরো সবুজ, ফুলে ও স্রোতে
ফোটে মরু, শিলা ; আঁধার ভবিষ্যতে
পথিকের চেনা মহাদেশ উন্মুক্ত।

সিন্ধু ও মানব

স্বাধীন মানব, র'বে চিরকাল সিন্ধুর প্রেমিক !
তোমার দর্পণ সিন্ধু ; অন্তহীন আন্দোলনে তার
প্রতিবিম্ব দ্যাখো তুমি তরঙ্গিত আপন আত্মার,
তার তিক্ত, তলহীন পাতালের তুমিও শরিক।

ঝাঁপ দিতে ভালোবাসো আবক্ষ আপন রূপায়ণে ;
তার চোখে, বাহুতে তোমার অঙ্গ আলিঙ্গনে মাতে,
হৃৎপিণ্ড আপন ছন্দ ভুলে গিয়ে, নিজেকে মেলাতে
চায় মাঝে-মাঝে তার দুঃশাসন বর্বর স্বননে।

উভয়ে অপরিমাণ, অন্ধকার, সতর্ক তোমরা ;
মানব, কেউ কি তল খুঁজে পায় তোমার গহ্বরে ?
হে সিন্ধু, কেউ কি জানে কত রত্ন তোমার অন্তরে ?
উভয়ে অসূয়াপন্ন, দাও নিজ রহস্যে পাহারা !

আর ইতিমধ্যে হয় অপগত অযুত বৎসর,
নির্দয়, শোচনাহীন, তবু দ্বন্দ্ব চালাও দু-জনে,
এত সুখ তোমাদের হত্যাকাণ্ডে এবং মরণে,
চিরন্তন দুই মল্ল, ক্ষমাহীন দুই সহোদর।

নরকে ডন জুয়ান

যেদিন ডন জুয়ান, কারনেরে কড়ি গুনে দিতে
নেমে এলো পাতালসলিলে, এক গম্ভীর ভিক্ষুক
আন্তিস্থিনীসের মতো দৃপ্ত চোখে, বলিষ্ঠ বাহুতে
দাঁড়ের কর্তৃত্ব নিয়ে হ'লো প্রতিহিংসায় উৎসুক।

ঘোর কালো আকাশে কাৎরে ওঠে মেয়েরা উত্তাল,
ছিন্নভিন্ন গাত্রবাস, উন্মোচিত স্তনগুলি ঝোলা ;
বিরাট মিছিলে চলে যূপকাষ্ঠে বধ্য পশুপাল,
দীর্ঘায়িত ক্রন্দন পশ্চাতে টানে, ফুরোয় না পালা।

স্গানারেল্লে, দেঁতো হেসে, খেসারৎ চায় ফিরে পেতে ;
এদিকে ডন লুইস—মৃত যারা ঘোরে এলোমেলো,
তাদের দেখিয়ে দেন, অঙ্গুলির কম্পিত সংকেতে,
যে-পাপিষ্ঠ পুত্র তাঁর শুভ্র কেশে ব্যঙ্গ করেছিলো।

একদা প্রেমিক, আর তার পরে প্রতারক পতি
যে ছিলো, গা ঘেঁষে তার সাধ্বী, রোগা এলভিরা ঘনায়,
যেন ফের দাবি করে, যে-পরম হাসির আরতি
মন্ত্রঃপূত প্রভাতেরে মেখেছিলো কোমল সোনায়।

বর্মধারী, ঋজু এক শিলাময় বিরাট পুরুষ
হাল চেপে ধ'রে চলে কালো জল দুই দিকে চিরে ;
কিন্তু বীর, অসিতে হেলান দিয়ে, নিস্তব্ধ, বেহুঁশ,
বিদীর্ণ জলের রেখা দ্যাখে শুধু, তাকায় না ফিরে।

সৌন্দর্য

মরগণ, আমি যে সুন্দর ! যেন পাষাণে স্বপ্নিত,
এই স্তন, সকলেরই ঘুরে-ঘুরে সর্বনাশ যাতে
তা পারে কবির চিত্তে সে-প্রেমের সংক্রাম জোগাতে
যা নিতান্ত চিরন্তন, মৌন জড়পদার্থের মতো।

দুর্বোধ স্ফিঙ্কসের মতো, নীলিমার পালঙ্কে আসীনা,
মেলাই তুহিন প্রাণে মরালের দীপ্ত ধবলতা,
পাছে রেখা ভ্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা,
কখনো ফেলি না অশ্রু, উপরন্তু কখনো হাসি না।

কবিরা যখন দ্যাখে গরীয়ান আমার ভঙ্গিমা,
ভাস্বর মূর্তির কাছে (মনে হয়) আমি যা শিখেছি,
কঠিন চিন্তায়, পাঠে দগ্ধ করে জীবনের সীমা ;

কেননা, এ-সব নম্র প্রেমিকেরে ভোলাতে, রেখেছি
সব সুন্দরের কুণ্ড, দর্পণের নির্মল প্রতিভা ;
দুটি চোখ, আমার বিশাল চোখে চিরন্তন বিভা !

আদর্শ

ফ্যাকাশে, মরচে-পড়া, পটে-আঁকা রূপসীর দল,
অন্তঃসারশূন্য এই শতকের শটিত সঞ্চয়,
পাদুকায় বদ্ধপদ, কাস্টানেটে আঙুল চঞ্চল—
এরা নয় তোমার কামের তৃপ্তি, হে মত্ত হৃদয় !

থাকুন নায়িকাদের কাকলিমুখর হাসপাতালে
গাভার্নি, সবুজ কবি, পীত পাণ্ডুরোগের চারণ,

বৃথা খুঁজি এই সব অতি ম্লান গোলাপের গালে
আমার আরাধ্য ফুল—লজ্জাহীন, শোণিতবরন।

অতলগহ্বর এই হৃদয়ের তৃপ্তির সংকেত
দুষ্ক্রিয়ায় নিষ্পলক, তুমি, দৃপ্ত লেডি ম্যাকবেথ,
অথবা উত্তাল স্বপ্নে দেখেছেন যাকে ঈস্কিলাস ;

কিংবা তুমি, মিকেলাঞ্জেলোর কন্যা, মহান শর্বরী,
অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্থির, বঙ্কিমায় শান্তির অপ্সরী,
আসুরিক চুম্বনের যোগ্য যার কান্তির বিলাস।

দানবী

সে-দূর অতীতে, যবে প্রকৃতির মদমত্ত রতি
জন্ম দিতো প্রতিদিন অতিকায় অসুর উত্তাল,
আমার সঙ্গিনী ছিলো মনঃপূত দানবযুবতী,
আর আমি, রানীর চরণতলে, বিলাসী বিড়াল।

তার দেহ-মানসের যুগপৎ পুষ্পল বিকাশে
বেড়েছি বন্ধনহীন, মগ্ন তার প্রচণ্ড খেলায়,
এবং সজল তার বাষ্পাকুল চোখের আকাশে
খুঁজেছি রহস্যময় হৃদয়ের বিদ্যুৎ-জ্বালায়।

ঘুরেছি বন্ধুর গাত্রে, অপরূপ অঙ্গের সানুতে,
আদরে উঠেছি বেয়ে ধাপে-ধাপে বিরাট জানুতে ;
কখনো, গ্রীষ্মের দিনে, জ্বরতপ্ত সূর্যের মূর্ছায়

পীড়িত সে, প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,
ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।

অলংকার

ফেলে দিলো বসন আমার প্রিয়া। আমার অদ্ভুত
খেয়ালের অর্থ বুঝে—সুলতানের সোহাগে গর্বিণী
সুন্দরী বাঁদির মতো—চন্দ্রহার, কেয়ূর, কিঙ্কিণী
(কিন্তু অন্য কিছু নয়) প'রে নিয়ে হ'লো সে প্রস্তুত।

ধাতু আর পাথরের লেলিহান এই পরিণয়
চঞ্চল নিক্বণ তুলে সে-পুলকে ডোবায় আমারে,
যার স্বাদ পেয়েছি কেবল সেই অকূল পাথারে
যেখানে ছড়িয়ে আছে দীপ্তি আর ধ্বনির অন্বয়।

নিলো সে আমার কাম : তারপর, পালঙ্কবিতানে
এলিয়ে, ঈষৎ হেসে, তাকালো সে অলসনয়না।
সমুদ্রের মতো নম্র, অতলান্ত আমার কামনা
ছুঁলো তার তুঙ্গ চূড়া জোয়ারের প্রবল উত্থানে।

বুঝে নিলো, পোষ-মানা বাঘিনীর চতুর কৌশলে
তার শ্লথ, স্বপ্নিল দেহের লাস্যে আমার আহ্লাদ ;
যে-ভঙ্গি যখনই বাছে, তা-ই পায় প্রখর আস্বাদ
সরলে পিচ্ছিলে মেশা লাবণ্যের সহজ হিল্লোলে।

আমার তন্ময় চোখ, মগ্ন হ'য়ে মধুরের ধ্যানে,
দ্যাখে, তার দ্যুতিময় কটিতট, জঠর, জঘন,
মরালপঙক্তির মতো কম্পমান, কেলিপরায়ণ ;
উদর, স্তনযুগল, দ্রাক্ষাপুঞ্জ আমার উদ্যানে,

উঠে এলো, বাসনায় নাড়া দিয়ে, ডাকিনীর মতো
ভেঙে দিলো, যে-বিশ্রামে করেছিলো আমাকে বিলীন
প্রেয়সী, প্রোজ্জ্বল, দূর, সিংহাসনে নিঃসঙ্গ আসীন ;
শান্তির মাধুরী তার আন্দোলনে হ'লো প্রতিহত।

শ্রোণীচক্রে তরঙ্গের ভঙ্গে হ'লো রূপান্তর তার ;
নিতম্বে সে আস্তিওপি, ক্ষীণ স্কন্ধে তরুণ বালক,
মিশে যায় বিপরীত ; আর তার রোমহর্ষ ত্বক
বাদামি, মসৃণ, স্নিগ্ধ— মনে হয় স্বর্গের সম্ভার ।

নিবে গেলো মুমূর্ষু বাতির শিখা । কোমলনিস্বন
অগ্নিকুণ্ড একা জ্বলে অন্ধকার, স্তব্ধ নিরালায়,
যতবার দীর্ঘশ্বাসে লালিমার উল্লাস জ্বালায়
শোণিতে প্লাবিত করে গাত্র তার অম্বরবরন ।

সৌন্দর্যের স্তব

উৎস কি তোর দ্যুলোক, অথবা পাতাল-তল ?
সুন্দর ! তুই অমৃতচক্ষে নরক জেলে
উপকার, পাপ, বিকার ছড়াস অনর্গল,
তাই তো মদের পাত্রেই তোর তুলনা মেলে ।

উষার উদয়, অস্তভানুতে নয়ন ভরা ;
অধরভাণ্ড চুম্বনে ঢালে ওষধি-রস :
অঙ্গসুবাসে ঝড়ের সন্ধ্যা রয়েছে ধরা,
বীরের বেপথু, এবং শিশুর দুঃসাহস ।

উৎসব আর ধ্বংস বিলোস নির্বিচারে,
পরম কর্ত্রী ! কারো কাছে নেই জবাবদিহি !
মুগ্ধ নিয়তি, কুকুরের মতো, পিছু না ছাড়ে,
পাতালে, তারায়—বল ছিলি তুই কোথায় গৃহী ?

আতঙ্ক তোর মণিসঞ্চয়ে সংকলিত,
মৃতেরে মাড়িয়ে চ'লে যাস তুই গর্বভরে ;
এবং হত্যা, রতির প্রসাদে চঞ্চলিত,
পুতুলের মতো নিতম্বে তোর নৃত্য করে ।

ক্ষণিকার পাখা তোর দীপালির দৃপ্ত ফাঁদে,
কাঁপে, জলে, আর বলে, 'এ-বহ্নি অমরাবতী !'
মুমূর্ষু যেন আপন কবরে বাহুতে বাঁধে,
তেমনি বধূর অঙ্গে আনত তরুণ পতি !

স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম, কী এসে যায়,
ওরে সুন্দর, বিকট, সরল, দারুণ ত্রাস !—
যদি তুই—আমি ভালোবেসে যারে খুঁজি বৃথায়—
চোখের ঝলকে সেই অসীমেরে খুলে দেখাস !

অনন্যা, তুই দেবী না ডাকিনী, কে আর ভাবে—
মখমল-চোখে অপরূপ তোর উজ্জ্বলতা
যদি করে লঘু, ছন্দে, গন্ধে, মদস্রাবে
নিখিলকালিমা, আর সময়ের মন্থরতা !

দূরাগত সুবাস

যখন, দু-চোখ বুজে, হেমন্তের আতপ্ত সন্ধ্যায়,
পান করি তোমার আকৃতিময় স্তনপরিমল,
অকস্মাৎ উন্মীলিত, একতাল তপনে সচ্ছল,
পুলকিত পুলিনের বহ্নিরাগ নয়ন ধাঁধায়।

সে-অলস দ্বীপেরে, প্রকৃতি দেয় অজস্র ধারায়
মধুর ফলের গুচ্ছ, অনুপম উদ্ভিদের ভিড়,
ক্ষীণাঙ্গে ক্ষমতাময় পুরুষের সুঠাম শরীর,
অপরূপ সরলতা মেয়েদের চোখের তারায়।

তোমার গন্ধের যানে খুঁজে পাই মোহন মণ্ডল :
বন্দরে অনেক পাল, মাস্তুলের ব্যাপক জঙ্গল
এখনো রয়েছে ক্লান্ত সমুদ্রের উতল বাত্যায় ;—

এদিকে তেঁতুলগাছে সঞ্চালিত সবুজ আঘ্রাণ
নিশ্বাস আকুল ক'রে, নেমে আসে আমার আত্মায়
যেন দূর বাতাসে স্বনিত কোন নাবিকের গান।

এক মাথা চুল

কুন্তলরাশি, গ্রীবায় স্খলিত কোঁকড়া ফেনায়,
হে অলকদাম, আলস্যময় ঘ্রাণে মাতাল!
কী পুলক! যবে সান্ধ্য কোঠাতে আঁধার ঘনায়
কেশরগুচ্ছে ঘুমোনো স্মৃতিরা আসর জমায়,
তুলে নিয়ে নাড়ি হাওয়ায় তাদের, যেন রুমাল।

এশিয়ার শ্লথবিলাস, দীপ্তি আফ্রিকার,
সুদূর জগৎ, অনুপস্থিত, লুপ্তপ্রায়!
গন্ধগহন সেই অরণ্যে প্রাণ আমার—
অন্যেরে যথা ঠেলে নিয়ে চলে সুরবাহার—
তেমনি তোমার সুবাসে, প্রেয়সী, ভেসে বেড়ায়।

যাবো আমি, যেথা মানব এবং তরুলতাও
আপন রসে ও রৌদ্রে বিবশ দীর্ঘ দিন,
প্রবল অলক, হও ঢেউ, যাতে আমিও উধাও!
হে আবলুশের সাগর, স্বপ্নে চোখ ধাঁধাও!
মাস্তুল, পাল, মাল্লা, আগুন যাতে বিলীন:

প্রতিধ্বনিত বন্দর, যেথা আমার প্রাণ
বর্ণ, গন্ধ, শব্দের ঘন ঝাপটে মাতে;
জলীয় কনকে ভঙ্গিমগতি সাগরযান
বিশাল বাহুর বিস্তারে এক বেপথুমান
শাশ্বত-তাপ-বিদ্ধ আকাশে চায় জড়াতে।

অস্তটি যাতে বন্দী, সে-কালো সাগরজলে
ডুবে যাক মাথা, নেশার লালস যাকে মাতায় :
আমার সূক্ষ্ম সত্তা, ঢেউয়ের আদরে গ'লে
অনন্ত অবসরেব স্নিগ্ধ দোলায় দুলে
ফের খুঁজে পাক অন্তঃসত্ত্বা অলসতায।

নীল চুল, যেন আঁধারের বিস্তীর্ণ চাতাল,
গগনগোলকে ক'রে দাও তুমি আরো গভীর ,
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঐ কোকড়া কোমল পক্ষ্মজাল
আমি, অস্থির, মিশ্র সুবাসে হই মাতাল
নারিকেল-তেল, আলকাৎবা ও কস্তুরীর।

দীর্ঘ প্রহর। চিরকাল। ঐ কেশে আমার
অঞ্জলি দেবে ছড়িযে মুক্তা, পান্না, হীরা—
আমার রতির মন্ত্রে বধির র'বে না আর,
স্বপ্নমুখর হে মরুকানন, হে ভৃঙ্গার,
মহাগণ্ডূষে পান করি যাতে স্মৃতির সুরা।

প্রোজ্জ্বল ক্লেদ

নির্বেদে নিষ্ঠুর তুই, পাতকিনী। বিশ্বচরাচরে
বিঁধে নিতে চাস তোর অপ্রসর শয্যার শিয়রে।
দন্তের ব্যায়াম হবে, তাই—তোর কৌতুক দুঃসহ—
চাস তুই একটি শলাকাবিদ্ধ হৃদয় প্রত্যহ।
দীপ্ত দুই চোখ তোর, বিপণীর মতো উচাটন—
অথবা উৎসব যেন, গাছে-গাছে ঝোলানো লণ্ঠন—
স্পর্ধায় নিঃশেষ করে ক্ষমতার যত পায় ঋণ,
কেননা জানে না তারা সুন্দরের তারাও অধীন।

রে অন্ধ, বধির যন্ত্র, যন্ত্রণার প্রসবে প্রচুর !
উপকারী উপলক্ষ, জগতের রক্তলোভাতুর,
লজ্জা কি পাস না তুই—বল, কোনো লজ্জার প্লাবনে
পাংশু হ'য়ে ঝরে না কি রূপ তোর কখনো দর্পণে ?
তুচ্ছ এই কদাচার, বিদ্যা তোর বেড়ে চলে যাতে,
তা থেকে, আতঙ্কে কেঁপে, চাস না কি কখনো পলাতে,
যেহেতু প্রকৃতি, রয় অন্তরালে অভিসন্ধি যার,
রে নারী, পাপের রাজ্ঞী, তোকেই করে সে ব্যবহার,
তোকেই, জঘন্য জন্তু, ছেঁকে নিতে ক্বচিৎ প্রতিভা ?

হায় রে প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, মারাত্মক, হায়, দিব্য বিভা !

তবু অতৃপ্তা

শ্যামাঙ্গী, নিশার মতো, ওগো দেবী অদ্ভুতের দূতী,
ডাকিনী, আবলুশগাত্রী, তুমি মধ্যরাত্রির সন্তান,
অঙ্গে মেশে মৃগনাভি আর দূর হাভানার ঘ্রাণ—
আফ্রিকার কোন ওবি, সাভানার ফস্টাসের কৃতি !

আফিম, মদের নেশা ফেলে দিয়ে—আমার আকূতি
মানে তোর কামলিপ্ত ওষ্ঠাধরে অমৃতসমান ;
নয়নের কূপে তোর নির্বেদের তৃষ্ণা অবসান,
ধায় যবে তোর দিকে কারাভাঁয় সারিবদ্ধ রতি।

আত্মার চুল্লির মতো, ঐ লোল, কালো চক্ষু থেকে
অগ্নি হেনে, রে পিশাচী, কত আর পোড়াবি আমাকে !
আমি সেই স্টিক্স নই, যা তোকে জড়াবে নয় বার,

আর, হায়, মেগীরা-লম্পট আমি, কিছুতে পারি না
দর্প তোর চূর্ণ ক'রে, ফিরে পেতে নিজ অধিকার,
যেহেতু নরক তোর শয্যা, আর আমি প্রসার্পিনা।

স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে…

স্বচ্ছ বসনে ঢেউ তুলে চলে শ্রীমতী—
পদক্ষেপেই জাগে নৃত্যের ছন্দ,
যষ্টিপ্রান্তে লতানো ময়াল যেমতি
তালে-তালে দুলে শোনে মায়াময় মন্ত্র।

মানুষের সুখদুঃখে নির্বিকার
যেমন মরুর ধূসর আস্তরণ,
কিংবা ফেনিল সিন্ধু—তেমনি তার
উদাসীনতার হিমেই উন্মোচন।

দীপ্ত ধাতুর ঝলকে মধুর নয়নে
রূপক-রঙ্গ খেলা করে অদ্ভুত,
মিল খুঁজে পায় স্ফিঙ্কস আর দেবদূত,

ইস্পাত, সোনা, হীরক, আলোর চয়নে
জ্বলে চিরকাল—নিষ্ফল নক্ষত্র !—
বন্ধ্যা নারীর নিস্তাপ রাজছত্র।

নর্তকী সাপিনী

কী যে ভালোবাসি, প্রেয়সী, তোমার তনুবিতান !
—অলস অঙ্গ-চালনে
মনোহর ত্বক রেশমের মতো কম্পমান
রশ্মির প্রতিফলনে !

সাগরের মতো গভীর, সুরভি তোমার চুলে,
যেখানে অনবরত
নীল, পাটকেল ঢেউ জেগে ওঠে বাউণ্ডুলে,
তিক্ত স্মৃতির মতো—

সেখানে আমার স্বপ্নে আতুর আত্মা
ভোরের হাওয়ার টানে
জাহাজের মতো জেগে উঠে করে যাত্রা
সুদূরের সন্ধানে।

অম্ল, মধুর কিছুই বলে না চোখের খনি ;
কেবল অতল নেশা
জ্ব'লে যায় যেন ঠাণ্ডা, কঠিন, যুগল মণি,
লোহায়, সোনায় মেশা।

অথচ, বিলোল রূপসী, কথার অজস্রতা
তোমার চলার ছন্দে,
যেন সুন্দর সাপিনী সোহাগে নৃত্যরতা
অদ্ভুত জাদুমন্ত্রে।

শৈশবে ভরা, মন্থর, ঐ ছোটো মাথায়
ভাবনার তারতম্য
তরুণ হাতির মদির, কোমল শিথিলতায়
খুঁজে পায় ভারসাম্য।

এবং তোমার তনুর মধুর আন্দোলনে
তন্বী তরণী চলে,
গলুই ডুবিয়ে, ঋজুবঙ্কিম আবর্তনে,
ঘূর্ণিকুটিল জলে।

দর-গলমান গ্লেসিয়ারে জাগে প্রকম্পন
তরঙ্গে বেগ আনতে,

তেমনি তোমারও উঠে আসে যবে নিষ্ঠীবন
কেনিল দাঁতের প্রান্তে,

মনে হয় আমি পান করি কোনো বোহেমিয়ার
তীব্র, বিজয়ী মদ্য—
তরল আকাশে লক্ষ তারার অন্ধকার
অথবা হৃদয়ে লক্ষ।

এক শব

কী আমরা দেখেছিলুম হঠাৎ পথের মোড়ে
গ্রীষ্মমধুর দিনে,
শিলার শয়নে গলিত জন্তু রয়েছে প'ড়ে—
প্রেয়সী, পড়ে কি মনে ?

আর্দ্র নারীর ধরনে শূন্যে পা দুটি তোলা,
তাপে, ঘামে বিষ কীর্ণ,
লজ্জাবিহীন, উদাসীনভাবে উদর খোলা,
বিকট বাষ্পে পূর্ণ।

প্রকৃতির দান এ-পূতিপুঞ্জে রাঁধবে ব'লে
রৌদ্ররশ্মি জ্বলছে,
ফিরে দেবে শত খণ্ডে, যা তিনি মহৎ বলে
মিলিয়েছিলেন গুচ্ছে ;

উত্তম শব, আকাশ দেখছে দৃষ্টি মেলে,
ফুটলো ফুলের মতো,
এমন তীব্র গন্ধ, ভেবেছো হঠাৎ ট'লে
ঘাসে প'ড়ে যাবে না তো ?

ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি প'চে-ওঠা গলা জঠর ছেয়ে ;
আর নামে, অবিরল,
ঘন, কালো স্রোতে সপ্রাণ, ছেঁড়া টুকরো বেয়ে
ক্রিমির সৈন্যদল।

আর এই সব ওঠে আর পড়ে ঢেউয়ের মতো,
কাঁপে আচমকা স্বননে ;
যেন সে-শরীর, শিথিল বায়ুতে নিশ্বসিত,
জীবিত পুনর্জননে।

সে এক জগৎ, অদ্ভুত সুর ঝরে তা থেকে,
যেন জল গতিমন্ত,
কিংবা বাতাস, কিংবা কুলোয় ঘুরিয়ে ঝোঁকে
শস্য বাছার ছন্দ।

যত আছে রূপ, স্বপ্নে সকলই বিলীয়মান ;
আর, বিস্মৃত পটে,
শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,
ধীরে রেখা ওঠে ফুটে।

দূরে, অস্থির কুক্কুরী এক, রুষ্ট চোখে
আমাদের করে লক্ষ,
কখন ফিরিয়ে নেবে কঙ্কালপিণ্ড থেকে
তার খণ্ডিত ভক্ষ্য।

—আর তবু তুমি, তুমিও হবে এ-বিষ্ঠাধারা,
জঘন্য কীটপঙক্তি,
আমার স্বভাবী সূর্য, আমার চোখের তারা,
দেবদূত, সংরক্তি !

তা-ই হবে তুমি, অন্ত্য কৃত্য সাঙ্গ হ'লে,
ওগো লাবণ্যপ্রতিমা,

যবে, অস্থির আধারে, নশ্বর ফুলের তলে
বিনষ্ট হবে তনিমা।

তাহ'লে, রূপসী, বোলো সে-কৃমির বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।

পাতাল থেকে আমি ডেকেছি

দয়া করো, আমার একান্ত কান্তা! পাতালের অন্ধকার থেকে—
যেখানে আমার চিত্ত ডুবে আছে—ভিক্ষা চাই করুণা তোমার।
—কাতর জগৎ, যাকে ঘিরে আছে সীসময় দিগন্তের দ্বার,
যেথা ত্রাস এবং পাপিষ্ঠ ভাষা রাত্রি ভ'রে ছোটে এঁকে-বেঁকে।

সূর্য এক উঠে আসে—তাপ নেই, দেখা যায় বৎসরে ছ-মাস;
এবং ছ-মাস ভ'রে ভূমণ্ডলে অবিরল রাত্রি রয় ছেয়ে;
এই এক নগ্ন দেশ, বরফের মেরু নয় শূন্য এর চেয়ে,
—নেই কোনো বনভূমি, নির্ঝরিণী, নেই পশু, এক ফালি ঘাস

কী আছে কঠিনতর পৃথিবীতে, এর চেয়ে আতঙ্কে অধিক—
এই যে তুহিন সূর্য হিমস্রব হিংস্রতায় ভ'রে দেয় দিক,
আর, এক আদিম শূন্যতা যেন, এই গাঢ়, ব্যাপ্ত নিশীথিনী;

আমি তাই জন্তুদের ঈর্ষা করি, অন্ধকারে তুচ্ছ যত প্রাণী
মূঢ় এক নিদ্রার বিবরে ডুবে কিছু কাল অনায়াসে ভোলে,
এমন মন্থর লয়ে সময়ের ক্ষমাহীন তন্তুজাল খোলে!

পিশাচী

এসেছিলি, আমার বুকের দুঃখ ছিঁড়ে
যে-তুই, এক তীক্ষ্ণ ফলার মতো,
লেলিয়ে দিয়ে দৈত্য-দানোর দামাল ভিড়ে
নেচে, কুদে, গর্জে অবিরত

পেতেছিলি রাজত্ব আর শয্যা, ওরে
যে-তুই, আমার ক্লান্তিমাখা মনে,
—পাতকিনী, আঁকড়ে আছি আমি তোরে
খুনে যেমন দড়ির আলিঙ্গনে।

—বাঁধা আছি, বোতলটাতে পাঁড় মাতাল
পাশায় যেমন জুয়াড়ি দেয় মতি,
কিংবা যেন পশুর শবে পোকার পাল,
—নরকে, হোক নরকে তোর গতি!

ভাবিনি কি, মুক্তি আমার মিলবে কিসে,
সাধিনি কি তীব্র তলোয়ারে?
জপিয়েছি তো—ভীরু আমি—কপট বিষে,
'রক্ষা করো আমার আপনারে!'

কিন্তু, হায়, আমার 'পরে কী আক্রোশ—
গরল, ছোরা, তারাও বলে হেঁকে:
'মূর্খ! তুই মুক্তি পাবার যোগ্য নোস
জাহান্নামের এই নাগপাশ থেকে।

পারিস তার রাজ্য থেকে পালাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া!'

লিথি

উঠে আয় আমার বুকে, নিঠুরা নিশ্চেতনা,
সোহাগী ব্যাঘ্রী আমার, মদালস জন্তু ওরে,
প্রগাঢ় কুন্তলে তোর ডুবিয়ে, ঘণ্টা ভ'রে,
চঞ্চল আঙুল আমার—হ'য়ে যাই অন্যমনা।

ঘাঘরায় গন্ধ ঝরে, ঝিমঝিম ছড়ায় গন্ধে,
সেখানে কবর খোঁড়ে আমার এ-খিন্ন মাথা,
মৃত সব প্রণয় আমার, বাসি এক মালায় গাঁথা,
নিশ্বাস পূর্ণ করে কী মধুর আস্বাদনে!

ঘুমোতে চাই যে আমি, যে-ঘুমে ফুরোয় বাঁচা,
মরণের মতোই কোমল তন্দ্রায় অস্তগামী,
ক্ষমাহীন লক্ষ চুমোয় তনু তোর ঢাকবো আমি-
উজ্জ্বল তামার মতো ও-তনু, নতুন, কাঁচা।

শুধু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয়,
খোলা ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি লোটে;
বলীয়ান বিস্মরণে ভরা তোর দীপ্ত ঠোঁটে
অবিকল লিথির ধারা ব'য়ে যায় চুমোয়-চুমোয়।

নিয়তির চাকায় বাঁধা, নিরুপায় বাধ্য আমি,
নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুল্ল মালা;
বাসনা তীব্র যত, যাতনার বাড়ায় জ্বালা—
সবিনয় হায় রে শহীদ, নির্মল নিরয়গামী!

এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়—
কোনোদিন অন্তরে যার হৃদয়ের হয়নি পোষণ।

সে-রাতে ছিলাম···

সে-রাতে ছিলাম কদাকার ইহুদিনীর পাশে,
পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ যেন এ ওকে টানে ;
ব্যর্থ বাসনা ; পণ্য দেহের সন্নিধানে
সে-বিষাদময়ী রূপসী আমার স্বপ্নে ভাসে।

মনে প'ড়ে গেলো সহজাত রাজভঙ্গি তার,
দৃপ্তললিতে সে-কটাক্ষের সরঞ্জাম,
গন্ধমদির মুকুটের মতো অলকদাম—
যার স্মৃতি আনে প্রণয়ের পুনরঙ্গীকার।

ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন,—

বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
কোনো সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী !—
ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি।

বিড়াল

আমার কামুক বুকে উঠে আয়, বিড়ালসুন্দরী,
বক্র নখ ঢেকে নে থাবায় ;
জেলে দে, মোহন চক্ষে, রত্ন আর ধাতুর মঞ্জরি-
ডুবে যাই অদ্ভুত আভায়।

নমনীয় পিঠে, ঘাড়ে, ঘুরে মরে অঙ্গুলি আমার
সোহাগের সুদীর্ঘ মন্থনে,
পুলকে মাতাল হাত গ'লে যায় তোর তনিমায়
স্পর্শময় বিদ্যুৎ-কম্পনে—

তখন তাকেই দেখি, অন্তরের অন্তরতমারে।
তার চোখে, বর্শার ফলক,
তোরই মতো, ছিন্ন করে হিম, গূঢ়, গম্ভীর অমারে,

আর তার আপাদমস্তক
শ্যামল শরীর ভ'রে ঝ'রে পড়ে অঙ্গের নিশ্বাস,
মারাত্মক মদগন্ধ, আর এক কুটিল বাতাস।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ছুটে এলো যুগপৎ দুই যোদ্ধা; অস্ত্রের সংঘাত
দ্যুতি আর শোণিত ছিটিয়ে দেয় আহত বাতাসে।
এই খেলা, লৌহনাদ যৌবনের—যখন হঠাৎ
উচ্চতানে ধরা পড়ে প্রণয়ের চীৎকৃত উচ্ছ্বাসে।

গেছে ভেঙে তলোয়ার!—আমাদেরই যৌবনের মতো,
প্রিয়তমা! কিন্তু আজ দাঁত আর নখের উৎসাহ
কৃপাণের বঞ্চনার প্রতিশোধে সবেগে উদ্যত।
—হা রে বৃদ্ধ হৃদয়ের ব্রণদুষ্ট প্রণয়ের দাহ!

দ্যাখো বীরদ্বয়ে, তারা বদ্ধ হ'য়ে ক্রূর আলিঙ্গনে
গড়ায় গহ্বরে, যেথা চিতা আর নেকড়ে দেয় হানা,
তাদের বিদীর্ণ ত্বক ফুল ফোটে শুকনো কাঁটাবনে।

—এই তো নরক, বহু বন্ধুদের নির্দিষ্ট ঠিকানা!
আয় রে অমানুষিক আমাজনী, গড়াই দু-জনে
মনস্তাপ ছুঁড়ে ফেলে, জ্বালাময় ঘৃণার বন্ধনে!

বারান্দা

প্রেয়সী, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা,
হে তুমি, সর্বস্ব সুখ, বাসনার সর্বস্ব আমার!
মনে কি পড়ে না সেই সোহাগের স্নিগ্ধ মধুরিমা,
সন্ধ্যার উদার মায়া, অগ্নিকুণ্ডে আতিথ্যবিস্তার,
হে তুমি, স্মৃতির মাতা, দয়িতার ঈশ্বরীপ্রতিমা।

চুল্লির জ্বলনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ!
সন্ধ্যা নামে বারান্দায়, রক্তিম গুণ্ঠনে রমণীয়—
পেলব তোমার বক্ষ, অন্তরে কী অমল কল্যাণ!
কত কথা আমাদের—ধ্বংসহীন, অবিস্মরণীয়—
চুল্লির দহনে দীপ্ত সেই সব সন্ধ্যার প্রয়াণ!

কোমল সন্ধ্যার তাপে কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার!
কী গভীর অন্তরিক্ষ! স্ফীত প্রাণ কেমন বিশ্বাসে!
তোমার আননে ঝুঁকে, ওগো রানী, আরাধ্যা আমার,
মনে হয় তোমার শোণিতগন্ধ পেয়েছি নিশ্বাসে।—
সেদিন, সন্ধ্যার তাপে, কী সুন্দর সূর্যের সম্ভার!

নেমে আসে রাত্রি, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল,
তোমার চোখের তারা অন্ধকারে আমার উদ্ধার,
নিশ্বাসে তোমার ঘ্রাণ—কী মধুর, তীব্র হলাহল!
ঘুমায় আমার হাতে, ভ্রাতৃভাবে, পা দুটি তোমার
যবে রাত্রি নামে, যেন অবরুদ্ধ অন্দরমহল।

জানি আমি মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে,
আমার অতীত, দেখি, তোমার জানুতে রাখে মাথা,
আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে
যদি না তোমারই প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা ?—
জানি সেই মন্ত্র, যাতে আনন্দিত মুহূর্তেরা ফেরে !

সেই সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন,
অগম্য গহ্বর থেকে আবার কি জন্ম নেবে তারা,
অতল সিন্ধুর তলে স্নান ক'রে সূর্যের যৌবন
যেমন নূতন হ'য়ে আকাশের প্রান্তে দেয় সাড়া ?
—হায়, সব অঙ্গীকার, গন্ধ, আর অনন্ত চুম্বন !

ভূতে-পাওয়া

আজ কম্বলে আবৃত সূর্যে তোমার মিল।
জীবনের চাঁদ ! তারই মতো মুখে টানলে ছায়া ;
হও ঘুমন্ত, গম্ভীর, মূক, ঝাপসা ধোঁয়া,
বা নির্বেদের অতলে ডুবিয়ে দাও নিখিল ;

তেমনি তোমাকে ভালোবাসি ! তবু, মর্জি হ'লে
এসো না বেরিয়ে গ্রহণমুক্ত তারার মতো
প্রগল্‌ভতার প্রলাপ যেথায় বিঘূর্ণিত,
ওঠো খাপ থেকে দীপ্ত ছুরিকা হঠাৎ ঝ'লে !

জ্বেলে নাও ঝাড়লণ্ঠনে ঐ চক্ষুজোড়া !
লুব্ধ চোখের লালসে জ্বলুক বখাটে ছোঁড়া !
আধুটে, অসুখী—যা তুমি, আমার সুখ তাতেই ;

যা-ই হও, কালো রাত্রি অথবা রঙিন ভোর,
আমার কম্প্র তনুতে একটি তন্তু নেই
যা বলে না : 'প্রিয় রাক্ষসী, আমি পূজক তোর !'

এক প্রতিভাস

১ : ছায়ারা

বন্দী আমাকে করেছে কুটিল নিয়তি,
একলা, অতল গহ্বরে যাপি যন্ত্রণা,
আলোর গোলাপ কখনো দেয় না সান্ত্বনা,
অন্ধ, বিকট রাত্রির নেই বিরতি।

আমি যেন অভিশপ্ত, নিঃস্ব চিত্রকার ;
পট নেই, শুধু ছায়ার উপর বুলোই তুলি,
রেঁধে খাই নিজ হৃৎপিণ্ডেরই তন্তুগুলি,
আর কোনো ভোজ নেই এ-খিন্ন বুভুক্ষার।

মাঝে-মাঝে, এই অমার দেয়ালে এলিয়ে আঁকা
দেখি যেন এক লাবণ্যময় গরিমা,
মুখশ্রী তার প্রাচ্য এবং স্বপ্ন-মাখা :

পূর্ণ রেখায় জেগে ওঠে যেই প্রতিমা,
উল্লাসে, ভয়ে শিউরে তখনই চিনতে পারি—
ছায়াচ্ছন্ন, অথচ দীপ্ত, এ-ই সে নারী !

২ : সুগন্ধ

গির্জায়, ধূপ যেখানে ছড়ায় বাস,
কিংবা পুরোনো কস্তুরী-পেটিকাতে,
দীর্ঘসূত্র মদালস লিপ্সাতে,
পাঠক, কখনো নিয়েছেন নিশ্বাস ?

নিগূঢ় সে-জাদু ! অপরূপ ! তার বরে
বর্তমানেই অতীত প্রত্যাগত,

তেমনি প্রেমিক, প্রিয় দেহে সন্নত,
স্মৃতির কান্ত কুসুম চয়ন করে।

ঘরের ধূপতি, সপ্রাণ এক থলে,
তার কেশভার, কোঁকড়া, নম্য, ঘন,
বন্য পশুর সৌরভ হানে যেন,

আর বেশবাস, মসলিনে মখমলে,
সগর্ভ তার বিশুদ্ধ যৌবনে,
পশুচর্মের গন্ধ বিলায় মনে।

৩ : ফ্রেম

অতি বিখ্যাত হোক না তুলির চিহ্ন,
সুন্দর ফ্রেমে ছবির মূল্যবৃদ্ধি,
তেমনি কী জানি অপরূপ সমৃদ্ধি
(সীমান্তহীন নিসর্গ থেকে ছিন্ন)

কনকে, পাথরে, অলংকরণে, রত্নে,
লাভ করে তার দুর্লভ সৌন্দর্য ;
তার উদ্ভাসে কিছুই নেই অসহ্য,
সব-কিছু তাকে পাড় দিয়ে ঘেরে যত্নে।

তার বসনেরে, এমনকি, মাঝে-মাঝে,
ভাবে সে প্রেমিক ; সাটিনের ভাঁজে-ভাঁজে
আর কাপাসের চুম্বনে করে মগ্ন

নগ্ন তনুর ইন্দ্রিয়হিল্লোলে ;
শ্লথ বা ক্ষিপ্র, তাই তার গতিভঙ্গ
বানরশিশুর আহ্লাদে যায় গ'লে।

৪ : প্রতিকৃতি

যা-কিছু আগুনে আমরা জলেছি দীপ্ত
ব্যাধি ও মরণ করে যে ভস্মীভূত।
আয়ত চক্ষু, অমন কোমল, দৃপ্ত,
ঐ ঠোঁট, যাতে হৃদয় পরিপ্লুত,

চুম্বনরসে ওষধির উৎসাহ,
প্রবল পুলক, রশ্মির চেয়ে দীপ্র—
আর অবশেষে ? হৃদয়, সে ভয়াবহ !
কিছু নয়, শুধু তিনরেখা এক চিত্র—

যা, আমারই মতো, প্রতিদিন, নির্জনে
বৃদ্ধ কালের উৎপাতে আসে ম'রে,
পিশুন, কঠিন পাখার আন্দোলনে…

শিল্পের অরি, জীবনহন্তা ওরে,
গৌরব, সুখ যতই করিস ভস্ম,
স্মরণে আমার র'বে তার সর্বস্ব।

একে সব

সেদিন সকালে শয়তান এলো চ'লে
উঁচু ঘরে আমি যেখানে লুকিয়ে থাকি,
ছিদ্রান্বেষী মনের কৌতূহলে
আমাকে ঠকাতে, শুধালো সে : 'বলো দেখি,

তার সম্পদ যত সুন্দর, ভালো,
যত মায়া তার মুখশ্রী রয় ছেয়ে,
যত সামগ্রী, অরুণ অথবা কালো,
সাজায় সে-তনু, তা থেকে, সবার চেয়ে

কোনটিকে মানো মধুর ?'—আমার মন !
ঘৃণ্য পিশাচে দিলে তুমি উত্তর :
'সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে তার পণ,
নির্বাচনের প্রশ্ন অবান্তর।

উন্মাদনার সাধারণে ডুবে গিয়ে
করি না লক্ষ বিশেষের মন্ত্রণা,
উষসীর মতো দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিয়ে
রাত্রিরূপিণী সে বিলায় সান্ত্বনা

মোহন তনুর ললিত নিয়ন্ত্রণে
একচ্ছন্দে বাঁধা যে-বিচিত্রতা,
তার তাল, মান, লয়ের বিশ্লেষণে
ব্যর্থ আমার মৌল অক্ষমতা।

এ কী অপরূপ রূপান্তরের মায়া !
সব ইন্দ্রিয় এক অন্বয়ে দান্ত—
নিশ্বাস তার সংগীতে নেয় কায়া,
কণ্ঠস্বরে সৌরভ নিষ্ক্রান্ত !'

কোন কথা আজ বলবি রাতে

রে নিঃসঙ্গ, কোন কথা আজ বলবি রাতে,
কী বলাব তুই, হৃদয়, পূর্ববেদনাহত,
প্রেয়সী, শ্রেয়সী রূপসীকে—যার দৃষ্টিপাতে
তুই আনন্দে ফুটলি আবার ফুলের মতো ?

—আমাদের সব গর্ব লাগাবো পূজায় তার :
তার বিধানের মতো মধুময় কী আর আছে ?
তার তনুতটে ঝরে স্বর্গের গন্ধভার,
জ্যোতির্বসন লাভ করি তার চোখের কাছে।

থাকি নিশীথের নির্জনতায় লুপ্ত,
চলি রাজপথে জনতায় প্রক্ষিপ্ত,
তার প্রতিভাস মশালের মতো ছড়ায় জ্যোতি ,

'সুন্দর আমি,' সে বলে, 'আমারই জন্য
শুধু সুন্দরে ভালোবেসে হবে ধন্য ;
আমি দেবদূত, কর্ত্রী, ম্যাডোনা, সরস্বতী !'

সপ্রাণ মশাল

ঐ দুটি দীপ্ত চোখ আমার সম্মুখে ছুটে চলে,
চতুর দেবদূতের হাতে গড়া নির্ভুল চুম্বক ;
স্বর্গীয় যমজ, তবু আমাকেও মানে ভাই ব'লে,
আমার দৃষ্টির 'পরে দোলে দুই প্রোজ্জ্বল হীরক ।

তাদের নির্দেশে আমি সুন্দরের নিত্য অনুগামী,
পাপের বাগুরা থেকে করে তারা আমাকে আড়াল ;
আমার সেবক তারা, তাদের দাসানুদাস আমি ;
আমার সত্তাকে বাধ্য রাখে সেই সপ্রাণ মশাল ।

মায়াময় দুই চোখ, দিবালোকে প্রদীপের মতো
রশ্মি জ্বলে তোমাদের ; সূর্য হোক লোহিতবরন,
সাধ্য নেই, অলৌকিক সে-বহ্নিরে করে প্রতিহত ;

সে-রশ্মি মৃত্যুর দূত, তোমাদের গানে জাগরণ ;
যা শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায় আত্মার প্রভাতে,
হে যুগ্ম তারকা, যাকে কোনো সূর্য পারে না নেবাতে !

অতিশয় লাস্যময়ীকে

রমণীয় কোনো দৃশ্যছবির মতো
ভঙ্গি তোমার, ললাটের আলো-ছায়া ;
হাসি খেলে মুখে, যেন সে সতেজ হাওয়া
স্বচ্ছ আকাশে বেড়ায় ইতস্তত।

বিরক্ত কোনো পথিকে, অন্যমনে
যদি ছুঁয়ে যাও, দৃষ্টি ধাঁধায় তার
দেখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি নির্বিকার
স্কন্ধ, বাহুর অমল আন্দোলনে।

তোমার প্রতুল প্রসাধন-পারিপাট্যে
ইন্দ্রধনুর তুমুল প্রতিধ্বনি ;
তা দেখে কবির মনের আঁধার খনি
জ'লে ওঠে কোন ফুলের নৃত্যনাট্যে।

মূঢ় বসনে কত না রঙের চিহ্ন
তোমারই চপল মনের চিত্রকল্প ;
মূঢ় রমণী ! মোহিনী নির্বিকল্প !
যত ভালোবাসি তত মানি তোকে ঘৃণ্য।

মাঝে-মাঝে, কোনো মনোহর উদ্যানে,
বিছিয়ে আমার পাণ্ডুরোগের ক্লান্তি,
দেখেছি, সৌর কিরণের উৎক্রান্তি
কঠিন ব্যঙ্গে বক্ষ আমার হানে।

বসন্ত, তার সবুজের আধিপত্যে
আমাকে পরম লজ্জা দিয়েছে ব'লে,

ফুলের আমোদ মাড়িয়ে পায়ের তলে
শাস্তি দিয়েছি প্রকৃতির ঔদ্ধত্যে।

সেইমতো, কোনো রাত্রে, আমার প্রাণে
বাসনা এগোয়, হামা দিয়ে, নিঃশব্দ—
রতির প্রভাবে প্রহর যখন স্তব্ধ—
তোর তনিমার রত্নের সন্ধানে।

হ'তে চাই তোর ফুল্ল তনুর হন্তা
ক্ষমাশীল স্তনযুগলে আঘাত ক'রে—
এবং ঊরুর বিস্মিত অন্তরে
দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক খন্তা।

তারপর—এ কী মধুর অপস্মার!—
ঐ অভিনব, উজ্জ্বলতর ঠোঁটে
সনির্বন্ধ প্রতিহিংসায় ছোটে
আমার তীব্র গরল—বোন আমার!

বৈপরীত্য

আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা?
লজ্জা, কান্না, অনুতাপ আর নির্বেদেরে?
অন্ধ রাতের আতঙ্ক, যার মন্ত্রণা
হৃৎপিণ্ডেরে কাগজের মতো দুমড়ে ছেঁড়ে?
আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা?

দয়াময়ী, তুমি কখনো জেনেছো ঘৃণার জ্বালা?
আক্রোশে দরবিগলিত চোখ, পাকানো মুঠি?
প্রতিহিংসার জগঝম্পের মাতাল পালা
বুদ্ধিরে করে বিহ্বল—আর দেয় না ছুটি!
দয়াময়ী, তুমি কখনো জেনেছো ঘৃণার জ্বালা?

হে স্বাস্থ্যবতী, তুমি কি দেখেছো ব্যাধির·পাল ?
জ্বর, হিম, ঘাম, নির্বাসনের পাংশুতায়
হুঁচটে কাঁপনে ভ'রে দেয় ম্লান হাসপাতাল,
অক্ষম ঠোঁটে কৃপণ রোদের ভিক্ষা চায় ?
হে স্বাস্থ্যবতী, তুমি কি দেখেছো ব্যাধির পাল ?

লাবণ্যময়ী, তুমি কি জেনেছো বিলোল জরা ?
ত্রিবলির ত্রাস, আর যে-নয়নে অনেকবার
গ্রন্থের মতো তাকিয়ে, শিখেছো নতুন পড়া,
সেখানে হঠাৎ ভীষণ, মৌন অন্ধকার ?
লাবণ্যময়ী, তুমি কি জেনেছো বিলোল জরা ?

কল্যাণী তুমি, আলোকে পুলকে পুণ্যপ্রাণ !
মরণের ক্ষণে ডেভিডের হ'তো সান্ত্বনা
তোমার দেহের নিঃসরণের দীপ্ত দান।
— আমার জন্য একবার কোরো প্রার্থনা,
কল্যাণময়ী, আলোকে পুলকে পুণ্যপ্রাণ !

স্বীকারোক্তি

শুধু একবার তোমার বাহুর দ্যুতি
আমার বাহুতে করেছিলে বিন্যস্ত ;
মধুর মহিলা ! সেই ক্ষণিকের স্মৃতি
মনের তিমিরে এখনো যায়নি অস্ত।

গভীর প্রহর ; নতুন টাকার মতো
চাঁদ ঢেলে দেয় গম্ভীর মধুরিমা,
সুপ্ত প্যারিসে ঝরে অপ্রতিহত
বন্যার মতো উদ্বেল পূর্ণিমা।

পা টিপে, লুকিয়ে, বিড়ালের আসা-যাওয়া,
কান খাড়া ক'রে, ছায়ার অন্তরঙ্গ ;
ওরা যেন মৃত প্রিয়ের প্রেতচ্ছায়া
সন্তর্পণে চায় আমাদের সঙ্গ ।

আলোর প্রসূন, অমল সে-বিনিময়ে
রম্য বীণার তুমি ছিলে বাণীমূর্তি,
অথবা স্বচ্ছ প্রভাতের বিস্ময়ে
তূর্যনাদের উদার স্বতঃস্ফূর্তি ;

অথচ সহসা, তোমারি কণ্ঠ টুটে
(যা ছিলো সহজ পুলকে ঝলকে পূর্ণ)
তীব্র, দারুণ আর্তনিনাদ উঠে
সে-বৈকুণ্ঠে ক'রে দিয়ে গেলো চূর্ণ !—

জঘন্য শিশু, বিকট, অঙ্গহীন,
জন্মালো যেন কুলে কলঙ্ক মেখে,
যাকে রাখা চাই নেপথ্যে বহুদিন
অদর্শনীয়, গুপ্ত গুহায় ঢেকে ।

হায় অপ্সরা, সেই কর্কশ ধ্বনি
শোনালো বার্তা : 'প্রমিতিরিক্ত বিশ্ব !
প্রসাধনে যত হোক সে পরিশ্রমী
অহমিকাতেই মগ্ন নিখিলদৃশ্য ;

রূপসী নারীর ব্যাবসা কঠিন অতি
গতানুগতির নিষ্ফল বাহুপাশে,
নর্তকী যেন, শীতল, বেতনবতী,
মূর্ছা গেলেও পুতুলের মতো হাসে ;

মূঢ় সে-জন, হৃদয়ে যে বাসা বাঁধে,
ক্ষণভঙ্গুর অনুরাগ, সৌন্দর্য—

সব জড়ো করে চিরন্তনের ফাঁদে
বিস্মরণের ক্ষমাহীন য়াৎসর্ব !'

আজো মনে পড়ে, শান্ত সে-অবকাশে
মৌন চাঁদের মায়াবী অভিব্যক্তি,
এবং ভীষণ, বর্বর বিশ্বাসে
হৃদয়ের সেই দুর্জয় স্বীকারোক্তি।

আধ্যাত্মিক উষা

আদর্শ, দংশনময়, আরঞ্জিত অরুণ প্রলেপে
পা টিপে যখন ঢোকে লম্পটের নির্গত নিশায়,
সে কোন গোপনচারী রহস্যের প্রতিহিংসায়
দেবতার উদ্বোধনে পাশবিক সুপ্তি ওঠে কেঁপে।

পতিত মানুষ, যার স্বপ্নে শুধু শাশ্বত যন্ত্রণা,
তাকে এই আকাশ, অপ্রাপণীয়, গহ্বরের মতো
অলৌকিক নীলিমায় আকর্ষণ করে অবিরত।
সেইমতো, হে দেবী অমলসত্তা, আমার সাধনা,

নির্বোধ ভোজের শেষে ধূম্রময় উচ্ছিষ্টের পারে
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি, বিরতিবিহীন,
তোমার সুন্দর স্মৃতি আরো স্বচ্ছ উদ্ভাসে রঙিন।

সূর্য ধীরে দেখা দেয়, মোমবাতি ডোবে অন্ধকারে ;
তেমনি, হে বিজয়িনী, স্মৃতিপটে তোমার উত্থান
মনে হয় জ্যোতির্ময় তপনের অমৃতসমান।

সান্ধ্য সুর

এই তো সেই লগ্ন, যবে বৃন্ত-'পরে দুলে
প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
গন্ধ আর শব্দ নিয়ে ঘূর্ণমান হাওয়া ;
করুণ ভাল্‌জ্‌-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে।

প্রতিটি ফুল মিলিয়ে যায় যেন ধূপের ধোঁয়া ;
বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
করুণ ভাল্‌জ্‌-নাচের তাল ফেনিয়ে ওঠে ফুলে ;
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া।

বেহালা, যেন আতুর প্রাণ, তীব্র তান তোলে ;
কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া।
বেদীর মতো আকাশে নামে বিষাদঘন মায়া,
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে।

কোমল প্রাণ, ঘৃণ্য তার শূন্য কালো বাওয়া,
কুড়িয়ে নেয় অতীতে যত আলোর কণা জ্বলে ;
রক্তঝরা উদ্‌গিরণে সূর্য যায় গ'লে···
তোমার স্মৃতি আমার বুকে তর্জনীর ছোঁওয়া !

কয়েকটি বিষ

মদের নেশা লুকিয়ে রাখে নোংরা গলি
অলৌকিকের বর্ণচোরা ঝলসানিতে,
খেয়ালি তার রঙিন ফেনার তলানিতে
ভেসে ওঠে তোরণ জুড়ে দীপাবলি
অস্তরাগের রশ্মি-জ্বলা কাহিনীতে।

আফিম আনে সীমাহীনের সম্ভাবনা,
দীর্ঘ করে মুহূর্তের চলার তালে ;
ঘণ্টা হয় গভীর, তার রক্ত ঢালে।
হৃদয়, সুখে ক্লান্ত হ'য়ে, উন্মাদনা
নিঙড়ে নেয় ধূসরিমার অন্তরালে।

এরাও নয় তার কাছে এক কানাকড়ি,
সবুজ চোখে হেলায় তুমি ছাঁকো যে-মদ,
এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল হ্রদ···
এগিয়ে মাথা, বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ি,
স্বপ্ন মেটে, দীর্ঘশ্বাসের দেনাও রদ।

কিন্তু তোমার নিষ্ঠীবনের নেই তুলনা—
বেঁধায় হুল, ধরায় জ্বালা। সকল মন
বিস্মরণের অমায় করে সমর্পণ,
জীবন ভ'রে জমিয়ে-তোলা সব ভাবনা
তরঙ্গিত প্রলয়ে দেয় বিসর্জন।

বিড়াল

১

আমার মাথায় চলে তার আনাগোনা,
যেন তা আপন অঙ্গনখানি তার—
প্রবল, মধুর, বিড়াল চমৎকার।
গোঙায় যখন, যায় কি না যায় শোনা।

সুর তার এত সূক্ষ্ম, যায় না ধরা,
অথচ কণ্ঠ, অনুযোগে আবেদনে,
গূঢ় বিলাস নিত্য জোগায় মনে,
তাই সে এমন কুটিল রঙ্গে ভরা।

আমার আঁধার সত্তায়, মোহাবিষ্ট,
দীপ্ত, তরল এই কণ্ঠের তান
আনে ছন্দের সুন্দর অভিযান,
ঢালে সম্ভোগে পূর্ণ দ্রাক্ষারিষ্ট।

তার কাছে, সব কষ্ট ঘুমিয়ে পড়ে,
নিখিলপুলকে দেয় সে অঙ্গীকার;
হেলায় হারিয়ে ভাষার অলংকার
বিনাবাক্যেই অমোঘ অর্থ ধরে।

হৃদয় আমার—অপরূপ এই যন্ত্রে
নেই কোনো ছড়, যার নিষ্ঠুর চাপে
এমন গভীর আবেগে তন্ত্রী কাঁপে
এমন বিশ্ববিজয়ী গানের মন্ত্রে,

যেমন তোমার কণ্ঠের মৃদু শব্দ,
রহস্যময় বিড়াল, স্বর্গদূত,
যে পারে বোঝাতে, উত্তল পঞ্চভূত
আসলে সূক্ষ্ম রেখায় ছন্দোবদ্ধ!

২

শুধু একবার আদর করেছি তাকে
কাল রাতে—আজো দেহ-মন নিস্পন্দ,
ঝরে অনুখন এমন মধুর গন্ধ
গৌর, শ্যামল, কোমল রোমের ফাঁকে।

বাস্তুভিটার আত্মা তাকেই ধরি;
অনুপ্রাণনে তারই নির্দেশ গ্রাহ্য,
বিচারে, বিধানে বাঁধে এক সাম্রাজ্য;
বুঝি বা সে কোনো দেবতা, না কি সে পরি?

এই যে বিড়াল, আমার প্রণয়পাত্র—
প্রেমিকের মতো চোখে-চোখে রাখি তারে,
কখনো আপন মনের অন্ধকারে
সন্তর্পণে চক্ষু ফেরানো মাত্র,

দেখি, বিস্ময়ে অবশ, আত্মহারা,
আমার নয়নে তাকিয়ে নিমেষ-হৃত,
সপ্রাণ মণি, স্বচ্ছ আলোর মতো
তার সাগ্নিক, হালকা চোখের তারা।

সুন্দর জাহাজ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্ঘাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার তুঙ্গ, উদ্দাম,
অনেক বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম—
যুগল ঢাল ধরে কত না
সুগোল, রেখান্বিত আলোক-রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয়—
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য—
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন কান্তিঝলকিত অজগর ;
প্রেমিক বাঁধা পড়ে, ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয়-কারাগারে, চিরদিন।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

ভ্রমণের আমন্ত্রণ

দয়িতা, কন্যা, বোন,
আমার স্বপ্ন শোন,
সে-দূর দেশে কি মধুর হ'তো না সবই,
অবসর, ভালোবাসা,
মরণ সর্বনাশা,
অবিকল তোর তনুর প্রতিচ্ছবি !
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে
সজল সূর্য আঁকে
আমাকে ভোলাতে, তোর চাহনির ছায়া,
যখন, অশ্রু-মেশা
রহস্যময় নেশা
বিলায় চোখের প্রবঞ্চনার মায়া।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জ্বলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

সেই দেশে, তোর ঘরে,
রশ্মি ঠিকরে পড়ে
বহু বৎসরে উজ্জ্বল আসবাবে,
বিরল ফুলের তোড়ায়
পাগল গন্ধ ছড়ায়
ঝাপসা ধূপের অনুকূল অনুভাবে।
কারু খিলানের কোণে
তলহীন দর্পণে
প্রাচ্য দেশের বৈভব বাঁধে বাসা,
সব ওঠে কথা ব'লে
গোপন হৃদয়-তলে,
বিজনে শোনায় মধুর মাতৃভাষা।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জ্বলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

দ্যাখ রে অলস খালে
বাঁধা সুপ্তির জালে
নৌকোর সারি—মেজাজ বাউণ্ডুলে ;
তোর নগণ্য সাধে
মেটাবার আহ্লাদে
নিখিলসাগরে ছোটে ওরা হেলে-দুলে।
অস্ত-সূর্যগুলি
ছড়ায় বর্ণধূলি
বেগনি, সোনালি—খালে, পথে, প্রান্তরে,
সকল নগর রাঙায় ;
টানে দিগন্ত-ডাঙায়
উষ্ণ আভার তন্দ্রার কন্দরে।

সেথা কিছু নেই, যা নয় আলোয় জ্বলা,
শান্তি, বিলাস, উৎসব, শৃঙ্খলা।

আলাপ

হেমন্তের অমল আকাশ তুমি, অরুণবরন !
অথচ সিন্ধুর মতো ফুলে ওঠে আমার বিষাদ,
এবং ভাটার টানে রেখে যায় কর্কশ লবণ—
অধরে স্মৃতির জ্বালা, কর্দমের পিচ্ছিল আস্বাদ।

বৃথাই তোমার হাত মূর্ছিত এ-বক্ষে ওঠে পড়ে ;
যা খোঁজো, প্রেয়সী, তার আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ,
দীর্ণ হ'য়ে নারীদের হিংস্র দাঁতে, সুতীক্ষ্ণ নখরে।
খুঁজো না হৃদয়, তাকে শ্বাপদেরা করেছে নিঃশেষ।

আমার হৃদয় এক জনতায় বিধ্বস্ত প্রাসাদ ;
সেখানে মাৎলামি, হত্যা, চুল-ছেঁড়া পাগল চীৎকার !
—নগ্ন তোমার স্তন আনে এক সুগন্ধি সংবাদ ! ...

হে সুন্দর, আত্মার হাতুড়ি, হানো অমোঘ উদ্ধার !
উৎসবের মতো দীপ্ত ঐ চক্ষে হুতাশন জেলে
দগ্ধ করো ছিন্ন চীর, জন্তুরা যা রেখে গেছে ফেলে।!

হেমন্তের গান

১

বেশি আর দেরি নেই, মগ্ন হবো হিম কালিমায় ;
বিদায়, ক্ষণিক গ্রীষ্ম ! নামে দিন দ্রুত অধঃপাতে !
এই তো এখনই শুনি—শান-বাঁধা চত্বরে নামায়
জ্বালানি কাঠের বোঝা, আর্তিময় ধ্বনির সংঘাতে।

আক্রোশ, আতঙ্ক, ঘৃণা, কয়েদির কঠিন খাটুনি—
সমস্ত প্রকাণ্ড শীত বাসা বাঁধে আমার সত্তায়,
হৃদয়েরে বেঁধে এক ঠাণ্ডা, লাল, দুর্ভর আঁটুনি,
যেমন মরন্ত সূর্য মেরুতটে নরকশয্যায়।

আবার কাঠের শব্দ ! নিরন্তর আমি কম্পমান !
ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, তা কি আরো ধ্বংসময় ?
হৃদয় আমার দুর্গ, অবিরাম গুরুগর্জমান
কামানের আক্রমণে অবশেষে মানে পরাজয়।

ব'সে-ব'সে মনে হয়—একতাল আঘাতে প্রহত—
কফিনে পেরেক ঠোকে ব্যস্ত এক দ্রুত অভিযান।
কার মৃত্যু ?—এই ছিলো গ্রীষ্ম, আজ হেমন্ত আগত !
এ-শব্দ, রহস্যময়, যেন কার অলক্ষ্য প্রস্থান।

২

তোমার দীঘল চোখে ভালোবাসি সবুজ উল্লাস,
অথচ, লাবণ্যময়ী, আজ তিক্ত সব অভিজ্ঞান.
না তোমার প্রেম, গৃহ, না তোমার আলস্যবিলাস
মনে হয় সিন্ধুনীরে আন্দোলিত রৌদ্রের সমান।

তবু, হে মঞ্জুল প্রাণ, ভালোবেসো আমাকে এখনো,
দয়িতা, ভগিনী, এই কৃতঘ্নের হও তুমি মাতা;
হও সেই ক্ষণিক মাধুরী, যার আবাস কখনো
সূর্যাস্ত, অথবা এক হেমন্তের দীপ্ত ঝরা পাতা।

বেলা যায়! কবর অপেক্ষমাণ; ক্ষুধিত মরণ!
তোমার জানুতে মাথা, অপসৃত ললাটের বলি,
মনে আনি তপ্ত, শাদা নিদাঘের বিষণ্ণ স্মরণ,
এবং হলুদ, নম্র হেমন্তের আলোর অঞ্জলি!

বিকেলের গান

যদিও তোর কুটিল ভুরু-জোড়া
দেয় তোকে এক ভঙ্গি অপরূপ
(নয় যা দেবদূতের অনুরূপ)—
মায়া-চোখের ডাইনি মনোহরা,

ওরে দারুণ, আহ্লাদিনী রতি—
মূর্তি নিয়ে যেমন পুরোহিত
আরাধনায় যায় ভুলে সংবিৎ,
আমার প্রেম তোকে জানায় নতি।

অরণ্য, আর মরুভূমির বাতাস
গন্ধ হানে ঝাঁকড়া ঘন চুলে,
মাথাটি তোর জানায় হেলে-দুলে
কত গোপন রহস্যের আভাস।

তুলনা তোর সন্ধ্যা মায়াবিনী ;
অঙ্গ জুড়ে, ধূপদানির মতো,
সুবাস ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত,
অপ্সরী তুই, উষ্ণ, তমস্বিনী।

ওষধি-রস হোক না যত কড়া,
হার মানে তোর আলস্যের কাছে,
কামকলা এমনি জানা আছে
তার প্রতাপে বাঁচে ঘাটের মড়া !

পৃষ্ঠদেশ, নিটোল স্তনযুগল—
জঘন তোর তাদের প্রেমে পড়ে ;
লাস্যময় শিথিল অবসরে
বালিশগুলো উল্লাসে হয় উতল।

মাঝে-মাঝে, অন্ধ আলোড়নে,
নাম-না-জানা আক্রোশে অস্থির,
প্রতিশোধের সন্ধানে গম্ভীর,
মিশিয়ে দিস চুম্বনে দংশনে।

শ্যামলী, তুই ব্যঙ্গে অতি চতুর,
হাসির বাণে আমায় ছিঁড়ে ফেলে,
তারপরে দিস হৃদয় ভ'রে ঢেলে
চাহনি তোর, চাঁদের মতো মধুর।

মনোহরণ রেশমি পায়ে, মোজা
আর সাটিনের চটির তলে ছড়াই

আমার যত সার্থকতার বড়াই,
প্রতিভা আর অদৃষ্টের বোঝা।

তোরই কাছে স্বাস্থ্য ফিরে পাই
বর্ণ আর আলোর অভিযানে,
আমার কালো সাইবেরিয়ার প্রাণে
বিস্ফোরণের সুতপ্ত রোশনাই!

কোনো ক্রেয়ল মহিলাকে

সৌর সোহাগে মন্থর দেশ, গন্ধে ভরা,
সেখানে দেখেছি, বেগনি গাছের কুঞ্জতলে
ঘন তালবনে আলস্য ঝরে কলস্বরা—
অজ্ঞাত এক ক্রেয়ল রূপসী একলা জ্বলে।

শ্যামল মোহিনী, উষ্ণ, মলিন বর্ণ ধরে;
গৌরবে গড়া গ্রীবার মোহন কান্তি;
প্রচুর তনুতে হেঁটে যায়, যেন মৃগয়া করে;
হাস্যে, নয়নে ঝলকে প্রমার শান্তি।

মাদাম, যদি এ-গরিমার দেশে কখনো আসেন,
যেখানে সবুজ লোয়ার, অথবা ব'য়ে যায় সেন্,
যোগ্য রূপসী, প্রাচীন পুরীর অনুপ্রাস,

ছায়ার বিতানে ঐ কালো চোখ জাগাবে তখন,
মুগ্ধ কবির হৃদয়ে হাজার গানের চরণ,
হবে সে কাফ্রি দাসের চেয়েও দাসানুদাস।

বিড়ালেরা

প্রৌঢ় ঋতুর আগমে, প্রণয় জানায় তাকে
উগ্র প্রেমিক, শীর্ণ কঠিন পণ্ডিতেরা—
নিকেতনমণি বিড়াল— দৃপ্ত কোমলে ঘেরা—
তাদেরই মতো সে, ঠাণ্ডার ভয়ে, ঘরেই থাকে।

জ্ঞানের, কামের সেতুবন্ধনে উদার বোধি,
খোঁজে সে বিজন, স্তব্ধ ভীষণ অন্ধকার ;
শবযাত্রায় অশ্ব হ'তো সে চমৎকার
এরেবস্ তার গর্ব ভাঙতে পারতো যদি !

স্ফিঙ্কসের মতো, নির্জনতার অঙ্কে লীন,
আলসে এলিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে সে অন্তহীন
ভাবের আবেশে মগ্ন মহান ভঙ্গিমায়,

উর্বর কটি, মায়াবী মন্ত্রে ফুলকি ছড়ায়,
এবং সূক্ষ্ম বালুর মতন রঙ্গিমায়
সোনার কণায় তারা জ্ব'লে ওঠে চোখের তারায়।

প্যাঁচারা

ইউ গাছের কালো ছায়ার খাপে
কোন বিদেশের দেবতা, প্যাঁচার দল,
ঘুরিয়ে লাল চক্ষু অবিরল
ফুলকি ছড়ায়।   তারা কেবল ভাবে।

নিথর তারা অসাড় হ'য়ে কাটায়,
যতক্ষণে বিষণ্ণ সেই যাম
হারিয়ে দিয়ে রবির সংগ্রাম
অন্ধকারের রাজত্ব না রটায়।

জ্ঞানীর চোখ, তা দেখে যায় খুলে,
হাতের কাছে যা আছে নেয় তুলে,
থামায় গতি, অবুঝ আন্দোলন ;

হায় মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
শান্তি তার এ-ই তো চিরন্তন—
কেবল চায় বদল, বাসা-বদল !

কবর

আজকে তোমার যে-তনুর অভিমান,
কোনো গম্ভীর নিশার অন্ধকারে
দয়া ক'রে, এক নোংরা নালার ধারে,
তাকে গোর দেবে কোনো সংখ্রিষ্টান।

সাধ্বী তারার অধিকৃত সেই ক্ষণে
জ্যোতিষ্কদের চোখেও ঘুমের চাপ
নেমে আসে, আর মাকড়শা জাল বোনে,
বিষাক্ত ডিমে বাচ্চা ফোটায় সাপ।

অভিশাপে সংবিদ্ধ মাথার 'পরে
শুনবে কেবল, সকল বছর ভ'রে,
তরক্ষুদের চীৎকার অশ্রান্ত,

কাঁদে আধপেটা ডাইনি-বুড়ির গোষ্ঠী
হাবা লম্পট বুড়োর কষ্টিনষ্টি,
চোর, গুণ্ডার শয়তানি চক্রান্ত।

ভাঙা ঘণ্টা

শীতের প্রখর রাত্রি, অগ্নিকুণ্ড ধুমল, চঞ্চল ;
কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া পুরাতন ঘণ্টার নিস্বনে
ভেসে আসে, দূর থেকে, ত্বরাহীন স্মৃতির দঙ্গল ;
মধুর তিক্ততাময় অনুভব ব্যাপ্ত করে মনে।

ধন্য সেই ঘণ্টা, যার কণ্ঠনালী সতেজ, সক্ষম
বার্ধক্যের প্রতিরোধে পুণ্য তানে ভ'রে দেয় দিক,
আশ্বাসের অনুবন্ধে অবিরল করে পরিশ্রম,
যেন এক শিবিরে চকিতচক্ষু প্রাচীন সৈনিক !

বিদীর্ণ আমার আত্মা ; নির্বেদের বাঁধন ছাড়াতে
গানের জনতা দিয়ে হিম হাওয়া চায় সে ভরাতে ;
অথচ, অনেক বার, মনে হয় তার ক্ষীণ স্বর

যেন এক মুমূর্ষুর নাভিশ্বাসে নিঃসৃত ঘর্ঘর,
যে মরে, মৃতের স্তূপে, বিস্মরণে, নিশ্চল নিষ্ঠায়,
রক্তের হ্রদের তীরে, অবিরাম বিরাট চেষ্টায়।

বিতৃষ্ণা

বিরক্ত বর্ষার মাস অবিরল সমস্ত শহরে
অফুরন্ত পাত্র থেকে ঢালে তার ঠাণ্ডা অন্ধকার,
সন্নিকট গোরস্থানে মুছে-আসা মৃতদের 'পরে,
আর ম্লান শহরতলিতে ঢালে মরত্বের ভার।

পোকা-পড়া শীর্ণ দেহ অবিশ্রাম ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে
মেঝেতে বিছানা খুঁজে হয়ে হ'লো আমার বিড়াল,
শীতে-কাঁপা, বিষণ্ণ প্রেতের স্বরে কে চলে চেঁচিয়ে
নর্দমার জলোচ্ছ্বাসে—কোন বৃদ্ধ কবির কঙ্কাল।

ঘণ্টার বিলাপে পড়ে ধূমায়িত চিমনির নিশ্বাস,
শ্লেষ্মাভরা কাংস্যরবে পেণ্ডুলাম রটায় হতাশ ;
ইতিমধ্যে বাসিগন্ধ জীর্ণ তাসে—মারাত্মক নেশা

রেখে গেছে বৃদ্ধ মৃত শোথরোগী, দিয়ে গেছে দাম-
ইস্কাবনি বিবি আর হরতনের সুকান্ত গোলাম
তাদের ক্ষয়িত কাম লক্ষ্য ক'রে জমায় তামাশা।

বিতৃষ্ণা

হাজার বছর যেন বেঁচে আছি, এত স্মৃতি জমেছে আমার।

ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড দেরাজ এক, খোপে-খোপে যার
রয়েছে দলিল, পদ্য, প্রেমপত্র, শস্তা উপন্যাস,
হলুদ রশিদে মোড়া কবেকার দীপ্ত কেশপাশ—
তারও বেশি গুপ্ত আছে মগজের বিষণ্ণ কোটরে।
সে যেন গহ্বর এক, পিরামিড ; বিরাট জঠরে
যত শব ধরে, তত গোরস্থানে কখনো পড়ে না।
—আমি এক আঁধার কবরখানা, চাঁদের অচেনা ;
যেন মূর্ত মনস্তাপ, দীর্ঘকায় কৃমিরা সেথায়
যে-মৃত আমার প্রিয়, তাকে নিত্য খুঁটে-খুঁটে খায়।
বিবর্ণ গোলাপে ভরা আমি এক জীর্ণ অন্তঃপুর,
সেকেলে কাঁচুলি, জামা ঝুলে আছে বিস্রস্ত, প্রচুর,
আর শুধু করুণ পাস্টেল-চিত্র, দুটি ম্লান বুশে
অন্তঃসারশূন্য এক করঙ্কের গন্ধ নেয় শুষে।

এই খঞ্জ দিবসেরে দীর্ঘতায় কে পারে ছাড়াতে—
যখন, তুষারময় বৎসরের হিমার্ত কারাতে
ব্যাপ্ত হয় নির্বেদ—চেতনারিক্ত জড়ের সন্তান—
ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।

—আজ থেকে, সপ্রাণ পদার্থ, তোর স্বরূপ নিশ্চিত
শুধু এক শিলাখণ্ড, নামহীন ত্রাসে পরিবৃত,
পুরাতন স্ফিঙ্কস এক, সাহারার অস্পষ্ট অকূলে
তন্দ্রায় বিলীন, তাকে উদাসীন বিশ্ব রয় ভুলে,
মানচিত্রে নাম নেই, পাশবিক ভঙ্গিমায় তার
ক্ষণিক সূর্যাস্তরাগ গান গায় শুধু একবার।

বিতৃষ্ণা

আমি যেন রাজা, যার সারা দেশ বৃষ্টিতে মলিন,
ধনবান, নষ্টশক্তি, যুবা, তবু অতীব প্রবীণ,
শিক্ষকের নমস্কার প্রত্যহ যে দূরে ঠেলে রেখে,
শিকারি কুকুর নিয়ে ক্লান্ত করে নিজেই নিজেকে।
কিছুই দেয় না সুখ—না মৃগয়া, না শ্যেনচালন,
না তার অলিন্দতলে মৃতপ্রায় তারই প্রজাগণ।
মনঃপূত বিদূষক প্রহসনে যত গান গাঁথে,
আনত ললাট থেকে রোগচ্ছায়া পারে না সরাতে ;
ফুলচিহ্নে আঁকা তার শয্যা. তাও নেয় রূপান্তর
কবরে, এবং যার সাধনায় রাজারা সুন্দর,
জানে না সে-মেয়েরাও, লজ্জাহীন কোন প্রসাধনে
আমোদ ফোটানো যায় এ-তরুণ কঙ্কালের মনে।
করেন কাঞ্চনসৃষ্টি, সে-মুনিব মেলেনি সন্ধান
কোন বিষময় দ্রব্যে অহোরাত্রি নষ্ট তার প্রাণ।
এমনকি রক্তস্নান, লিপ্ত যাতে সব ইতিহাস,
পুরাতনী রোমকের, অর্বাচীন দস্যুর বিলাস,
তাও এই মূঢ় শবে তাপলেশ পারে না জোগাতে,
লিথির সবুজ স্রোত—রক্ত নয়—বহে যে-শিরাতে।

বিতৃষ্ণা

নির্বেদের নিত্যভক্ষ্য যে-হৃদয় বিলাপে আতুর,
তাকে চাপে যখন ঢাকনার মতো আনত আকাশ,
আর এক কালো দিন, যা রাত্রির চেয়েও বিধুর,
হানে আমাদের দিকে দিগন্তের অখণ্ড বিন্যাস ;

যখন পৃথিবী ডুবে যায় এক স্যাঁৎসেঁতে পাতালে,
যেখানে দুর্বল আশা, বাদুড়ের মতো ঘুরে-ঘুরে
পলাতে পারে না, ঠোকে ত্রস্ত পাখা দেয়ালে-দেয়ালে,
অবশেষে পোকা-পড়া পচা ছাতে মরে মাথা খুঁড়ে ;

যখন প্রকাণ্ড কোনো গারদের অবিরল শিক
নেমে আসে বর্ষণের পরিকীর্ণ বিরাট ধারায়,
নিঃশব্দ মনুষ্যদল, মাকড়শার মতো পাশবিক,
যখন জঘন্য ঊর্ণা আমাদের মস্তিষ্কে ছড়ায় ;

অকস্মাৎ ঘণ্টাগুলি লম্ফ দেয় অসংবৃত রোষে,
আকাশের প্রান্তে হানে ভয়ংকর কর্কশ চীৎকার,
ভূমিচ্যুত, অনিকেত প্রেতদল শূন্যে যেন ফোঁশে,
সে-বিকট বিলাপের তৃপ্তি নেই, ক্লান্তি নেই আর।

—আর ধীরে, আমার আত্মার পথে, নাদবাদ্য বিনা
চলে দীর্ঘ শবযাত্রা, সারি-সারি কফিনের যান ;
আশা, পরাজিত, কাঁদে ; অত্যাচারী বীভৎস যন্ত্রণা
আমার আনত শিরে রোপে তার কৃষ্ণ নিশান।

আবেশ

তোর কাছে ভীত আমি, মহাবন, যেন কাথিড্রাল ;
অর্গানগর্জন তোর ; আমাদের শাপাক্ত হৃদয়—
শোকের প্রকোষ্ঠ ; সেথা নাভিশ্বাস নিত্য দেয় তাল—
তোর 'অন্ধকার থেকে' স্বননের প্রতিধ্বনিময়।

তোকে ঘৃণা করি, সিন্ধু ! যত তোর লম্ফ, চ্যাঁচামেচি,
খুঁজে পাই আমার আত্মার তলে। যে-তিক্ত উল্লাস
অপমানে ক্রন্দনে নিবিড় হ'য়ে বলে, 'হেরে গেছি'—
সে-বিরাট অট্টহাসি ফিরে দেয় তোর জলোচ্ছ্বাস।

কত সুখী হবো আমি, যদি চেনা ভাষায় প্রকট
নক্ষত্রকিরণে, রাত্রি, লুপ্ত ক'রে দিস একেবারে।
কেননা আমি যে খুঁজি কালো আর নগ্ন শূন্যতারে

কিন্তু ঘোর অন্ধকার—সে নিজেই হ'য়ে ওঠে পট
যেখানে আমার চক্ষু জন্ম দেয় বিপুল সংখ্যায়
সে-সব অতীতে, যারা চেনা চোখে এখনো তাকায়।

লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা

খিন্ন প্রাণ, একদা ছিলো সংগ্রামে আনন্দ তোর,
দীপ্ত আশা, রেকাব যার আগুন হানে রাত্রিদিন,
সে আর নয় সওয়ার তোর ! ঘুমো রে তবে লজ্জাহীন,
হুঁচট-খাওয়া জীর্ণ ঘোড়া, খন্দ-খানায় ভাঙলো জোর।

হৃদয়, তবে নে মেনে তুই পশুর মতো ঘুমের ঘোর।

বুড়ো ডাকাত ! জড়ায় তোকে পরাজয়ের অন্ধকার,
দেয় না দোলা যুদ্ধ, প্রেম ; রতির হ'লো সর্বনাশ !
বিদায়, তবে কাংস্য গান, বাঁশির প্রিয় দীর্ঘশ্বাস !
বিষাদময় হৃদয়ে নেই প্রলোভনের অঙ্গীকার।

বিশ্বজয়ী বসন্ত যায়, ফুরালো তার গন্ধভার !

প্রতিক্ষণে আমায় টানে অতল খাদে অসীম কাল,
যেন বিশাল তুষারপাতে লুপ্ত এক কঠিন শব,
সুগোল এই ভূগোল জুড়ে দেখেছি অস্তিত্ব সব,
খুঁজি না আর কোথাও বাসা, ক্ষুদ্র কোনো অন্তরাল।

নে, তবে নে আমায় টেনে, আভালাঁশের ধ্বংস-তাল।

অনুকম্পায়ী ত্রাস

অস্থির, তোর ভবিতব্যের মতো,
এবং ভয়াল, পাংশু গগন-তল
তোর ও-শূন্যে নামায় অনবরত
সে কোন চিন্তা ? লম্পট, কথা বল !

—তৃষ্ণা আমার তৃপ্তি আজো না শেখে,
অনিশ্চয়ের আঁধারেই আনাগোনা,
বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন স্বর্গ থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না।

ছিন্ন আকাশে সৈকত অনুমান,
তোমাতেই দেখি আমার অহংকার ;
তোমার মেঘের বিষণ্ণতার ভার

সে যেন আমারই স্বপ্নের শবযান,
এবং তোমার রশ্মিতে তারই ভাষা
যে-নরকে আমি বেঁধেছি সুখের বাসা।

আত্ম-প্রতিহিংসা

জে. জি. এফ-কে

মারবো আমি তোকে, যেন কসাই,
ঘৃণার লেশ নেই, শূন্য মন,
কিংবা শিলাতটে মুশা যেমন!
তাহ'লে আঁখি তোর যদি খসায়

আমার সাহারার সান্ত্বনাতে
দুঃখধারা এক উচ্ছ্বসিত;—
আমার অভিলাষ, আশায় স্ফীত
সে-লোনা জলে পারে ভাসতে যাতে

নোঙর-তুলে-নেয়া তরী যেমন।
মাতাল এ-হৃদয়ে কান্না তোর
শব্দ তুলে ক'রে দিক বিভোর,
ঢাকের নাদে যেন আক্রমণ!

নই কি আমি এই দিব্য গানে
স্বরের অন্বয়ে এক বেসুর,
যেহেতু ব্যঙ্গের মুঠি চতুর
আমার সত্তারে নিত্য হানে?

আমারই কণ্ঠ সে—কী জঞ্জাল!
আমারই কালো বিষ রক্তে মাতে!
আমি সে-উৎকট মুকুর, যাতে
আপন মুখ দ্যাখে সে-দজ্জাল।

আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি !
আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল !
চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল !
আমিই জল্লাদ, আমিই বলি।

ছন্নছাড়া আমি শূন্যবাসী
আপন হৃদয়ের রক্ত গিলে,
কখনো প্রীত হ'তে শিখিনি ব'লে
আমার আছে শুধু অট্টহাসি।

প্রতিকারহীন

১

পুরুষ, আকৃতি, সত্তা সে যা-ই হোক
নভতল থেকে বিচ্যুত, ছুটে চলে
ধাতুপঙ্কিল স্টিক্সের ধারাজলে
যেথায় কখনো পশে না সূর্যালোক ;

এক দেবদূত, বিকৃতির প্রেমে লুব্ধ
এ-বিশাল দুঃস্বপ্নের তল খোঁজে,
সাঁতারু যেমন ঢেউয়ের সঙ্গে যোঝে
তেমনি বিকট কষ্টে চালায় যুদ্ধ,

দুঃসাহসের প্রভাবে ভ্রাম্যমাণ !
বিরুদ্ধে তার, যেন পাগলের সংঘ,
নেচে, গান গেয়ে, অমার অন্তরঙ্গ,
ধায় ঘূর্ণির দুর্মদ অভিযান ;

সে এক দুঃখী, ডাইনি-মন্ত্রে ম'জে
হাৎড়ে বেড়ায়, সাপের বিবরে বন্দী,
যদিও পলাতে নানামতো করে ফন্দি
চাবি, বাতি আর রশ্মি বৃথাই খোঁজে ;

অভিশপ্ত সে, চিরতমসার সঙ্গী,
নামে পূতিবাস-উচ্ছ্বাসী গহ্বরে,
যা তার পিছল গভীরে ব্যক্ত করে
এক বৃতিহীন অসীম সোপানপঙক্তি,

যেথা জঘন্য জন্তুরা নেয় পিছু—
ক্লিন্ন গাত্র, চক্ষে আগুন জেলে
রাত্রিকে আরো কবন্ধ ক'রে তোলে,
নিজেদের ছাড়া দেখায় না আর-কিছু।

সে এক তরণী, বরফের ফাঁদে পড়া,
অসহায় মেরুসীমান্তে সংবিদ্ধ,
খোঁজে, কোনখানে সে-কালান্তক ছিদ্র
যা দিয়ে এমন পরিণামে দিলো ধরা;

—নির্ভুল ছবি, নিখুঁত প্রতীক এরা
প্রতিকারহীন নিষ্ঠুর নিয়তির,
ভাবতে শেখায় শয়তান মহাবীর,
যা করে তাতেই ওস্তাদি তার সেরা।

২

অমল, গভীর সংলাপে দেয় সাড়া
যে-হৃদয় তার আপন মুকুর হ'লো!
সত্যের কূপ, স্বচ্ছ এবং কালো,
কম্পিত যেথা পিঙ্গল এক তারা,

আলোর স্তম্ভ নারকী কৃপায় ধন্য,
ব্যঙ্গশিখায় পিশাচের ব্যঞ্জনা,
এক গৌরব, অনন্য সান্ত্বনা,
—পাপকর্মের অবিকল চৈতন্য!

প্যারিস-চিত্র

সূর্য

পুরোনো শহরগুলি, জীর্ণ ঘরে যেখানে খড়খড়ি
গুপ্ত কোনো ব্যসনের কুঞ্জবনে সতর্ক প্রহরী,
যখন নিষ্ঠুর সূর্য তীক্ষ্ণ তীর দ্বিগুণিত করে
নগর, প্রান্তর, শস্য, সারি-সারি ছাতের উপরে,
আমি একা, অদ্ভুত ব্যায়ামে মগ্ন, পথে হেঁটে-হেঁটে
কখনো চমকে উঠি ফুটপাতে কথার হোঁচটে,
কোণে-কোণে মিলের দৈবাৎ-পাওয়া গন্ধের সংকেতে
হুমড়ি খেয়ে পড়ি কোনো বহুদিন-ঈপ্সিত পঙক্তিতে।

পূষণ, পালক পিতা, পাণ্ডুতার শত্রু, তার তাপে
নিরপেক্ষ উজ্জীবন ঝ'রে পড়ে পতঙ্গে গোলাপে;
দুশ্চিন্তা উবিয়ে দেয় উন্মীলিত নীলিমার দিকে,
আনে এক নূতন পূর্ণতা সব মস্তিষ্কে, মৌচাকে।
সে-ই দেয় যৌবন ফিরিয়ে, যার আবেশে খঞ্জেরা
শিশুর আহ্লাদে মাতে; নবান্নের সুপক্ক পসরা
বৃদ্ধি পায় অমোঘ আদেশে তার, ধন্য হয় সেই
অমর হৃদয়, যার স্বর্গসুখ কেবল বেঁচেই।

যখন, কবির মতো, অবতীর্ণ হয় সে নগরে,
হীনতম বস্তুদের মহামূল্যে উচ্চে তুলে ধরে;
উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে
আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।

লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে

লাল চুলের, ফর্সা, একমুঠো
বালিকা, তোর ঘাঘরা-ভরা ফুটো
দেখায় তোকে অকিঞ্চন অতি
এবং রূপবতী।

স্বাস্থ্যহীন তরুণ তনু তোর
ছুলির দাগে চোখে লাগায় ঘোর,
আমাকে দেয় মধুরতার ছবি—
আমি, গরিব কবি।

কাঠের জুতোর গরবে তোর, মানি,
লজ্জা পায় উপন্যাসের রানী;
চলুন তিনি কিংখাবের জুতোয়;—
ভঙ্গি তোকে জিতোয়।

ন্যাকড়া-কানি ঢাকে না তোর লাজ;
তার বদলে দরবারি এক সাজ
নিস্বনিত লম্বা ভাঁজে-ভাঁজে
পড়ুক পায়ের খাঁজে;

রন্ধ্রময়, ছিন্ন মোজা জোড়া,
তার বদলে সোনার এক ছোরা
জঙ্ঘা তোর যেন মোহন রেখায়
লম্পটেরে দেখায়;

হালকা গেরো উন্মোচন করুক
দুটি চোখের মতো রে তোর বুক
দীপ্তিময়—লাবণ্যের চাপে
আমরা জ্বলি পাপে;

নির্বসনের সময় বাহুযুগল
যেন অনেক আরজিতে হয় উতল,
ফিরিয়ে দিতে না যেন হয় ভুল
দুর্জনের আঙুল,

যত সনেট লিখে গেছেন বেলো,
বাছাই-করা মুক্তো ঝলোমলো,
বান্দারা তোর বন্দনাতে দান
দিক না অফুরান,

হতচ্ছাড়া কবির দল, খাতায়
নামটি তোর লিখুক প্রথম পাতায়,
কুড়িয়ে নিতে খুঁজুক ছলছুতো
সিঁড়ির চটিজুতো ;—

চটি তো নয়, কোমল এক নীড়,
তার লোভে যে বেয়ারাগুলোর ভিড়,
আড়ি পাতেন ওমরাহেরা নাচার,
এবং অনেক র্‌ঁসার !

ফুলের চেয়ে আরো অনেক বেশি
শয্যা তোর চুমোয় মেশামেশি,
তোর ক্ষমতার বিপুল পরিমাণে
ভালোয়া হার মানে !

—অবশ্য তুই এখন ভিখারিনী
ঐ যেখানে চলছে বিকিকিনি,
হাত বাড়িয়ে দাঁড়াস চৌকাঠে
শস্তা মালের হাটে ;

আহা রে তোর চক্ষু ভরে জ্বালায়
চোদ্দ আনা দামের মোতির মালায়,

সেটাও তোকে—মাপ করো গো মিতে—
পারি না আজ দিতে।

তাহ'লে তুই এমনি চ'লে যা রে,
বিনা সাজে, গন্ধে, অলংকারে,
শীর্ণ দেহে নগ্নতাই শুধু
সাজাক তোকে বঁধু!

রাজহাঁস

ভিক্তর উগো-কে

১

আন্দ্রোমাকি, তোমাকে স্মরণ করি! সেই প্রস্রবণ,
যা তোমার বিশাল বৈধব্য-দশা বুকে নিয়ে, কবে
হয়েছিলো বিষাদে প্রদীপ্ত এক শোকের দর্পণ,
মিথ্যাচারী সিময়ীস, পরিপ্লুত অশ্রুর গৌরবে,

তা ভেবে আকুল হ'লো, সুপ্রসবী স্মৃতির মঞ্জরী
হঠাৎ, নূতনতর কারুজেলে পা দিয়ে সেদিন।
হায়, নেই পুরোনো প্যারিস আর (এ-মহানগরী
নিত্যপরিবর্তমান, হৃদয়ের চেয়েও স্বাধীন);

তবু মনে-মনে আমি দেখি সেই বিলুপ্ত আবাস,
সারি-সারি ঝাপসা ছাদ, ইট-খসা, কার্নিশ, দেয়াল,
নর্দমার ক্ষরণে সবুজ পিণ্ড, মধ্যে কিছু ঘাস,
আর কত ইতস্তত জ'মে-ওঠা উজ্জ্বল জঞ্জাল।

পশু, পাখি নিয়ে ছিলো খেলোয়াড়। আমি একদিন
ভোরবেলা, যখন হিমেল, স্বচ্ছ আকাশের তলে
জেগে ওঠে পরিশ্রম, আর শান্ত, শব্দহীন
বাতাসে তুফান তুলে তীব্র যান ছোটে দলে-দলে,

এখানে দেখেছিলাম, ফুটপাতে, এক রাজহাঁস,
খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া, জালি-পায়ে কষ্টে হেঁটে চলে
কঠিন জমিতে টেনে পালকের ধবল উচ্ছ্বাস।
নির্জলা নালার ধারে অভাগার চঞ্চুপুট খোলে,

গলিতে ধুলোর মধ্যে স্নান ক'রে, কাতর, অদ্ভুত,
প্রশ্ন করে—জন্মের লাবণ্য-হ্রদে উচ্ছল পরান—
'জল, কবে বৃষ্টি হবে ? কবে তুমি জ্বলবে, বিদ্যুৎ ?'
আমি সে-দুঃখীরে দেখি, অরুন্তুদ, আশ্চর্য পুরাণ,

আকাশেরে লক্ষ্য ক'রে, ওভিদের নায়কের মতো
(ঐ নীল আকাশ, হৃদয়হীন, ব্যঙ্গপরায়ণ)
বাড়িয়ে কম্পিত গ্রীবা, কণ্ঠদেশ তৃষ্ণায় প্রহৃত,
যেন তিক্ত ভর্ৎসনায় বিধাতারে করে সম্বোধন !

২

প্যারিস নূতন হোক ! অবিকল আমার বিষাদ !
অচল হৃদয়ে সব স্মৃতি যেন পাষাণ-ফলক,
পুরাতন উপকণ্ঠ, পথ, ভারা, নূতন প্রাসাদ
হ'য়ে ওঠে সেখানে প্রণয়চিহ্ন, কঠিন রূপক।

তাই, লুভরের পথে, আমার স্মরণে করে দাবি
মরালের চিত্রকল্প, নির্বাসনে নির্বোধ, মহান,
উন্মাদের মতো ভঙ্গি, আর তার চিত্তে অফুরান
কোন এক বাসনার জ্বালা ! তখন তোমাকে ভাবি

আন্দ্রোমাকি, দয়িতের বাহুচ্যুত, পাশব অভ্যাসে
পিরুহুসের দৃপ্ত হাতে সমর্পিত, তুমি, পুনর্নবা,
আনন্দে আনত হ'লে শূন্যগর্ভ সমাধির পাশে ;
হায়, হেলেনুস-জায়া, হেক্তোরের সন্তপ্ত বিধবা !

আর ভাবি, কর্দমে আস্তীর্ণ পথে, কাফ্রি রমণীরে,
ক্ষুধিত, যক্ষ্মায় কৃশ, এই ব্যাপ্ত কুহেলি-দেয়াল
কাটাতে পারে না, তবু ক্লান্ত চোখে খোঁজে ফিরে-ফিরে
অপরূপ আফ্রিকার অপহৃত অদৃশ্য তমাল ;

ভাবি, কে হারালো তা-ই, কোনোদিন যা ফিরে পাবে না,
তৃষ্ণা কার মেটায় অশ্রুর ধারা, আর সহৃদয়
বাঘিনীর মতো দুঃখ স্তন্য দিয়ে শোধ করে দেনা ;
মরন্ত ফুলের মতো ভিখারির বিশীর্ণ বিলয় !

অরণ্য আমার আত্মা, দীর্ণ ক'রে তার নির্বাসন
তূর্যনাদে বেজে ওঠে প্রাচীন স্মৃতির ব্যাকুলতা !
দূর দ্বীপে বিস্মৃত মাল্লার দল, ম্লান বন্দীগণ,
পরাজিত, ক্রীতদাস !···ভাবি আরো অনেকের কথা।

অন্ধেরা

ভেবে দ্যাখো, হৃদয়, নিশার স্বপ্ন যাদের চালক !
অনন্ত, অস্পষ্ট ওরা, হাস্যকর, আতঙ্কে অতুল ;
কিংবা যেন দোকানের জানালায় সাজানো পুতুল ;
কে জানে কোথায় হানে নিরালোক চক্ষুর গোলক।

ঐ সব চোখ, আর ঐশ্বরিক ফুলকি নেই যাতে,
তবু করে, আকাশে উত্থিত হ'য়ে, দূরের সাধনা,
একলক্ষ্য, অর্থহীন ; গুরুভার মাথার ভাবনা
কখনো, স্বপ্নের তলে ডুবে গিয়ে, নামে না ফুটপাতে

চিরন্তন শুব্ধতার সহোদর, অনন্ত শর্বরী
পার হ'য়ে ধীরে-ধীরে চলে তারা। হে মহানগরী !
তুমি যবে নেচে, কুদে, চারদিকে তুলে উচ্চতান

হ'য়ে ওঠো প্রমোদের যন্ত্রণার প্রেমিক প্রহরী—
আমিও প্রগাঢ়তর মূঢ়তায় পথে-পথে ঘুরি,
আর ভাবি : ঐ যে অন্ধেরা, ওরা নভতলে কী করে সন্ধান ?

এক পথচারিণীকে

গর্জনে বধির ক'রে রাজপথে বেগ ওঠে দুলে।
কৃশতনু, দীর্ঘকায়, ঘন কালো বসনে সংবৃত,
চলে নারী, শোকের সম্পদে এক সম্রাজ্ঞীর মতো,
মহিমামন্থর হাতে ঘাঘরার প্রান্তটুকু তুলে—

সাবলীল, শোভমান, ভাস্করিত কপোল, চিবুক।
আর আমি—আমি তার চক্ষু থেকে, যেখানে পিঙ্গল
আকাশে ঝড়ের বীজ বেড়ে ওঠে, পান করি, কম্পিতবিহ্বল
মোহময় কোমলতা, আর এক মর্মঘাতী সুখ।

রশ্মি জ্বলে···রাত্রি ফের !—মায়াবিনী, কোথায় লুকোলে ?
আমাকে নতুন জন্ম দিলো যার দৃষ্টির প্রতিভা—
আর কি হবে না দেখা ত্রিকালের সমাপ্তি না-হ'লে ?

অন্য কোথা, বহু দূরে ! অসম্ভব ! নেই আর সময় বুঝি বা !
পরস্পর-অজ্ঞতায় স'রে যাই—আমারই যদিও
কথা 'ছলো তোমাকে ভালোবাসার, জানো তা তুমিও !

সান্ধ্য প্রদোষ

সন্ধ্যা আসে, মোহিনী সুন্দরী সন্ধ্যা ; দুষ্ক্রিয় দুর্জনে
সখ্য দেয় ; আসে যেন ষড়যন্ত্রী, তরক্ষুচরণে ;
বিশাল পর্দার মতো আকাশ ক্রমশ বোজে, আর
অধৈর্য মানুষ নেয় পশুত্বের বন্য অঙ্গীকার।

হে সন্ধ্যা, মধুর সন্ধ্যা, তুমি তারই ঈপ্সিত প্রহর
হাতে যার আজিকার দিনব্যাপী শ্রমের স্বাক্ষর
সত্যই অঙ্কিত!—তুমি সেই সব আত্মার সান্ত্বনা,
দুরন্ত দুঃখের তাপে দগ্ধ যারা ; যে-অনন্যমনা
পণ্ডিতের নতশির এতক্ষণে ভারাক্রান্ত হয়,
যে-শ্রমিক ন্যুব্জপৃষ্ঠে ফিরে পায় শয্যার আশ্রয়।

ইতিমধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত পিশাচের দঙ্গল, সহসা
গুরুভারে জেগে উঠে, শুরু করে দৈনিক ব্যবসা।
খড়খড়ি কাঁপায় তারা, পরদা ছেঁড়ে, দরোজা ধাক্কায় ;
বাতাঘাতে উৎপীড়িত আলোকের অস্থির ছায়ায়
রঙিন গণিকাবৃত্তি প্রজ্বলিত হ'লো ইতস্তত
পথে-পথে, অবাধ পুরীষস্রাবী বল্মীকের মতো ;
খোলে সে নিগূঢ় গলি দিকে-দিকে ; চতুর সংকেতে
আকস্মিক অতর্কিত আক্রমণে শত্রু যেন জেতে ;
ক্লেদের নগর এই—তার বুকে চলে এঁকে-বেঁকে,
যেমন শঙ্কিত কৃমি মানুষের চক্ষু থেকে ঢাকে
খাদ্য তার। এদিকে ছ্যাকছ্যাক শব্দে জাগে রান্নাঘর
এখানে-ওখানে ; অর্কেস্ট্রা উল্লসে ; ওঠে তারস্বর
রঙ্গমঞ্চে ; আর শস্তা রেস্তোরাঁয়, যেখানে জুয়োর
ফুর্তির উৎসাহ জমে, জোটে বেশ্যা, মাতাল, জোচ্চোর,
তাদের সাকরেদ যত ; জোটে চোর, পিশুনস্বভাবে
প্রতিশ্রুত ; অবিলম্বে সেও যাবে, সেও কাজে যাবে,
মৃদু হাতে দরজা খুলে, বাক্স ভেঙে, হয়তো কুড়াবে
দু-দিনের অন্ন তার, কিংবা উপপত্নীরে সাজাবে।

মগ্ন হও, এ-গম্ভীর লগ্নে তুমি মগ্ন হও, মন,
ভাবনায় ; রুদ্ধ করো কর্ণদ্বার ; এই সেই ক্ষণ,
যখন রোগীর দুঃখ তীক্ষ্ণ হয় ; অন্ধ কালো রাত
আঁকড়ে তাদের কণ্ঠ ; সন্নিকট তাদের নিপাত

নিয়তির পূর্ণতায়, সর্বগ্রাসী সামান্ত পাতালে ;
ওঠে ব্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাস, ঘন হ'য়ে নামে হাসপাতালে।
এর মধ্যে একাধিক, ব্যঞ্জনের সৌরভের আশে।
ফিরবে না আপন ঘরে, রাত্রিকালে, দোসরের পাশে।

উপরন্তু অনেকেই বোঝেনি, জানেনি কোনোদিনই
গৃহকোণে মধুময় শান্তি ;   এরা কখনো বাঁচেনি।

জুয়ো

বিবর্ণ চেয়ারে ব'সে বয়োবৃদ্ধ বারাঙ্গনারা—
পাংশু মুখ, আঁকা ভুরু, মর্মান্তিক বিলোল চাহনি ;
উৎকট কামুক ভঙ্গি শীর্ণ কানে যেই দেয় নাড়া,
বেজে ওঠে ধাতু আর পাথরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

সবুজ টেবিল ঘিরে ওষ্ঠহীন বদনমণ্ডল,
বর্ণহীন ওষ্ঠাধর, দন্তহীন কঠিন চোয়াল :
এবং অঙ্গুলি, যেন নরকের বিকারে বিহ্বল,
হাৎড়ে ফেরে পকেট, বুকের খোপ, উদ্বেগে উত্তাল।

আবিল খিলানে ঝোলে দীপাধার, স্ফীতোদর বাতি
হানে উগ্র আলো সেই কবিদের আঁধার ললাটে,
যারা পায় রক্তে ঘামে শীর্ণ কড়ি— সঙ্গে কিছু খ্যাতি—
আর তা উড়িয়ে দিতে আসে এই অনর্গল হাটে।

আমার নিশার স্বপ্নে এই কালো আলেখ্য সঞ্চরে,
ধ্যানের দৃষ্টিতে আমি নিজেকেই দেখি অবিকল,
নিজেকেই দেখি আমি— এক কোণে, নিঃশব্দ বিবরে,
দেয়ালে হেলান দিয়ে, ঠাণ্ডা, বোবা, ঈর্ষায় বিহ্বল !

আমার ঈর্ষার লক্ষ্য সর্বনাশে নৈষ্টিক পুরুষ,
আর বৃদ্ধ বেশ্যাগণ, সোল্লাস মরণে যারা বাঁধা,
যারা দিলো বিকিয়ে, খেলার ছলে, ফুর্তিতে বেহুঁশ
কেউ তার রূপ, আর কেউ তার প্রাচীন মর্যাদা।

ঈর্ষিত হৃদয়, তবু হানে ত্রাস এই দুর্ভাগারা,
হাঁ-খোলা গহ্বরে ছোটে, আপনার শোণিতে মাতাল,
শূন্যতার যে-কোনো অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা,
হোক তা যাতনা, মৃত্যু, নরকের অনন্ত পাতাল।

মরণের নৃত্য

এর্নেস্ত ক্রিস্তফ-কে

সপ্রাণ রমণী যেন, গর্ব যার রুমাল, দস্তানা,
বিরাট ফুলের তোড়া, বরতনু সচ্ছল, সন্নত,
উদাসীন মাদকতা, শ্লথ ভঙ্গি আছে তার জানা,
ক্ষীণাঙ্গী, বেপথুমতী অতিবেল প্রমদার মতো।

নাচের আসরে কবে কে দেখেছে এমন তন্বীরে ?
রানীর অপরিমাণে পরিস্ফীত তার গাত্রবাস,
আঁটো জুতো, কুসুমের মতো কান্ত, কঠিন জিঞ্জিরে,
পা বেঁধে, ফোটায় তার মদময় মূর্ছার বিলাস।

কামুক ঝর্না যেন, আমোদিত শিলার ঘর্ষণে,
লেসে-বোনা গলবন্ধ কেলি করে বিলোল কণ্ঠায়,
সে যাকে লুকোতে চায়, মৃত্যুরূপী সেই আকর্ষণে
বাঁচার বিদ্রূপ থেকে শরমে শোভন উৎকণ্ঠায়।

নিবিড় নয়ন তার নাস্তিময় তমসায় গড়া,
সুকুমার মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে, অতি মন্দ তালে

দোলে তার করোটির বেণীবন্ধে পুষ্পের পসরা।
আহা কী মাধুরী ঝরে সম্মোহনে শূন্যেরে সাজালে!

'ব্যঙ্গচিত্র!' বলে ওরা, রক্তেমাংসে আত্মনিবেদনে
আসক্ত, মাতাল হ'য়ে বোঝে না তো মূর্খের মিছিল
মানবিক রূপকল্পে নামহীন এই প্রসাধনে!
কঙ্কাল! আমার কাম তোমাতেই খুঁজে পায় মিল।

এলে কি জাগাতে ত্রাস জীবনের অবোধ উৎসবে
বিকট ভঙ্গিমা নিয়ে? না কি এক প্রাচীন, দুর্বার
লালসার অন্ধ তেজ অকস্মাৎ সঞ্জীবিত শবে
ভোগের ভৈরবীচক্রে ঠেলে নিয়ে এলো পুনর্বার?

প্রোজ্জ্বল দীপের দামে, গীতময় তীব্র বেহালায়
বিদ্রূপে বিলোল ঐ দুঃস্বপ্নেরে ভেবেছো, ঠেকাবে?
অথবা হৃদয়ে ভরা নরকের প্রদীপ্ত জ্বালায়
ডুবিয়ে দেবে কি এক অন্তহীন রতিমদস্রাবে?

অবিদ্যার নিকেতন, প্রমাদের অক্ষয় আধার,
শাশ্বত ভৃঙ্গারে যার ফুরায় না প্রত্ন পরিতাপ—
চেয়ে দেখি, খোপে-খোপে জাফরি-কাটা পাঁজরে তোমার
নূতন উৎসাহ নিয়ে কাৎরে ওঠে তৃপ্তিহীন সাপ।

আসলে আমার ভয়, ভাবিনীর চঞ্চল বিলাস
যত না বিলোল করো, মিলবে না উচিত মজুরি;
এ-মর জগতে কে বা বোঝে ঐ গূঢ় পরিহাস?
কেবল বীরের ভোগ্য বীভৎসের গহন মাধুরী।

গহ্বর তোমার চক্ষু, ভীষণের ভাবনাবিহ্বল,
উগরে তোলে অপস্মার। বিকশিত বত্রিশ পাটিতে
চিরন্তন হাসিটিকে বিচক্ষণ নর্তকের দল
পারে না, ন্যক্কার বিনা, মুহূর্তের মনোযোগ দিতে।

অথচ, কেউ কি আছে, কঙ্কালেরে বাহুবন্ধে বেঁধে
কবরের উপচারে অতি যত্নে লালন করেনি ?
গন্ধ, বেশ, অঙ্গরাগ ভ'রে আছে সে কোন সংবেদে ?
বিতৃষ্ণার ভানে শুধু ধরা পড়ে বর্ধমান ঋণী।

নাসাহীন দেবদাসী, আকর্ষণে গন্ডানি অজেয়,
তুমি যাতে রাহুগ্রস্ত, সেই সব দাম্ভিক, বেহুঁশ
নর্তকেরে বলো, 'ওরে, রং, তুলি, পাউডার সত্ত্বেও
তোরা সব মৃত্যুর দুর্গন্ধে-ভরা ! শুষ্ক আন্তিনুস,

বার্নিশে রাঙানো শব, পরিজীর্ণ লাভিলেস ভরে,
নির্লোম বাবু ও বিবি, মৃগনাভি-মাখানো কঙ্কাল—
মরণের মহানৃত্য নিখিলেরে আন্দোলিত ক'রে
সকলেরে খুলে দেয় অজানার দূর চক্রবাল !

তুহিন সেন্-এর তট, দহমান গঙ্গার পুলিন,
সর্বত্র খেলায় মাতে নরগণ, অথচ দ্যাখে না
বলভির রন্ধ্র দিয়ে— যেন কালো, হিংসুক সঙিন—
হানা দেয় সর্বশেষে তূর্যনাদে দেবদূত-সেনা।

সকল সূর্যের তলে, সব দেশে, মৃত্যু নেয় দেখে
তোদের সঙের ভঙ্গি, রে মানব, বিহ্বল নেশায়,
এবং, তোদেরই মতো, মাঝে-মাঝে মদগন্ধ মেখে
তোদের উন্মত্ত স্রোতে আপনার বিদ্রূপ মেশায় !'

মিথ্যার প্রেম

অলস আদরিণী, যখন দেখি তোরে—
ক্বণিত বেহালায় সীলিঙে ভাঙে সুর,
চলার মৃদু লয় ছন্দে বাঁধা পড়ে
নিবিড় নির্বেদে নয়ন ভারাতুর ;

গ্যাসের আলো, দেখি, সাজায় তোর ম্লান
ললাট যেন এক রোগের গহনায়,
সান্ধ্য বাতি আনে উষার অনুমান
ছবির মতো তোর চোখের মোহানায় ;

তখন ভাবি, 'সে যে ফুল্ল, রূপবতী,
বিরাট স্মৃতি তার মুকুট মণি-জ্বলা,
আহত পাকা ফলে রতির পরিণতি,
তৈরি তনু তার শিখবে কামকলা।'

বল, হেমন্তের পরম ফল তুই ?
না, চিতাভস্মের অশ্রু-অভিলাষ ?
স্বপ্ন-উপাধান ? গন্ধভরা জুঁই ?
সুদূর মরুভূর ফুলের নির্যাস ?

আছে তো জানি চোখ বিষাদে ঘন-লীন,
অথচ নেই কোনো গোপন আকুলতা ;
খচিত পেটিকার গর্ভ মণিহীন—
কেবল নীলিমার গভীর শূন্যতা !

কিন্তু প্রতিভাস— তা-ই তো বরণীয় !
মুখোশ হোক, আর মোহন প্রসাধন—
কী তাতে এসে যায় ? অনৃতে মানি প্রিয়
ও তোর মায়ারূপ আমার আরাধন !

এখনো ভুলিনি তাকে···

এখনো ভুলিনি তাকে— নগরের গা ঘেঁষে, নির্জন,
আমাদের শাদা বাড়ি, ছোটো, কিন্তু শান্ত সংরক্ষণ।
পমোনা, পাথরে গড়া, আর এক স্থবির ভেনাস
বিরল ঝোপের পিছে ঢাকে নগ্ন অঙ্গের আভাস।

আর সূর্য, সন্ধ্যাবেলা, প্রপাতের মতো বাতায়নে
অবিরল চূর্ণ হ'য়ে প্রজ্বলিত রশ্মির বর্ষণে,
অদ্ভুত আকাশ থেকে, স্ফারনেত্রে, চেয়ে ছাখে যেন
আমাদের সান্ধ্যভোজ, দীর্ঘায়িত, শব্দ নেই কোনো।
সেই দীপ্তি, মোমের আলোয় মিশে করেছে উজ্জ্বল
বনাতের ছেঁড়া পর্দা, আমাদের স্বল্প অন্নজল।

মহাপ্রাণ সেই দাসী…

মহাপ্রাণ সেই দাসী, তুমি যাকে ঈর্ষা করেছিলে,
মগ্ন হ'লো ঘুমে আজ তুচ্ছ তৃণপল্লবের তলে।
তবু চলো, কিছু ফুল দিয়ে আসি তাকে একদিন,
আহা, মৃত, মৃত ওরা, কী বিরাট কষ্টের অধীন!
যবে রিক্ত তরুদল নিশ্বসিত ম্লান অক্টোবরে,
মর্মরফলক ঘিরে খেদময় বায়ু ঘুরে মরে,
তখন ঘুমোই যারা বেঁচে থেকে, উষ্ণতায় লীন,
কী কঠিন ভাবে ওরা আমাদের, কী হৃদয়হীন!
এদিকে বিকট কালো স্বপ্নেরা ওদের ছিঁড়ে খায়,
সদালাপ, শয্যাসঙ্গী, কিছু নেই; হিমেল হাওয়ায়
জ'মে-যাওয়া বুড়ো হাড়, পরিশ্রমী ক্রমির সম্ভার,
টের পায় শীতের তুষার গ'লে ঝ'রে পড়ে, আর
খ'সে পড়ে শতাব্দী, তবুও কোনো বন্ধু বা স্বজন
ছেঁড়া ফুল ফেলে দিয়ে সে-মণ্ডপে রাখে না নূতন।

ধরো, কোনো সন্ধ্যায় যখন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে ফোঁপে,
যদি তাকে দেখি, শান্ত, অস্পষ্ট, চেয়ারে আছে ব'সে;
যদি ডিসেম্বরে, কোনো হিমস্রব নীল যামিনীতে
দেখি, সে কুঁকড়ে আছে এক কোণে, ঘরের নিভৃতে;

যদি উঠে আসে, মৌন, চিরন্তন শয্যাতল ফেলে,
তার বুড়ো ছেলেকে আশ্রয় দিতে মাতৃচক্ষু মেলে—
তাহ'লে, স্খলিত অশ্রু দেখে তার পল্লবের তলে,
সেই পুণ্য আত্মাকে উত্তর দেবো কোন কথা ব'লে ?

বৃষ্টি ও কুয়াশা

হেমন্তের অবসান, শীত, আর পঙ্কময় বসন্তের দিন,
তোমরা, নিদ্রালু ঋতু, যারা ম্লান কুয়াশার আচ্ছাদনে লীন
ক'রে দাও আমার হৃদয় মন, যেন এক অস্পষ্ট কাফনে
লুপ্ত ক'রে কবরে নামিয়ে দাও—মুগ্ধ আমি তোমাদের গুণে !

এই ব্যাপ্ত প্রান্তর, যেখানে ছোটে রাত্রি ভ'রে তুহিন তুফান
আর দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে আবহকুক্কুট তোলে মর্চে-পড়া তান,
ঈষদুষ্ণ বসন্তের চেয়ে বেশি—আরো বেশি গূঢ় আকাঙ্ক্ষায়
উড়ে চলে আকাশে আমার আত্মা, অবারিত কাকের পাখায়।

যে-হৃদয় শবের সম্ভারে পূর্ণ, আর যার অন্ধকার ছেয়ে
বহুকাল ঝরেছে তুষারবৃষ্টি, তার কাছে কিছু নেই প্রিয়,
হে পাংশু ঋতুর দল, আবহের রাজ্ঞীরূপে যারা বরণীয়,

নিরন্তর ধূসর ছায়ায় ম্লান তোমাদের মুখশ্রীর চেয়ে,
—যদি না, যখন চাঁদ অবলুপ্ত, পাশাপাশি, অন্তরঙ্গ রাতে
পারে সে পাড়াতে ঘুম বেদনারে, কোনো-এক দৈবাৎ-শয্যাতে।

প্যারিস-স্বপ্ন

কঁস্তাতাঁ গী-কে

১

ভীষণ দৃশ্য, স্বপ্নের অবদান,
থাকবে যা মর-মানবের অগোচরে,
তার স্মৃতিরূপ, সুদূর, বিলীয়মান,
এখনো, সকালে, আমাকে আকুল করে।

সুপ্তি, তোমার জাদুবিদ্যায় দীপ্ত,
অলৌকিকের অনন্ত আবেদনে,
সব উদ্ভিদ—প্রগল্‌ভ, প্রক্ষিপ্ত,
খেয়ালের বশে দিলাম নির্বাসনে,

আর, উদ্ধত প্রতিভার প্রত্যয়ে
রচিত চিত্রে পেলাম অভিজ্ঞান—
মর্মর, ধাতু, জলের সমন্বয়ে
উন্মাদনায় মোহন ঐকতান।

অসীম প্রাসাদ, বাবেল সুবিস্তীর্ণ,
সোপানে বিতানে ধাপে-ধাপে এসে নামে
উৎস, ফোয়ারা, সরোবরে পরিকীর্ণ—
মলিন অথবা অরুণ কনকদামে :

আর, গুরুভার অনেক ঝর্নাধারা
ধাতুময় তটে ঝোলে গতিহীন বৃষ্টি,
স্ফটিকস্বচ্ছ পর্দার মতো তারা
বিচ্ছুরণের বিলাসে ধাঁধায় দৃষ্টি।

তরুলতা নয়—স্তম্ভশিলার সারি
নিভৃত সায়রে তন্দ্রায় রাখে শান্ত,
দর্পণে যার, যেন মহাকায় নারী,
আত্মালোকনে দানবীরা বিশ্রান্ত।

গোলাপি, সবুজ তটের প্রান্ত ঘেঁষে
আলুলিত নীল সলিল সবিস্তার,
লক্ষ যোজনে ব্যাপ্তির পরিশেষে
বিশ্বলোকের সীমান্ত হয় পার।

মায়াময় ঢেউ, অজানা পাথরের গড়া,
স্তব্ধ সে-জলে পুঞ্জহিমের মতো,

যা-কিছু সেখানে ছায়ারূপে দেয় ধরা
তার উদ্ভাসে নিজেই মূর্ছা হ'ত !

অনেক গঙ্গা, নির্বাক, উদাসীন,
দিগন্ত-জোড়া পাত্র উজাড় ক'রে
ঢেলে দেয় মণিরত্ন অন্তহীন
হীরকে রচিত পাতালের গহ্বরে !

পরিস্থানের স্থপতি, আমার সাধ্য
গড়ে মাণিক্যে সুড়ঙ্গ স্বেচ্ছায়,
যার তল দিয়ে— আমার আদেশে বাধ্য,
মহাসমুদ্র সম্যক ব'য়ে যায় ;

সব হ'য়ে ওঠে ভাস্বর, দ্যুতিময়
কালো বরনেও ঝলসে ইন্দ্রধনু ;
মহিমান্বিত তরলের পরিচয়
স্ফটিকে বদ্ধ রশ্মিতে পায় তনু ।

সূর্য তাবার চিহ্ন দেখা না যায়
যদিও আকাশ দিগন্তে অবনত ,
ঐ মায়ালোক জ্বলে যার প্রতিভায়
সে-অনল শুধু আমারই ব্যক্তিগত ।

আর এই মহাবিস্ময়ে অবিরল
ঝ'রে পড়ে (এ কী নিদারুণ নূতনত্ব !
শ্রবণে শূন্য, নয়নে অনর্গল !)
চিরন্তনের শব্দবিহীন সত্ত্ব ।

২

খুলে যায় চোখ এখনো আগুনে জ্বলা,
সভয়ে তাকাই জঘন্য এই ঘরে,
অভিশাপ, খেদ, দুশ্চিন্তার কলা
আবার আমার হৃদয় বিদ্ধ করে ;

শবযাত্রায় স্বনিত পেতুলাম
ব্যারোটা বাজায় পাশবিক ইঙ্গিতে,
নভতল থেকে তমসার পরিণাম
ঝরে বিষণ্ণ, মন্থর পৃথিবীতে।

প্রভাতী প্রদোষ

প্রভাতী বিউগিলে জাগে ব্যারাকের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ,
ভোরের বাতাস লেগে নিবে যায় ধূমল লণ্ঠন।

এই সে-প্রহর, যবে রোগদুষ্ট স্বপ্নের পর্যায়
বাদামি যুবার দলে তুমড়ে দেয় বিস্রস্ত শয্যায় ;
আরক্ত চক্ষুর মতো ঘুরে-ঘুরে কম্পিত বাতিটা
এঁকে দেয় দিনের ললাটে এক রক্তবর্ণ ফোঁটা ;
আর আত্মা, দুর্ভর, উত্ত্যক্ত এক দেহের অধীনে,
তেমনি চালায় যুদ্ধ, যেমন লণ্ঠন আর দিনে।
বায়ু, এক অশ্রুতে সজল মুখ, হাওয়ায় মোছানো,
শিহরনে ভ'রে যায়, ব্যাকুল পলায় কান্না যেন ;
লিখে-লিখে ক্লান্তি এলো পুরুষের, রতিতে নারীর।

এখানে-ওখানে ক্রমে ধোঁয়া ওঠে ঘরোয়া চিমনির।
হাঁ খোলা, চোখের পাতা আরক্তপিঙ্গল,
সুখদা গণিকাগণ লুপ্তবোধ নিদ্রায় বিহ্বল ;
দুঃখিনীরা কাজে নামে ; ঠাণ্ডা আর রোগা স্তনগুলি
ঝুলিয়ে ফুঁ দেয় কাঠে, উষ্ণ করে অবশ অঙ্গুলি।
এই সে-প্রহর, যবে সহকারী শীতের মন্ত্রণা
কার্পণ্যের অবরোধে প্রসূতির বাড়ায় যন্ত্রণা ;
কুক্কুটের তান, যেন ফেনরক্তে আহত ক্রন্দন,
ছিন্ন করে থেকে-থেকে বাতাসের শিশিরগুণ্ঠন,

স্নাত হয় সৌধশ্রেণী কুয়াশার বিকীর্ণ বন্যায় ;
এদিকে, হাসপাতালে, মুমূর্ষুর মুহূর্ত ঘনায়
করাল ঘর্ঘরনাদে, নাভিশ্বাসে, অসম বমনে।
লম্পটেরা ঘরে ফেরে— আছে কাজ, প'ড়ে গেছে মনে।

উষা, দাঁতে-দাঁত-লাগা, নির্জন সেন্-এর তীরে
সবুজ-লোহিত সাজে অগ্রসর হ'লো ধীরে-ধীরে।
গম্ভীর প্যারিস জেগে, চোখ রগড়ে, তখনই আবার
কর্মঠ বৃদ্ধের মতো হাৎড়ায় যন্ত্রপাতি তার।

মদ

ন্যাকড়া-কুড়ুনির মদ

বস্তির সর্পিল পথে বার-বার তাকে যায় চেনা—
যেখানে কৃমির বংশ উগরে তোলে বিষময় ফেনা—
পঙ্কিল পল্বলে, আর মধ্যরাতে তীরন্দাজ হাওয়া
ল্যাম্পোস্টেরে নাড়া দিয়ে ঢেলে দেয় রক্তবর্ণ ছায়া-

জজিয়তি ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ে, ন্যাকড়া কুড়ায়,
রাজত্বে অপ্রতিহত, তুচ্ছ করে নৈশ পাহারায় ;
দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে, কবিদের মতো অন্যমনা,
শুরু করে বাগ্মিতার মহাপ্রাণ, ভাস্বর সাধনা ;

নেয় রাজ-শপথ, দেয় জনগণে মঙ্গল-সংহিতা,
দুঃস্থে দান, দুর্জনের নিপীড়নে খ্যাতিমান পিতা—
আকাশে আস্তীর্ণ তার প্রভাবের যথার্থ সভায়
নিখিলনক্ষত্র, দ্যাখে, দীপ্ত তারই পুণ্যের প্রভায়।

তা-ই বটে ! এরা সব, শতচ্ছিন্ন সংসারের চাপে,
পিষ্ট হ'য়ে পরিশ্রমে, বার্ধক্যের অকালসন্তাপে,
নুয়ে-পড়া কাঁধে তুলে কদর্যের স্থূল সঞ্চয়ন—
অতিকায় প্যারিসের অনর্গল, বিচিত্র বমন—

ঘরে ফেরে, পিপে-গন্ধী গরিমার স্মরণে উজ্জ্বল,
সঙ্গে নিয়ে বয়োবৃদ্ধ পিতামহ-বান্ধবের দল—
যাদের গুম্ফের স্রোত পদক্ষেপে পতাকা ওড়ায়।
—মায়াময় বিচ্ছুরণে অকস্মাৎ সম্মুখে দাঁড়ায়

মশাল, ফুলের মালা, বলীয়ান বিজয়-তোরণ ;
প্রত্যাবর্তনের পথে অনুলিপ্ত মঙ্গলাচরণ
ঢাক, ঢোল, বাঁশির উচ্ছ্বাস তুলে, উষার উত্থানে
ভ'রে দেয় প্রেমের নেশায় মত্ত ক্ষিতির সম্মানে।

জীবনের প্রহসনে, এইমতো, দিগন্তে ছড়ায়
মদিরা, সোনায় মাখা পাক্কলস, প্রোজ্জ্বল ধারায়।
মানবের কণ্ঠে তার ক্ষমতার সাক্ষাৎ রটনা,
দানপুণ্যে রাজত্ববিস্তার তার সামান্য ঘটনা।

সুষুপ্তি, আলস্যে স্নিগ্ধ, বিস্মৃতির অমল কন্দর,
ঝড়ে-ভাঙা দুর্ভাগার নির্বাণের অস্থায়ী বন্দর—
অনুতপ্ত ধাতার সৃষ্টি সে ; আর মানুষের দান
মদিরা, স্বর্গের স্বাদ, মৃত্যুহীন, সূর্যের সন্তান।

খুনের মদ

বৌটা ম'রে গেছে, আমি স্বাধীন !
এবার যত খুশি গিলবো খাঁটি।
ছিঁড়েছে টুঁটি তার কান্নাকাটি
ফিরেছি ফাঁকা ট্যাঁকে ঘরে যেদিন।

আকাশ নীল, মেলে বাতাস ডানা…
আমার মতো সুখী বাদশা নেই ;
আমরা প্রেমে পড়েছিলুম, সেই
গ্রীষ্মদিন মনে দিচ্ছে হানা।

বিকট তৃষ্ণায় হচ্ছি ক্ষয়,
মেটাতে সেই দাবি চাই এবার
মদের ধারা, যাতে কবর তার
ভরাতে পারে ;—সে তো অল্প নয়।

দিয়েছি চাপা সব পাথর ভারি
প্রথমে ফেলে তাকে কুয়োর তলে ;
ফিরবে না সে আর, পচবে জলে।
—ভুলতে চাই, যদি ভুলতে পারি !

বাতিল হয় না যা—সোহাগে মেশা
পুরোনো শপথের দোহাই দিয়ে
বলেছি, 'হোক ফের নতুন বিয়ে
যখন দুয়ে ছিলো দুয়ের নেশা :

লক্ষ্মী, সেইমতো এসো না মিশি
আঁধার ঐ পথে, সন্ধে হ'লে !'
—এলো সে !—নির্বোধ কাকে বা বলে !
পাগল সকলেই, কম কি বেশি !

ক্লান্ত মুখ তার হঠাৎ দেখে
প্রেমের তল যেন খুঁজে না পাই—
তেমনি রূপ তার !—তখনই তাই
বলেছি : 'বেরো তুই জীবন থেকে !'

বুঝবে কে আমাকে ?—অন্ধকারে
মাতাল কাঁপে যত যায় না গোনা,
কিন্তু মদে হবে কাফন বোনা
তারা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে ?

নিরেট লম্পট, লোহায় ঠাশা
কঠিন, অচেতন কলের মতো—
গ্রীষ্ম, শীত ঘুরে আসুক যত—
কখনো জানবে না সে-ভালোবাসা,

ডাইনি-জাদু চলে সঙ্গে যার,
মিছিল নরকের অনর্গল,
বিষের শিশি আর চোখের জল,
হাড়ের, শিকলের ঝনৎকার !

—একলা অবশেষে, আমি স্বাধীন !
বেহুঁশ হবো মদে আজ রাতেই ;

ত্রাস কি অনুতাপ কিছুই নেই,
মাটিতে মাথা রেখে, চিন্তাহীন,

পশুর মতো ঘুমে দেবো গা-ঢাকা!
আসুক ছুটে জোর—ভয় না করি—
পাথরে জঞ্জালে বোঝাই লরি
দারুণ ভারি যার দামাল চাকা,

পাপের বাসা এই মাথার খুলি
দিক না পিষে, ধড় হোক দু-ফাঁক,
উড়িয়ে বিদ্রূপে দেবো বেবাক—
দেবতা, শয়তান, ধর্মবুলি!

নিঃসঙ্গ মানুষের মদ

যেমন, অচ্ছোদ হ্রদে, প্রতীক্ষার নিস্পন্দ নিচোল
দুলে ওঠে স্নানার্থিনী চন্দ্রমার মৃদু শিহরনে
অলস অঙ্গের ভঙ্গে, লাস্যময়, চঞ্চল কিরণে—
সেইমতো প্রমদার কামারুণ কটাক্ষ বিলোল;

জুয়াড়ির হাতে শেষ, অবশিষ্ট গোটা কয় টাকা,
ক্ষীণাঙ্গী আদেলিনার মদকল-বিহ্বল চুম্বন;
বশীভূত স্নায়ুতন্ত্রে সনির্বন্ধ সুর আঁকাবাঁকা,
যার বুকে মানবের অবিকল দুঃখের গুঞ্জন;—

এরা নয় সমকক্ষ, হে গভীর, সুহৃদ বোতল,
তোমার উদরচ্যুত, দূরাবলেহন চিকিৎসার,
পুণ্যাত্মা কবির প্রাণে সান্ত্বনার অক্রম উৎসার—

তুমি দাও দুরাশা, নবজীবন, যৌবনের বল,
এবং গৌরব, যার বরমাল্যে আমরা, ভিখারি,
হ'য়ে উঠি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের শিকারি।

প্রেমিক-প্রেমিকার মদ

সকল দিক আজ মাধুরীময়!—
অবাধ, অবারণ, অসংশয়,
আমরা মদিরার অশ্বারোহী,
অলোক আলোকের দিগ্বিজয়ী।

যুগল দেবদূত, অনির্বাণ
জ্বরের যাতনায় বেপথুমান,
ভোরের নীলিমার স্বচ্ছকায়
স্ফটিকে খুঁজি দূর মরীচিকায়।

পুলকে প্রতিযোগী পরস্পরে—
আমরা সমতায় স্পন্দহীন
চেতন ঝঙ্কার পাখার 'পরে;—

বোন আমার, বল, বন্ধহীন
পাগল গতি এই কোথায় থামে?
— স্বপ্নে-পাওয়া বৈকুণ্ঠধামে!

ক্লেদজ কুসুম

ধ্বংস

দামাল পিশাচ, নিত্য আমার পাশে,
বাতাসের মতো অতনু, সাঁৎরে ফেরে,
তাকে পান ক'রে জ্বালা ধরে ফুশফুশে
শাশ্বত পাপলিপ্সায় যাই ভ'রে।

আমি শিল্পের প্রেমিক, সে-কথা জেনে
মোহিনী নারীর মূর্তি কখনো ধরে,
মজায় অধর অকথ্য অনুপানে
ধর্মধ্বজ নানা ছলছুতো ক'রে।

গাঢ় প্রান্তর, নির্বেদে অফুরন্ত,
সেদিকে ছুটিয়ে করে সে আমাকে ক্লান্ত,
যেথা ভগবান কখনো দেন না দৃষ্টি—

আর বিহ্বল আমার চক্ষু জুড়ে
হানে ধ্বংসের রক্তলোলুপ গোষ্ঠী,
কাটা ঘা, পুঁজের নোংরা ন্যাকড়া ছুঁড়ে

এক শহীদ

এক অজ্ঞাতনামা শিল্পীর চিত্র

খচিত গালিচা, ললিতবিলাসী সরঞ্জাম
এখনো তেমনি ব্যাপ্ত,
মর্মর, ছবি, গন্ধমদির বসনদাম
লাস্যে অপর্যাপ্ত,

উষ্ণ সে-ঘরে, যেথায় বাতাস কালান্তক-
যেন উদ্ভিদভবনে

পুষ্পপঙক্তি কাচের কফিনে নিষ্পলক
শেষ নিশ্বাসপতনে,

প'ড়ে আছে শব, ছিন্ন মুণ্ডে রক্ত ঝরে
লাল, সপ্রাণ, দীপ্ত,
বালিশ ভিজিয়ে, উদার চাদর-তেপান্তরে
করে তৃষ্ণায় তৃপ্ত।

অমার প্রসূন, দুঃস্বপ্নের পাংশু রূপ
চোখে চেয়ে করে বিদ্ধ—
তেমনি মাথাটি, ছড়িয়ে নিবিড় কেশর-স্তূপ
রত্নমণিতে ঋদ্ধ,

নৈশ টেবিলে, মহার্ঘ এক অর্ঘ্যভার,
প'ড়ে আছে বিশ্রান্ত,
চিন্তারহিত, আর্ত নয়নে দৃষ্টি তার
শূন্য, ধূমল, সান্ধ্য।

আর শয্যায়, নগ্ন দেহের প্রদর্শনী
খুলে দেয়, নির্লজ্জ,
প্রকৃতির দান, মর্মান্তিক আকর্ষণী,
গোপনীয় সৌন্দর্য ;

এক পায়ে পরা গোলাপি মোজায় সে কার স্মৃতি
সোনার বিন্দুখচিত,
গোপন চক্ষু জ্বলে যেন তার কঠিন বৃতি
দীপ্ত হীরকে রচিত।

অলস, মহান নির্জনতার অঙ্গীকার
আঁকা এ-চিত্রপ্রতীকে,
যেমন কামোদ নয়ন, তেমনি ভঙ্গি তার
জাগায় তামসী রতিকে,

মনে আনে সুখ, চুম্বন আর দুষ্ট ক্ষত
নরকের উদ্বোধনে,
পর্দার ভাঁজে সাঁৎরে বেড়ায় পিশাচ যত
তাদের তৃপ্তিসাধনে ;

তবু দেয় তার যুবতীদশার বিজ্ঞাপন
কাঁধের চকিত দর্প,
সুচারু কৃশতা, তীক্ষ্ণ কটির চটুল কোণ,
আর, যেন বাঁকা সর্প,

লীলায়িত দেহরেখার মাধুরী।—চেতনা তার
নির্বেদে শতছিন্ন,
আত্মাকে বুঝি দূষিত কামের অত্যাচার
ক্ষোভে করেছিলো দীর্ণ ?

জীবিত প্রণয়ে অসন্তুষ্ট কোন পুরুষ—
সে কি, অসূয়ায় আর্ত,
মৃত মাংসের 'পরে মহাকামে, নিরঙ্কুশ,
করেছিলো চরিতার্থ ?

এঁকেছিলো, তুলে ভীষণ মুণ্ড তপ্ত হাতে—
বল, ওরে অস্পৃশ্য !—
চুম্বন ক'রে নিথর কেশরে, ঠাণ্ডা দাঁতে
শেষ বিদায়ের দৃশ্য ?

—দূরে প'ড়ে থাক পরচর্চার ইতর সুখ,
উকিলের কড়াক্রান্তি,
অজ্ঞেয়া, তোর গহন শয়নে ঘুম নামুক
এবং শান্তি, শান্তি।

প্রেমিক ফেরারি ; তার ঘুম তোর চিরন্তন
প্রতিমায় হয় পিষ্ট ;
র'বে তার কাছে তোর একান্ত সমর্পণ
আমরণ একনিষ্ঠ।

পাতকিনী

গাভীর পালের মতো বালুতটে শুয়ে আছে তারা,
চিন্তালীন, চক্ষু চলে সমুদ্রের দিগন্তরেখাতে,
কম্পনের তিক্ত স্বাদ, আলস্যের সুখে মাতোয়ারা,
পা খোঁজে পায়েরে, আর ব্যগ্র হাত ঠেকে যায় হাতে।

কেউ-কেউ, দীর্ঘায়িত নিশ্বাসের আবেগে উতলা,
বনের গভীরে, যেথা কলশব্দে নির্ঝরিণী ঝরে,
শৈশবের ভয়ে ভরা প্রণয়ের লেখে বর্ণমালা
তরুণ, শ্যামলকান্তি তরুগাত্রে, ক্ষোদিত অক্ষরে ;

অন্যেরা, অত্বর পায়ে সঞ্চালিত, যেন বোনে-বোনে,
পিশাচের শিলাময় বাসস্থানে বেড়ায় গম্ভীর,
যেথা দেখা দিয়েছিলো, যেন তপ্ত লাভার প্লাবনে,
নগ্ন, দৃপ্ত স্তনভারে প্রলোভন সন্ত আন্তনির ;

নিঃশব্দ শূন্যতাময়, পেগানের প্রাচীন গুহায়
ধূপতির ধূমালোকে কেউ-কেউ তীব্র জ্বরে কাঁপে,
বিক্ষেপের আলোড়নে যাচে এক সক্ষম সহায়—
হে বাকুস, ঘুম দাও আমাদের আদিম সন্তাপে !

আরো আছে—আকণ্ঠ গুণ্ঠন টেনে সন্ন্যাসিনী সাজে
গম্ভীর কাননে যারা, জনহীন স্তম্ভিত নিশায়
লুকিয়ে ভীষণ কশা আলম্বিত বসনের ভাঁজে
ফেনিল প্রমোদপুঞ্জে যন্ত্রণার ক্রন্দন মেশায়।

রাক্ষসী, পিশাচ-নারী, হে কুমারী-শহীদের দল,
উদার আত্মার বেগে বাস্তবেরে তুচ্ছ ক'রে যারা
তাপসী, অর্ধেক ছাগ, অসীমেরে খোঁজো অবিরল—
কখনো চীৎকার তুলে, কখনো কান্নায় আত্মহারা,

তোমরা, যাদের পিছে আনরক ছুটেছি আমিও,
অভাগী ভগিনী সব, নাও প্রেম, করুণা আমার—
হতাশায়, পিপাসায় নিরন্তর যারা দহনীয়,
অথচ হৃদয়ে রাখে থরে-থরে প্রেমের সম্ভার।

দুই ভালো বোন

উদার, সৌজন্যময়ী, আছে দুই মনোরম নারী,
লাম্পট্য, এবং মৃত্যু—স্বাস্থ্যবতী, চুম্বনে মহান,
ছিন্নভিন্ন বসনের অন্তরালে শাশ্বত কুমারী;
নিয়তগর্ভিণী, তবু কোনোদিন জন্মে না সন্তান।

কবি, সে অসুরপন্থী, অর্ধাশনে অমাত্যপ্রবর,
গার্হস্থ্যের চিরশত্রু, বন্ধু তার নরকের তাপ;
কবর, গণিকালয় তার জন্য সাজায় বাসর,
যে-শয্যারে কোনোদিন মলিন করেনি মনস্তাপ।

কদাচারে অতিপ্রসূ, বরদাত্রী যেন দুই বোন,
কফিন, নিকুঞ্জকোণ ঘুরে-ফিরে আনে উপহার
ভীষণ সম্ভোগ আর আর্তিময় দুঃখের সম্ভার।

লাম্পট্য, কদর্য হাতে গোর দেবে আমাকে কখন?
আর মৃত্যু, আকর্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী, কখন মেশাবে
তোমার সাইপ্রেস সেই মার্টেলের বীজাণু নিঃস্রাবে?

রক্তের ফোয়ারা

কখনো আমার দুর্বারবেগ রক্তধারা,
মনে হয়, ছোটে চাপা কান্নায় আত্মহারা
ফোয়ারার মতো;—শুনি প্লাবনের দীর্ঘতান,
কিন্তু কোথায় জখম, মেলে না সে-সন্ধান।

রণভূমি যেন, তেমনি পেরিয়ে চলে নগর,
ফুটপাত পায় দ্বীপের পুঞ্জে রূপান্তর,
সর্বভূতের তৃষ্ণায় আনে নির্বাপণ,
রাস্তায় প্রকৃতি দীপ্ত জলের প্রস্রবণ।

অনেক সেধেছি মদেরে—আমায় হানে যে-ভয়
তাকে একদিন চুপি-চুপি করো সুপ্তিদান—
সুরায় আরো যে স্বচ্ছ নয়ন, তীক্ষ্ণ কান!

ভেবেছি, প্রণয় সকল-ভোলানো নিদ্রাময়;
কিন্তু কামেও সূচিশয্যায় অনুক্ষণ
ক্রূর বেশ্যার পিপাসায় ঢালি নিঃসরণ।

বিয়াত্রিচে

পোড়ো মাঠ প'ড়ে আছে, অস্থিসার, হরিৎবিহীন,
শুনিয়ে বিলাপ শুধু প্রকৃতিকে, চলেছি সেদিন;
ধীরে-ধীরে শান দিয়ে হৃদয়ের বিষণ্ণ ছোরায়
সে-চিন্তাগুলিকে, যারা নিরুদ্দেশে উন্মন বেড়ায়;—
তখন ভরদুপুর, চেয়ে দেখি, কালান্তক বেগে
আমার মাথার 'পরে, মস্ত এক ঝোড়ো কালো মেঘে
ভর দিয়ে নেমে এলো দলে-দলে পিশাচ, প্রমথ,
কূট, ক্রূর, কৌতূহলী এক পাল বামনের মতো।
তাকিয়ে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে করে গবেষণা,
যেমন ইতরগুলো পাগলের বাড়ায় যন্ত্রণা
তেমনি পাকিয়ে চোখ, পরস্পরে দিয়ে হাতছানি,
আমাকে শুনিয়ে, হেসে, এইমতো করে কানাকানি:

—'এই ব্যঙ্গচিত্র, একে মন দিয়ে সবাই দেখিস,
হ্যামলেটের ছায়া, তার ভঙ্গিমার নকলনবিশ,
উদাস, অস্থির চোখ, এলো চুল বাতাসে বেয়াড়া।

কী আছে করুণ আর এর চেয়ে, এই ছন্নছাড়া
আধপেটা অভিনেতা, উঞ্ছজীবী, অক্ষম বেকার
যা তার খেয়াল, তাকে শিল্প ভেবে জ'পে যায় তার
দুঃখে ভরা গানগুলি গাংফড়িং, জলের প্রপাতে,
ঈগলে, ফুলের দলে—এমনকি সে-গান রটাতে
চায় তার দুর্দশার জনয়িতা আমাদেরই কানে—
ধিক্কারে চীৎকৃত যারা রাজপথে তার অপমানে!'

আর-কিছু নয়, শুধু যদি আমি পরম গৌরবে
নিতাম ফিরায়ে মুখ, উন্মুখর পিশাচেরা তবে
আমার কঠিন তেজে হার মেনে চ'লে যেতো ফিরে।
—কিন্তু দেখি, সঙ্গে চলে, অন্তরঙ্গ সে-অশ্লীল ভিড়ে
—নির্বিকার সূর্য তবু, এ-পাপেও কম্পিত হ'লো না!-
আমার হৃদয়রাজ্ঞী, নেই যার দৃষ্টির তুলনা,
আমার গম্ভীর দুঃখে হাসিমুখে সেও ব্যঙ্গ করে,
ওদেরে উৎসাহ দেয়, মাঝে-মাঝে, পিচ্ছিল আদরে।

পিশাচীর রূপান্তর

ইতিমধ্যে সেই নারী, ডালিমের লাল যার ঠোঁটে,
চুল্লির কয়লায় ফেলা সাপিনীর মতো কাৎরে ওঠে;
কঠিন কর্সেটে বেঁধা তুঙ্গ স্তন দুই হাতে ছেনে
বলে সে—কথার ফাঁকে গন্ধময় মৃগনাভি হেনে—
—'আমি সেই বিম্বাধরী, সিক্তমুখী, যার মায়াবলে
সনাতন বিবেক হারিয়ে যায় শয্যার অতলে।
বক্ষের বিজয়তটে সব কান্না করি প্রতিহত,
বুড়োদের হাসাই, কলমুখর বালকের মতো।
যারা দ্যাখে আমার বসনহীন তনুর উচ্ছ্বাস,
তারা আমাতেই পায় চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, আকাশ।

আর, শোনো, পণ্ডিতমশাই, আমি রতিবিশারদ
বাহুবন্ধে, যখন প্রিয়তমের করি কণ্ঠরোধ,
কিংবা কাম-দংশনে অর্পণ করি, উদ্বেল, সচ্ছল,
অপরূপ স্তনভার—ভীরু, দৃপ্ত, পেলব, প্রবল,
হৃতশক্তি দেবদূত, সেই মদমুগ্ধ উপাধানে,
সে-ক্ষণে, আমারই জন্য, অভিশাপ দেয় ভগবানে।'

শুষে নিলো আমার পঞ্জর থেকে সব রক্তরস
মায়াবিনী, আর আমি, লালসার আহ্লাদে অবশ,
চুম্বনে উদ্যত হ'য়ে চেয়ে দেখি. জীর্ণ পুঁটুলিতে
ভরা আছে পুঁজ, ক্লেদ, অনুলিপ্ত ঘৃণ্য আঁটুলিতে।
ঠাণ্ডা ভয় হঠাৎ নয়নে দেয় যবনিকা ফেলে,
তারপর বাস্তবের দিবালোকে দৃষ্টি ফিরে পেলে
দেখি, যে আমার পাশে পরাক্রান্ত রঙিন পুতুল,
শোণিতের ঋণে ছিলো সঞ্জীবনে আপাতপ্রতুল—
সে কোথায়? শুধু এক কঙ্কালের বিধ্বস্ত বিকার,
আবহকুক্কুট যেন, ন'ড়ে উঠে ছড়ায় চীৎকার,
কিংবা শিকে বেঁধা কোনো বিজ্ঞাপন, শীতের বাতাসে
কেঁপে-কেঁপে দোলে শুধু, রাত্রি ভ'রে, অস্পষ্ট আভাসে।

সিথেরায় যাত্রা

উড্ডীন পাখির মতো, মুক্তছন্দে উৎফুল্ল উত্তাল,
দড়িদড়া ছিন্ন ক'রে হৃদয় আমার ছুটে চলে,
দোলে নৌকা ক্ষণে-ক্ষণে রিক্তমেঘ আকাশের তলে,
যেন এক দেবদূত, রৌদ্রময় দিগন্তে মাতাল।

দেখা যায় কোন দ্বীপ—কালো, আর বিষাদে মলিন?
—জানো না, সিথেরা ঐ, সেকালের শৌখিনের প্রিয়,

মামুলি এলদোরাদো, গানে-গানে অবিস্মরণীয়।
কিন্তু যা-ই বলো, এই দেশ বড়ো ধূসর, শ্রীহীন।

—রহস্যে মধুর দ্বীপ, হৃদয়ের উজ্জ্বল উৎসব!
তার তটরেখা থেকে, যেন এক গন্ধের উচ্ছ্বাস,
ভেসে আসে সনাতন ভেনাসের দৃপ্ত প্রতিভাস,
ব্যাপ্ত করে আত্মায় আলস্য আর প্রেমের বৈভব।

সুন্দর, শ্যামল দ্বীপ পরিপূর্ণ পুষ্পিত বিতানে,
চিরকাল সর্বজাতি যার কাছে অর্ঘ্য নিয়ে যায়,
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস কেঁপে ওঠে তন্ময় পূজায়,
যেমন গন্ধের দোলা গোলাপের বিলোল বাগানে,

কিংবা যেন বনতলে কপোতের শাশ্বত কূজন!
—কিন্তু তা তো নয়! এ যে রুগ্ণ এক বিশীর্ণ বিস্তার,
শিলাময় মরু, যাকে দীর্ণ করে কর্কশ চীৎকার।
অথচ অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখি! নয় সে মোহন

ছায়াময় কুঞ্জবনে পরিবৃত মন্দির, যেথায়
তন্বী এক পূজারিনী প্রেম দেয় ফুলের বিলাসে,
এবং গোপন তাপে দগ্ধতনু, ভ্রমে অনায়াসে
অর্ধেক উন্মুক্ত ক'রে বেশবাস চঞ্চল হাওয়ায়;

যখন আসন্ন তীর, উপকূলে তরী প্রতিহত,
ধবল পালের পটে নাড়ে ডানা ব্যাকুল পাখিরা,
দেখি এক ফাঁসিকাষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, সুদীর্ঘ, ত্রিশিরা,
আকাশেরে দীর্ণ করে উদাসীন সাইপ্রেসের মতো।

ঝুলে আছে শব, তাতে শকুনেরা পঙক্তিভোজে ব'সে
হিংস্র বেগে ছিঁড়ে নেয় পক্ব মাংস, রক্তমেদে মাখা,

শটিত পুঞ্জের মধ্যে, যেন তীক্ষ্ণ, কদর্য শলাকা,
হানে চঞ্চু অবিরাম, প্রত্যেকেই, নিষ্ঠুর আক্রোশে ;

চক্ষু দুই ছিদ্র তার, বিধ্বস্ত উদর থেকে খ'সে
পরিপুষ্ট অন্ত্রতন্ত্র উরুপ্রান্তে গড়ায় সচ্ছল,
এ-জঘন্য নিমন্ত্রণে পরিতৃপ্ত ঘাতকের দল
চঞ্চুর আঘাতে তাকে নপুংসক করেছে নিঃশেষে।

এদিকে, মঞ্চের তলে, ঊর্ধ্বমুখ, ক্ষুধায় উন্মাদ,
হিংসুক জন্তুর পাল শান্তিহীন ফেরে পাকে-পাকে,
সে-বিক্ষুব্ধ জনতায় সবচেয়ে বড়ো যে, সেটাকে
মনে হয় অনুচরে পরিবৃত ভীষণ জল্লাদ।

সিথেরার পুত্র, যার জন্ম এই স্বচ্ছ নীলিমায়,
পুরাতন অনাচারে যুগান্তের সঞ্চিত দুর্নাম
এবং নিষিদ্ধ পাপ—তুমি তার দিয়ে গেলে দাম
মরণের পরপারে বাক্যহীন অবমাননায়।

অপহৃত হাস্যকর, তোর কষ্টে আমি-যে তন্ময়!
জেনেছি, বিচ্ছিন্ন তোর প্রত্যঙ্গের দেখে নিপাতন—
আদন্তবিস্তৃত যেন ন্যক্কারের পুনরারোহণ—
অনাদি দুঃখের ধারা, দীর্ঘায়িত, পিত্তবিষময়।

স্মরণের বরণীয় রে পাতকী, তোর কাছে এসে
মনে জাগে অনেক চঞ্চুর বেগ, কঠিন চোয়াল—
যে-সব সুতীক্ষ্ণ শ্যেন, আর কালো শ্বাপদের পাল
একদা আমার মাংস চূর্ণ করেছিলো ভালোবেসে।

—মনোরম নভোতল, নির্বিকার সিন্ধুর নীলিমা ;
কিন্তু সব অন্ধকার, রক্তমাখা আমার নয়নে,

হায়! যেন ঢেকে দেয় কাফনের ঘন আচ্ছাদনে
আমার চিত্তেরে এই রূপকের নিবিড় কালিমা।

ভেনাস, তোমার দ্বীপে শুধু এই প্রতীক প্রোথিত,
ফাঁসিকাষ্ঠে পচা মড়া—চিত্রকল্প ঝোলে সে আমারই।
—ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি
দেখে নিতে আমার শরীর-মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।

বিদ্রোহ

শয়তান-স্তোত্র

হে তুমি, দেবদূত, জ্ঞানীর শিরোমণি, রূপের নেই যার তুলনা,
দেবতা, যার ভাগে জোটে না বন্দনা, নিয়তি দেয় শুধু ছলনা,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

রাজ্যহারাদের হে যুবরাজ, তুমি সয়েছো অন্যায় অপমান,
এবং হেরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়েছো নতুন তেজে আরো বলীয়ান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি রসাতলে বিরাজো মহীপাল, কিছুই নেই যার অজানা,
বৈদ্য পরিচিত, জীবন-দুর্ভোগে আনো আরোগ্যের নিশানা,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি সমতায় বিলাও বর, একই রতির লিপ্সায় পেতে ফাঁদ,
অধম চণ্ডাল, কুষ্ঠরোগীকেও ক্ষণিক স্বর্গের আস্বাদ,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

মরণ, যে তোমার বৃদ্ধা প্রণয়িনী, অথচ ক্ষমতায় দুর্জয়,
জন্ম দিলে তার গর্ভে আশা, যার মোহন মূঢ়তার নেই ক্ষয় !

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যখন ফাঁসিকাঠ তৈরি, জমে ভিড়, যে-তুমি আসামির দৃষ্টি,
শান্ত নির্ভয়ে জ্বালিয়ে, অভিশাপ করো সে-জনতায় বৃষ্টি,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

ঈর্ষাপরায়ণ ব্যাপ্ত বসুধায়, যে-তুমি জানো সব সন্ধান,
রত্নমণি কোন গহন অগোচরে লুকিয়ে রেখেছেন ভগবান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

দীপ্ত চোখ ফেলে যে-তুমি দেখে নাও গভীর সেই সব ভাণ্ডার,
সুপ্ত রয় যেথা কবরে সমাহিত ধাতুর বহুরূপী সম্ভার,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

এড়িয়ে গহ্বর, বিশাল হাতে তুমি তাদেরও নিয়ে যাও চালিয়ে,
স্বপ্নে, ঘুমে যারা ছাদের কার্নিশে বেড়াতে চ'লে আসে পালিয়ে,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি মাতালের অবশ বুড়ো হাড় নম্য করো জাদুবিদ্যায়
যখন রাজপথে ঘোড়ার খুর তাকে মাড়িয়ে দিয়ে বুঝি চ'লে যায়—

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

মানুষ ক্ষীণ আর দুঃখী ব'লে, তাকে পরম সান্ত্বনা জানাতে
লবণ গন্ধক মিশিয়ে কৌশলে শেখালে গোলাগুলি বানাতে,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি বেছে নাও কুবের যত আছে করুণাহীন আর ঘৃণ্য,
ললাটে এঁকে দিতে, হে কূট সহযোগী, তোমার তিলকের চিহ্ন,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে !

যে-তুমি মেয়েদের নয়ন আর মন এমন ক'রে পারো জাগাতে,
নিছক জঞ্জালে বিলিয়ে ভালোবাসা, আরতি করে তারা আঘাতে-

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

বাস্তুহারাদের যষ্টি তুমি, আর আবিষ্কারকের দীপালোক,
ফাঁসিতে ঝোলে ষড়যন্ত্রী যারা, হয় তোমার মন্ত্রেই বীতশোক,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

সকলে তারা মানে তোমাকে পিতা ব'লে, যাদের স্বর্গের উদ্যান
অন্ধ আক্রোশে পৃথিবী পার ক'রে দিলেন আদি পিতা ভগবান,

মহান শয়তান, করুণা করো তুমি আমার শেষহীন দুঃখে!

প্রার্থনা

ধন্য হোক নাম তোমার, শয়তান, ধন্য আকাশের শিখরে
যেখানে ছিলে তুমি রাজার মতো, আর এখন নরকের বিবরে
স্বপ্ন দ্যাখো নিঃশব্দে, পরাজিত, ধন্য সেখানেও হোক নাম!
আমার আত্মাকে এ-বর দাও, যেন সেখানে হয় তার বিশ্রাম,
যেখানে জ্ঞানতরু তোমাকে ছায়া দেয়, এবং উন্নত, গম্ভীর
তোমার ভালে আমি ছড়াই ডালপালা নতুন যেন এক মন্দির।

মৃত্যু

প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু

কবরের মতো গভীর ডিভানে লুটিয়ে
মৃদু বাসে ভরা র'বে আমাদের শয্যা,
সুন্দরতর দূর আকাশেরে ফুটিয়ে
দেয়ালের তাকে অদ্ভুত ফুলসজ্জা।

যুগল হৃদয়, চরম দহনে গলিত,
বিশাল যুগল-মশালের উল্লাসে
হবে মুখোমুখি-দর্পণে প্রতিফলিত
যুগ্ম প্রাণের ভাস্বর উদ্ভাসে।

গোলাপি এবং মায়াবী নীলের সৃষ্টি
এক সন্ধ্যায় মিলবে দুয়ের দৃষ্টি,
যেন বিদায়ের দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ;

পরে, দ্বার খুলে, মলিন মুকুরে রাঙাবে
এক দেবদূত, সুখী ও সবিশ্বাস ;
আমাদের মৃত আগুনের ঘুম ভাঙাবে।

গরিবের মৃত্যু

মৃত্যুই, হায়, সান্ত্বনা! সে-ই বাঁচিয়ে রাখে ;
আয়ুর লক্ষ্য, সে ছাড়া ভরসা নেই কিছুই ;
সে-ই কড়া মদ, ভরপুর যার নেশার ঝোঁকে
বুক বেঁধে চলি, যাবৎ সাঁঝের ছায়া না ছুঁই।

পুঁথির পাতায় নামজাদা সেই সরাইখানা—
কালো দিগন্তে কাঁপে আমাদের আলোর কৌটা—

পেট পুরে খেয়ে ঘুম দিতে নেই যেথায় মানা,
হিম, শিলা, ঝড় পেরিয়ে কেবলই সেদিকে ছোটা।

সে-ই দেবদূত, যার হাত মায়ামন্ত্র জানে,
ঘন ঘুম আর স্বর্গসুখের স্বপ্ন আনে,
নাগা ভিক্ষুকে শেজ পেতে দেয় চমৎকার ;

গোলা-ভরা ধান, ভগবান যার রাখেন চাবি,
গরিবের থলি, বাস্তুভিটায় আদিম দাবি,
না-জানা আকাশে এগিয়ে দেয় যে সিংহদ্বার।

শিল্পীদের মৃত্যু

ওরে ম্লান ব্যঙ্গচিত্র, কত আর ঘণ্টা নেড়ে-নেড়ে
চুমো দেবো আনত ললাটে তোর ? আর কত বার
রহস্যের লক্ষ্যবেধে ব্যর্থ হ'য়ে, তূণীর আমার,
তোকে রিক্ত ক'রে দেবো প্রকৃতিকে তীর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ?

কুটিল সংকল্পে মেতে আমাদের আত্মা যাবে ছিঁড়ে,
ফেলে দিতে হবে ঢের ভারা-বাঁধা নির্মাণের ভার—
তবে যদি দেখা মেলে সে-গোপন মহান সত্তার
যার জন্য নারকী বাসনা সব কান্না নেয় কেড়ে।

কেউ-কেউ হৃদয়ের প্রতিমাকে না-জেনে, অস্থির,
দুর্ভাগা ভাস্কর যেন, চিহ্নিত শাপের অপমানে,
আপন ললাটে বক্ষে হাতুড়ির অত্যাচার হানে,

শুধু এক আশা নিয়ে—বহু দূরে অদ্ভুত, গম্ভীর
মন্দিরের মতো মৃত্যু অন্য এক সূর্যের উদয়ে
ফোটাবে, যে-সব ফুল অবরুদ্ধ তাদের হৃদয়ে।

দিনের শেষ

উদ্ধত বেগে, পাংশু আলোর তলে,
চেঁচিয়ে, পেঁচিয়ে অকারণ অভিযাত্রী,
মত্ত জীবন নেচে-নেচে ছুটে চলে।
তারপর, যেন রতিবিলাসিনী রাত্রি

দিক্‌মণ্ডলে উঠে এসে, দেয় মুছে
এমনকি উন্মুখর বুভুক্ষারে,
সে-নীরবতায় লজ্জাও যায় ঘুচে—
তখন কবির মনে হয়: 'এইবারে

আত্মা আমার বিশ্রামে পায় যত্ন,
ক্লান্ত পাঁজর কাতর মিনতি করে;
হৃদয়ে আমার শত বিষণ্ণ স্বপ্ন!

তবে ফিরে যাই, শিথিল শয্যা-'পরে
অন্ধকারের পর্দা-জড়ানো ঘরে
শুশ্রূষাময় কালিমায় হই মগ্ন!'

এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন

এফ. এন.-কে

স্বাদু সন্তাপ আমার মতো কি অন্যে জানে,
'অদ্ভুত জীব!' তোমায় দেখিয়ে বলে কি ওরা?
—আসন্ন হ'লো মরণ। আমার কামুক প্রাণে
মেশে ত্রাস আর অভিলাষ, খেদ আবেশে ভরা।

যাতনার দান (এ নয় খেয়াল) দৃপ্ত আশা।
আয়ুর বালুকা যত নেমে আসে শূন্যতায়
ততই কষ্ট মাধুরী বিলায় সর্বনাশা,
পরিচিত এই জগতেরে মন বলে বিদায়।

আমি যেন শিশু, যার আকাঙ্ক্ষা নাটকে বাঁধা,
উৎসুকতায় পর্দাকে মানে ঘৃণ্য বাধা ···
তারপর হ'লো হিম সত্যের উন্মোচন :

ঘটলো ভীষণ মরণ, এবং সেই উষায়
স্তব্ধ, আবৃত, বিস্ময়হীন আমার মন ;—
স'রে গেলো পট, আমি তবু ব'সে প্রত্যাশায়।

ভ্রমণ

মাক্সিম দ্যু কাঁ-কে

১

পঞ্জিকা, রঙিন ছবি, বালকের হৃদয়লুণ্ঠন,
দেখায় বিশ্বেরে তার অতিকায় ক্ষুধার সমান ;
যে-বিশ্ব বিরাট হ'য়ে দীপ্ত করে সন্ধ্যার লণ্ঠন,
স্মরণের দৃষ্টিকোণে কত ক্ষুদ্র তার পরিমাণ !

একদা প্রভাতে যাত্রা ; মস্তিষ্কের বিবরে অনল,
হৃদয়ে বিদ্বেষ, না কি তিক্ত কাম, কে করে যাচাই !
তরঙ্গের ছন্দের পিছনে ছুটে, হিল্লোলে চঞ্চল,
আমাদের অসীমেরে সমুদ্রের সীমায় নাচাই।

কেউ ছোটে দূষিত স্বদেশ ছেড়ে মোহন অয়নে,
শৈশবের বিভীষিকা পার হ'তে উৎসুক অন্যেরা,
ক্বচিৎ জ্যোতিষী কেউ ডুবে মরে নারীর নয়নে—
মদমত্তা কির্কী এক, মারাত্মক অম্বুবাসে ঘেরা।

জান্তব রূপান্তরে পরিণতি সভয়ে ঠেকাতে
তারা হয় মাতাল আকাশ, আলো, দীপ্ত নীলিমায় ;
তুষারের তীক্ষ্ণ হুল, তামা-জ্বলা রৌদ্রের রেখাতে
ক্রমশ চুম্বনচিহ্ন লুপ্ত হয় দিগন্তসীমায়।

কিন্তু শুধু তারাই যথার্থ যাত্রী, যারা চ'লে যায়
কেবল যাবারই জন্য, হালকা মন, বেলুনের মতো,
নিশিত নিয়তি ফেলে একবার ফিরে না তাকায়,
কেন, তা জানে না, শুধু 'চলো, চলো' বলে অবিরত।

তাদের বাসনা পায় মেঘপুঞ্জে উজ্জ্বল বিন্যাস ;
স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়—সৈনিকেরে যেমন কামান—
পরিবর্তনীয় দেশ, মহাশূন্যে ইন্দ্রিয়বিলাস,
যার নাম কখনো জানেনি কোনো মানবসন্তান।

২

কী বিকট ! লাটিম, বলের মতো ভাল্‌জের তালে
উল্লোল আবেগে নাচি ; কৌতূহল—প্রমত্ত বিদ্যুৎ—
ঘুমের ঘোরেও তার যন্ত্রণার আন্দোলন ঢালে,
সূর্যেরে চাবুক মারে ক্ষমাহীন কোন দেবদূত।

খেয়ালের খেলা, যার লক্ষ্য শুধু পিচ্ছিল প্রমাদ,
কোথাও তা নেই, তাই মনে হয় নেই কোনখানে !
মানুষ, হৃদয়ে যার দুরাশার নেই অবসাদ,
অবিরাম উন্মাদের মতো ছোটে শান্তির সন্ধানে।

আমাদের প্রাণ তার ইকারীর এষণে আকুল
ডাকাত-নৌকোর মতো। তক্তা কাঁপে—'খোলো, খোলো চোখ !'
উন্মাদ উত্তপ্ত কণ্ঠে হেঁকে ওঠে উলঙ্গ মাস্তুল,
'প্রেম ··· কীর্তি ··· পুরস্কার !' ঠেকে চরে—সে-ই তো নরক।

মাল্লার বিহ্বল চোখে প্রতি ক্ষুদ্র দ্বীপের আভাস
হ'য়ে ওঠে আরেক এলদোরাদো, নিয়তিপ্রদীপ,
ব্যভিচারী কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল, উন্নিদ্র উল্লাস
ভোরের আলোয় দ্যাখে শুধু বন্ধ্য পাথরের দ্বীপ।

হায় রে সিন্ধুর পারে রূপকথা-রাজ্যের প্রেমিক!
বেড়ি বেঁধে জলে তাকে ফেলে দাও—এই তো সময়!
উদার আমেরিকার উদ্ভাবক মাতাল নাবিক,
যার স্বপ্ন তরঙ্গেরে ক'রে তোলে আরো বিষময়।

এই বুড়ো বাউণ্ডুলে, পায়ে ঠেলে কাদার ফাগুয়া,
উন্নাসিক, তৃপ্তিহীন, স্বপ্ন তার অপ্সরীর দিঠি,
মন্ত্রমুগ্ধ চোখে চেয়ে দ্যাখে তবু ভাস্বর কাপুয়া
যেখানেই বস্তির ধোঁয়াটে বাতি জ্বলে মিটিমিটি।

৩

অদ্ভুত যাত্রীর দল! তলহীন, সমুদ্রের মতো,
বিলোল নয়ন ভ'রে নিয়ে এলে প্রোজ্জ্বল কাহিনী;
স্মৃতির তোরঙ্গ খুলে দেখাও, সেখানে আছে কত
নীলিমার, নক্ষত্রের মণিহার, মুকুট, কিঙ্কিণী।

আমরাও যাবো দূরে, বিনা পালে, বায়ুব্যতিরেকে—
আমরা, আজন্ম বন্দী, বক্ষে চাপা নির্বেদের ভার,
অকস্মাৎ উন্মোচিত আত্মায় বনাতে দাও এঁকে
দিগন্তের চালচিত্রে পুলকিত স্মৃতির সম্ভার।

বলো, বলো, কী দেখেছো, বলো!

৪

'দেখেছি অপরিমেয়

আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ, বালুতট তরঙ্গপ্রহত ;
এবং অচিন্তনীয় প্রলয়ের সংঘাত সত্ত্বেও
মাঝে-মাঝে হৃদয় হয়েছে ক্লান্ত, তোমাদেরই মতো।

বেগনি-রঙা সমুদ্রে মহান সূর্য কেলিপরায়ণ,
গরীয়ান অস্তরাগ নগরের উচ্ছল বিলাসে,
দেখে-দেখে চেয়েছে আবেগদীপ্ত শান্তিহীন মন
ডুবে যেতে লোভন বিচ্ছুরণে রঙ্গিল আকাশে।

রমণীয় বনপথে, নগরের সমৃদ্ধ প্রাসাদে
কখনো স্পর্শেনি সেই রহস্যের গম্ভীর আবেগ,
যা পেয়েছি পুঞ্জিত মেঘের মধ্যে, দৈবের প্রসাদে ;
আর ছিলো হৃদয়ে অনবরত কামের উদ্বেগ !

—পুলকের অভ্যুদয় কামনার বাড়ায় ক্ষমতা।
হে কাম, প্রাচীন বৃক্ষ, সুখময় তোমার প্রান্তর,
যদিও বল্কলে বাড়ে দিনে-দিনে কঠিন ঘনতা
ডালপাখা ঊর্ধ্বে উঠে সূর্যেরেই খোঁজে নিরন্তর।

বনস্পতি, বৃক্ষরাজ, সাইপ্রেসের চেয়ে
অনন্তবর্ধিষ্ণু তুমি ? —যত্নে তবু করেছি চয়ন
ক্ষুধাতুর তোমার পুঁথির যোগ্য কতিপয় ছবি,
আমরা, দূরত্বমুগ্ধ, সৌন্দর্যপিয়াসী ভ্রাতৃগণ।

দেখেছি অবাক চোখে শিং-তোলা বিরাট প্রতিমা,
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সিংহাসনে রত্নের বিলাস,
উৎকীর্ণ প্রাসাদ, যার জাদুকর কান্তির গরিমা
জোগাতে, ধনপতির অচিরাৎ হবে সর্বনাশ ;

বসন, দর্শনমাত্রে, ব্যাপ্ত করে মদির আবেশ,
মোহিনী রমণীদের বর্ণলিপ্ত নখর, দশন,
সাপুড়ের কণ্ঠ ঘিরে সাপিনীর নিবিড় আশ্লেষ।'

৫

তারপর, বলো, তারপর ?

৬

'হায় রে অবোধ মন !

সার কথা শোনো তবে, সনাতন, অবিস্মরণীয়,
ঊর্ধ্বে, নিম্নে সোপানের যত আছে মারাত্মক ধাপ,
সর্বত্র দেখেছি শুধু—সাধ ক'রে খুঁজিনি যদিও—
ক্লান্তিহীন মঞ্চে খেলে ক্লান্তিকর, মৃত্যুহীন পাপ :-

রমণী, আজন্ম দাসী, হাস্যহীন, দাম্ভিক, নির্বোধ,
কিছুতে ধিক্কার নেই—আত্মরতি, আত্মোপাসনায় ;
পুরুষ, লম্পট, লুব্ধ, অত্যাচারে নেয় প্রতিশোধ,
দাসীর দাসত্ব করে নর্দমার ক্লেদাক্ত ফেনায়।

শহীদ, ক্রন্দনে রত ; আনন্দিত, সপ্রেম ঘাতক,
রক্তের সৌরভ-মাখা উৎসবের মত্ত আয়োজন,
শক্তির কুটিল বিষে অবসন্ন লোকাধিনায়ক,
চাবুকের আকাঙ্ক্ষায় জনগণ নতিপরায়ণ ;

অনেক আশ্রম, ধর্ম, সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে ধাবমান,
আমাদেরই অনুরূপ ; যাকে বলে পুণ্যের প্রভাব,
তাও, যেন ভোগক্লান্ত পালঙ্কের শয্যায় শয়ান,
কণ্টকিত চটেও প্রকট করে কামুক স্বভাব।

প্রগল্‌ভ মানুষ, তার প্রতিভার পীড়নে মাতাল—
সঙ্গী তার অচিকিৎস্য, চিরায়ত চিত্তের বিকার—
বিধাতারে জানায় যন্ত্রণা, ক্ষোভ, আক্রোশে উত্তাল :
"তবে নাও অভিশাপ, প্রভু আর প্রতিভূ আমার !"

আর যারা কিঞ্চিৎ সজ্ঞান, তারা কঠিন সাহসে
জাড্যেরে জানায় প্রেম ; অদৃষ্টের শৃঙ্খলে নাচার,
ডোবে, গড্ডলিকা ছেড়ে, আফিমের বিশাল প্রদোষে
—আদ্যন্ত জগৎময় চিরন্তন এ-ই সমাচার।'

৭

অতি কটু সেই জ্ঞান, চঙ্ক্রমণে যাকে যায় পাওয়া,
একতাল, সংকীর্ণ এ-পৃথিবীর আকাশে, বায়ুতে
আজ, কাল, চিরকাল খেলে শুধু আমাদেরই ছায়া,
আতঙ্কের মরূদ্যান নির্বেদের বিস্তীর্ণ মরুতে।

গতি ? না বিরাম চাও ? যদি পারো ঘরে থাকো, আর
যদি না-গেলেই নয়, যাও, ছোটো, কিংবা দাও হামা,
ফাঁকি দাও শত্রুকে, নিষ্পন্দ চোখে যে করে সংহার—
সময় ! হায় রে যাত্রী, ধাবমান, নেই তার থামা,

অস্থির ইহুদি যেন, কিংবা পীর, ধর্মের যাজক,
কিছুই পাথেয় নেই, অশ্ব, রথ, কিংবা জলযান,
এ-কুৎসিত মল্লেরে পলাবে ব'লে নিয়ত ব্রাজক ;
অন্য কেউ আঁতুড়েই শিখে নেয় তার মৃত্যুবাণ।

অবশেষে যখন পা দিয়ে চেপে, ছিঁড়ে নেবে টুঁটি,
সাধ্যে তবু কুলোবে আশার বাণী : হও আগুয়ান !
যেমন ভেসেছিলুম, পুরাকালে, উপড়ে ফেলে খুঁটি,
সুদূর চৈনিক তটে, স্রস্ত কেশ, নিবদ্ধ নয়ান।

এবার তাহ'লে যাত্রা তমসার অতল সাগরে,
সদ্য-পথিকের মতো পুলকিত হৃদয় উধাও,
শোনো, কারা শবযাত্রী গান গায় মোহময় স্বরে :
'এদিকে, এদিকে এসো, যদি কেউ স্বাদ নিতে চাও

মদগন্ধ কমলের। এই হাটে তাকে যায় কেনা,
অলৌকিক সেই ফল, যার জন্য হৃদয় ক্ষুধিত ;
এখানে প্রদোষ নেই, অপরাহ্ণ আর ফুরোবে না,
এসো না, অদ্ভুত তার মাধুরীতে হবে আমোদিত !'

ওপারে বাড়ায় বাহু পিলাদেস, এখনো তেমনি,
প্রেতেরে চিনিয়ে দেয় পুরাতন গানের গুঞ্জন।
'সাঁৎরে ধর এলেকৃত্রাকে, সে-ই তোর বিশল্যকরণী !'
বলে সে, একদা যার জানুতট করেছি চুম্বন।

৮

হে মৃত্যু, সময় হ লো ! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন !
কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর, সিন্ধুর
অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন।

ঢালো সে-গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা !
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন !
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন !

স্মারক লিপি

এমন মানুষ কে আছে, বুকের তলে
না পোষে হলদে সাপের তীব্র ফণা
মসনদে ব'সে অনবরত যে বলে :
'আমি রাজি', আর উত্তরে 'পারবো না !'

কিন্নর, পরি, অপ্সরীদের স্তব্ধ
নয়নে তোমার নয়ন করো নিবদ্ধ,
বিষদাঁত বলে : 'মন দাও কর্তব্যে !'

গাছে ঢালো জল, সন্তানে দাও জন্ম,
গড়ো কবিতায়, মর্মরে কারুকর্ম,
সে বলে : 'হয়তো আজকেই তুমি মরবে !'

মানুষ যতই ভাবুক, করুক চেষ্টা,
মেলে না জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত
মানতে যখন না হয়—দারুণ ধূর্ত
এই অসহ্য সর্পই উপদেষ্টা।

গহ্বর

পাস্কাল, জগৎ জুড়ে, দেখেছেন কেবল গহ্বর।
সব যেন তলহীন—বাক্, স্বপ্ন, উদ্যম, বাসনা !
আমিও অনেক বার জেনেছি সে-বিকট যাতনা
উল্লম্ব মাথার কেশে, আতঙ্কের বাতাসে জর্জর।

ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দশ দিকে, নেমে যায় অবিরল খাদ,
সীমান্ত, নিঃশব্দতা, নীলিমার ভয়াল বন্ধন ···

রাত্রির নেপথ্যে দেখি ঈশ্বরের অঙ্গুলি-লেখন
এঁকে যায় বহুরূপী দুঃস্বপ্নের অনন্ত বিষাদ।

নিদ্রা, তাও আনে ত্রাস; বিরাট গর্তের মতো যেন,
ভ'রে আছে অস্পষ্ট বিভীষিকায়, লক্ষ্য নেই কোনো;
অসীমেরে নগ্ন ক'রে খুলে দেয় সকল জানালা।

এবং আমার আত্মা, অপস্মার নিত্য যাকে হানে,
ঈর্ষা করে চেতনারহিতে, চায় শূন্যের অজ্ঞানে।
—আহা, মুক্তি কখনো না দিতো যদি সত্তা আর সংখ্যার শৃঙ্খলা!

ইকারুস-বিলাপ

হৃষ্ট, পুষ্ট, নিটোল তাদের স্বাস্থ্য,
যারা দেয় প্রেম চটুল গণিকাগণে।
—আমার লভ্য, মেঘের আলিঙ্গনে,
ভাঙা দুটো ডানা, নিষ্ফল উদয়াস্ত।

অতল আকাশে জ্বলে অনুপম সিঁথি,
সেই তারাদল আমার উত্তমর্ণ;
আমার দগ্ধ নয়নে, তাদেরই জন্য,
দৃশ্য কেবল চিত্রভানুর স্মৃতি।

বিরাট শূন্যে বৃথাই দিয়েছি হানা
প্রান্তে, কেন্দ্রে, সবল কৌতূহলে;
জানি না সে কোন আগুন-চোখের তলে
বিচূর্ণ হ'লো আমার মত্ত ডানা।

সুন্দরে ভালোবেসে আমি আজ ভস্ম ;
সমাধিফলকে উজ্জ্বল সম্মানে
থাকবে না লিপিচিহ্ন আমার নামে,
আমার কেবল গহ্বর সর্বস্ব।

ঢাকনা

মানুষ যেখানে যাক, সিন্ধুপারে, কিংবা আরো দূরে,
অগ্নিময় নভোতলে, কিংবা যেথা তপন তুহিন,
দিক সে পূজার অর্ঘ্য আফ্রোদিতে অথবা যীশুরে,
কনকে ভাস্বর, কিংবা দারিদ্র্যের বিবরে মলিন ;

নাগরিক, বাউণ্ডুলে, গ্রাম্যজন, গুরুমহাশয়,
হোক তার মস্তিষ্ক মন্থর, ক্ষিপ্র, কিংবা ক্ষুরধার—
চরাচরে পরিব্যাপ্ত এই এক অন্তহীন ভয়,
ঊর্ধ্বে যদি চক্ষু তোলে, হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে তার।

ওখানে আকাশ, এই কুঠুরির ক্রূর শামিয়ানা,
বিতরে প্রগল্ভ মঞ্চে আলোকের চঞ্চল নিশানা,
মেতে ওঠে রক্তে পাঁকে প্রহসন-পুত্তলির দল ;

লম্পটের বিভীষিকা, তপস্বীর অলীক মাধুরী—
কটাহ-ঢাকনার নিচে মানবেরা দেবে হামাগুড়ি,
তার ঊর্ধ্বে অভীপ্সার অবরুদ্ধ সকল অর্গল।

এখান থেকে অনেক দূরে

এই তো সেই ঘর, সেই মধুর মেয়ে—
প্রসাধনে স্নিগ্ধ এবং তৈরি হ'য়ে
নিত্য আছে আসবে যে, তার পথে চেয়ে।

কনুই তার ন্যস্ত রেখে তাকিয়াতে
শুনছে জলের ছলছলানি পুকুরটাতে,
স্তনের মুখে পাখা নাড়ে অন্য হাতে :

এ-ঘর ভরথিয়ার। এত আহ্লাদি সে,
দূর থেকে জল এবং হাওয়া শব্দ ভণে,
তাদের গান ছন্দময় দীর্ঘশ্বাসে
দুলালীকে দোলায় ধীরে তন্দ্রাবেশে।

পা থেকে তার কপাল, কত যত্ন জানে!
কোমল ত্বকে বিমর্দিত অর্ঘ্য মিশে,
গন্ধতেল চন্দনের ঝাপট হানে।
—মূর্ছাহত পুষ্পদল ঝিমোয় কোণে।

আত্মস্থতা

হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও, স্থৈর্য নাও শিখে।
চেয়েছিলে সন্ধ্যারে; আসন্ন সে যে, এই তো আগত :
ধূমল মণ্ডল এক নগরীকে ক্রমে দেয় ঢেকে,
শান্ত কারো মন, আর অন্য কেউ দুশ্চিন্তায় নত।

এখনই ছুটুক ওরা—ক্ষমাহীন জল্লাদ, প্রমোদ,
চালায় চাবুক মেরে যে-কুৎসিত, ক্লিন্ন জনগণে,
ফুর্তির গোলামি ক'রে অনুতাপে তার পরিশোধ
দিক তারা;—দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে। চলো দুইজনে

যাই বহুদূরে। চেয়ে দ্যাখো, আকাশের বারান্দায়
নিঃশেষ বৎসর সব ঝুঁকে আছে প্রাচীন সজ্জায়;
হাস্যময় মনস্তাপ জল থেকে ধীরে তোলে মাথা;

এদিকে মুমূর্ষু সূর্য শয্যা নেয় মেঘের তোরণে ;
আর, যেন পূর্বাকাশে দীর্ঘায়িত শবাচ্ছাদ পাতা,
সেইমতো, শোনো প্রিয়, রাত্রি নামে মধুর চরণে।

বিষাদগীতিকা

১

কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
হও রূপসী, বিষাদময়ী ! অশ্রুজল
নতুন রূপে করে তোমায় শ্রীমতী,
বনের বুকে ঝর্নাধারা যেমতি,
কিংবা ঝড়ে সঞ্জীবিত ফুলের দল।

পরম ভালোবাসি, যখন আনন্দ
তোমার নত ললাট থেকে গেছে স'রে ;
হৃদয় জুড়ে সংক্রমিত আতঙ্ক,
এবং তোমার বর্তমানে, কবন্ধ
গত কালের করাল ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

ভালোবাসি, আয়ত ঐ চক্ষু যখন
তপ্ত যেন রক্ত ঢালে জলের ফোঁটায়,
ব্যর্থ ক'রে আমার হাতের সাধ্যসাধন
অতি পৃথুল দুঃখ তোমার ছেঁড়ে বাঁধন—
নাভিশ্বাসের শব্দে যেন মৃত্যু রটায়।

নিশ্বাসে নিই—স্বর্গসুখের পরিমেলে—
এ কী গভীর স্তোত্র, মধুর আরাধনা !—
কান্না যত ওঠে তোমার বক্ষ ঠেলে ;
ভাবি, তোমার হৃদয়তল দেয় কি জেলে
নয়ন দুটি ঝরায় যত মুক্তোকণা ?

২

জানি, তোমার হৃদয় শুধু উগরে তোলে
জীর্ণ প্রেম, পরিত্যাগে প'চে-ওঠা,
আজও সেথায় কামারশালের চুল্লি জ্বলে,
এবং রয় লুকিয়ে তোমার বুকের তলে
মহাপাপীর অহমিকার ছিটেফোঁটা।

কিন্তু, শোনো, স্বপ্নে তোমার যতক্ষণে
না দেয় ধরা বিকট আভা নরকের,
এবং ডুবে অন্তহীন দুঃস্বপনে
না চাও বিষ, তীক্ষ্ণ ফলা মনে-মনে
বারুদ, ছোরা, কিংবা ছোঁয়া মড়কের,

না পাও ভয় দরজাটুকু খুলতে হ'লে,
করো নিখিল অমঙ্গলের পাঠোদ্ধার,
কেঁপে ওঠো, ঘণ্টা পাছে বাজে ব'লে—
জানলে না, কোন অপ্রতিরোধ অন্ধ বলে
আঁকড়ে ধরে কঠিন মুঠি বিতৃষ্ণার;

রানী, দাসী, সভয় তোমার ভালোবাসায়
তা না-হ'লে ফুটবে না এই উচ্চারণ
অস্বাস্থ্যকর আতঙ্কিত কালো নিশায়
আমার প্রতি পূর্ণ প্রাণের বিবমিষায়—
'রাজা! আমি তোমার সমকক্ষ এখন!'

ফোয়ারা

চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন!
অমনি উদাস ভঙ্গিতে দিক ধরা
হঠাৎ সুখের বিস্মিত শিহরন।

উঠোনে ফোয়ারা মুখর, বিরতিহীন,
সারা দিনরাত মত্ত প্রলাপে ঝরে,
আজ সন্ধ্যায় যে-আবেশে আমি লীন
সে-রতিপুলকে আরো সে তীব্র করে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মূরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

এমনি কখনো তোমার অন্তরাত্মা
বিদ্যুৎময় বিলাসের দাবদাহে
মুগ্ধ, বিশাল নীলিমায় করে যাত্রা
ক্ষিপ্র, অধীর আবেগের উৎসাহে।
তারপর, যেন মৃত্যুর মুখে জীর্ণ,
ক্লান্ত ঢেউয়ের বিষণ্ণতায় ঝরে,
অদৃশ্য এক ঢালু বেয়ে অবতীর্ণ
হয় সে আমার হৃদয়ের গহ্বরে।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মূরছায়
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

হে তুমি, রাতের রূপসী, তোমার স্তনে
ঢেকে রেখে মুখ, কী মধুর শুধু শোনা,

এই শাশ্বত বিলাসের আবেদনে,
পাথরে প্রহৃত কান্নার মূর্ছনা।
জলকলতান, পুণ্য যামিনী, চাঁদ,
পল্লবদলে চঞ্চল শিহরন,
তোমার শুদ্ধ বেদনার অবসাদ
আমার প্রেমের অবিকল দর্পণ।

ফুল্ল অঞ্জলি খুলে যায়,
হাজার মঞ্জরী ফোটে,
মুগ্ধ চন্দ্রমা মুরছায়,
রঙের সম্ভার লোটে,
অশ্রুবিন্দুর সমবায়
বৃষ্টিধারা হ'য়ে রটে।

কোনো মালাবারের মেয়েকে

তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি,
জঘনে জাগাও ঈর্ষা ব্যক্ত ক'রে শ্বেতাঙ্গীর ত্রুটি ;
ভাবুক শিল্পীর চোখে কত্র কান্ত তোমার শরীরে
আরো গাঢ় কালো জলে মখমল-চোখের গভীরে।
সেই নীল আতপ্ত হাওয়ার দেশে, যেখানে বিধাতা
তোমাকে দিলেন জন্ম—কৌটো ভ'রে লঙ্কা তেজপাতা
তুলে রাখো, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল, আয়েসি ভর্তার
কল্কিতে তামাক সাজো, ঠেকাও মশার হল্লা, আর
যখন ভোরের গান ঝাউবনে ওঠে কেঁপে-কেঁপে
কিনে আনো সদ্য বাজার থেকে আনারস, পেঁপে।
খোলা পায়ে, যেখানে-সেখানে তুমি বেড়াও স্বাধীন,
অচেনা পুরোনো সুর গুনগুন ক'রে, সারাদিন।

আর লাল সন্ধ্যার আঁচল যেই খ'সে পড়ে দূরে,
দাও গা এলিয়ে স্নেহে বারান্দায় নরম মাছুরে ;
পাখির কূজনে পূর্ণ তোমার স্বপ্নেরা ভাসমান
এবং পুষ্পল রূপে নিরন্তর তোমারই সমান।

হায় রে, দুলালী, কেন বেছে নিলি আমাদের এই
জনতাকাতর ফ্রান্স, যেখানে দুঃখের শেষ নেই ?
কেন তোর আজন্মের আদরিণী তেঁতুলতলারে
বিশাল বিদায় দিয়ে, নাবিকের বাহুর বিস্তারে
স'পে দিলি জীবন, যৌবন ?   কোনোদিন যদি পড়ে মনে—
পাৎলা মসলিনে কেঁপে শীত, শিলা, তুষারবর্ষণে—
দেখিস মধুর খেলা, ছেলেবেলা, আকাঙ্ক্ষার পটে,
তবুও চোখের জল ঠেলে রেখে, নিষ্ঠুর কর্সেটে
পিষ্ট স্তনে, ভিন-দেশী অঙ্গের আঘ্রাণ ফেরি ক'রে,
অন্ন খুঁটে খেতে হবে প্যারিসের পঙ্কিল খর্পরে—
এদিকে, কুয়াশা-ক্লেদ ছিঁড়ে তোর খিন্ন পথ-চাওয়া
খোঁজে সেই সুদূর গুপুরিদের ক্ষীণ প্রেতচ্ছায়া !

স্তোত্র

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে,
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার-
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

বাতাসের সত্তার লবণে
বাঁচায় সে জীবন আমার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে ;
সংগোপনে, কোনো ভুলে-যাওয়া
ধূপদানি জলে রাত্রি ভ'রে।

কেমনে, অয়েয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমাকে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের গহ্বরে আমার।

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে,
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার।

রোমাণ্টিক সূর্যাস্ত

কী সুন্দর সূর্য, যার সদ্যতন উজ্জ্বল উত্থান,
যেন এক বিস্ফোরণ, আমাদেরে হানে সুপ্রভাত!
—এবং কৃতার্থ সেও, যে জানায় মুগ্ধ প্রণিপাত
ভালোবেসে সূর্যাস্তেরে, যা স্বপ্নের চেয়েও মহান।

দেখেছি, মূর্ছায় কাঁপে ফুল, জল, মাটির ফাটল
তার সেই দৃষ্টিপাতে, স্পন্দমান হৃদয়ের মতো ···
চলো দিগন্তের দিকে। বেলা যায়। এখনো—হয়তো—
খুঁজে পাবো অস্তরাগে ক্ষীয়মান আলোর অঞ্চল।

কিন্তু না, বৃথাই ছোটা! অপসৃত আমার ঈশ্বর।
রাত্রি, অপ্রতিরোধ্য, স্যাঁৎসেঁতে, কবন্ধ, মৎসর,
ছড়ায় সাম্রাজ্য তার, আর্তিময়, চেতনারহিত।

পথ চলি ; অন্ধকারে কবরের গন্ধ ওঠে রুখে,
পা ঠেকে খানায়, গর্তে, নর্দমার শীতল শামুকে,
অচিন্ত্য ব্যাঙের গলা রাষ্ট্র করে বিষাদসংগীত।

একটি মুখের প্রতিশ্রুতি

পাণ্ডুবরনী, ভালোবাসি বাঁকা ভুরু তোমার,
দীপ্ত, তরল, অমার যুগল ঝরনা ;
এত কালো চোখ, তবু সে যন্ত্রী যে-ভাবনার
তাতে নেই শবযাত্রার অবতারণা।

সেই চোখ, যার ছন্দ তোমার নিবিড়, ঘন,
কৃষ্ণ কেশের চঞ্চলতায় মেলায় তাল,
সে-কালো চোখের লাস্য আমায় বলছে : 'শোনো—
যদি ভালোবাসো নম্যকলার ইন্দ্রজাল—

এসো না তাহ'লে, যে-আশা আমরা দিয়েছি জেলে—
এবং তোমার কল্পনাকেও—করবে জয়!
নাভিমূল থেকে নিতম্বময় প্রমাণ পেলে—
দেখবে আমরা পণরক্ষায় অকুতোভয়।

মোহন, পৃথুল, যুগল স্তনের বৃন্তে
ব্রোঞ্জের দুটি নিটোল মুদ্রা পড়বে ধরা,
আর উদরের সীমায় পারবে চিনতে
মখমল-কালো, বৌদ্ধের মতো স্বপ্নে ভরা,

কোমল রোমের ঐশ্বর্যের অন্ধকার,
এই কেশরের সত্য সোদরা, সধর্মিণী,
কোঁকড়া, লাজুক, চপল, গভীর—তুলনা যার
শুধু অমানিশা, তারাহীন নিশা, তমস্বিনী!'

মধ্যরাত্রির পরীক্ষা

মধ্যরাত্রি প্রতিধ্বনিতে লীন :—
ঘড়ির ঘণ্টা, কুটিল ব্যঙ্গভরে
শুধায়, বলো তো, কাটালে কেমন ক'রে
এ-ক্ষণে হ'লো নিঃশেষ যেই দিন ?
—আজ, হায় আজ, নিয়তিবিধুর তিথি,
ত্রয়োদশ দিন, অশুভ শুক্রবার,
নিষ্ফল ক'রে সর্বজ্ঞানের ভার
জাগ্রত শুধু পাপাচরণের স্মৃতি।

যীশু, ভগবান, সব সংশয়াতীত,
তাঁর বিরুদ্ধে রটিয়েছি বিদ্রোহ !
ভোজনশালায় হয়েছি গলগ্রহ
বিকট ধনীর প্রাচুর্যে পরিবৃত।
আমরা, যোগ্য অসুরসেবকগোষ্ঠী—
যাকে ভালোবাসি তাকেই অসম্মান,
যা-কিছু ঘৃণ্য তাকেই অর্ঘ্যদান
করেছি, জাগাতে জন্তুর সন্তুষ্টি ;

ঘাতকের মতো—কাপুরুষ, চাটুকার—
দুঃখী দীনের হয়েছি অত্যাচারী ;
বিরাট, কঠিন, ষণ্ডমুণ্ডধারী
নির্বুদ্ধিরে করেছি নমস্কার ;
জড়পদার্থে চুম্বন ক'রে ধন্য
মহানিষ্ঠায় আমরা নির্বিকার
পচা, গলা, পুঞ্জিত জঘন্যতার
পাংশুল বিকিরণেই মেনেছি পুণ্য !

অবশেষে, যাতে প্রলাপে আত্মহারা,
ডুবে যায় এই ঘূর্ণিত সংবিৎ,

আমরা, বীণার গরীয়ান পুরোহিত,
মাতাল মরণে রক্তে সাজায় যারা—
ক্ষুৎপিপাসার উৎসাহ ব্যতিরেকে
আমরা করেছি উৎকট পানাহার ! ··
—নিবে যাক বাতি, অতল অন্ধকার
আমাদের সব লজ্জাকে দিক ঢেকে !

কবিতার টীকা

গদ্য অংশে ব্যবহৃত সংকেত

আ — আনুমানিক

ফ — ফরাশি

ইং — ইংরেজি

কবিতার নাম

আলোকস্তম্ভ

স্তবক পঙক্তি

৫ ৪ প্যুজে : Puget, Pierre : সতেরো শতকের ফরাশি চিত্রকর, ভাস্কর ও বাস্তুশিল্পী।

৮ ৪ হ্বেবার : Weber, Karl Maria Friedrich Ernst von (১৭৮৬-১৮২৬) : জর্মান গীতকার। কেউ-কেউ এঁকে রোমান্টিকতার জনক ব'লে থাকেন।

রুগ্ন কবিতা

১ ৪ মিণ্টার্ন : ক Minturnes ; ইং Minturne ; গ্রীক ও লাতিন Minturnes : রোমের নিকটবর্তী জলাবহুল ক্ষুদ্র শহর ; রোমান যোদ্ধা Gaius Marius (খ্রি পূ ১৫৭-৮৬) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী Sulla (বা Sylla) কর্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে সেই জলার মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় ধরা পড়েন। প্লিনি, হোরাস, লিভি, সিসেরো প্রভৃতি লাতিন গ্রন্থকর্তারা বহুবার মিণ্টার্ন-এর জলার উল্লেখ করেছেন।

দুরদৃষ্ট

১ ১ সিসিফাস : ক. Sisyphe ; ইং Sisyphus ; গ্রীক Sisuphos : গ্রীক পুরাণে উক্ত করিন্থ-এর রাজা, নরগণের মধ্যে চতুরতম ব'লে খ্যাত ছিলেন। জীবৎকালে কৃত বহু দুষ্কর্মের জন্য মৃত্যুলোকে তাঁকে এক অসাধারণ শাস্তি দেয়া হয়। এক পাহাড়ের চুড়োয় মস্ত একটি পাথর গড়িয়ে-গড়িয়ে তোলা সিসিফাসের কাজ, কিন্তু শীর্ষদেশে পৌঁছনোমাত্র পাথরটি আবার গড়িয়ে প'ড়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁর পরিশ্রম অবিরাম।

'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর অন্যতম অপ্রকাশিত ভূমিকায় বোদলেয়ার নিজের কুম্ভিলতার উল্লেখ করেছিলেন : উত্তমর্ণদের মধ্যে টমাস গ্রে প্রথমোক্ত। এই কবিতার শেষ পঙক্তিদ্বয় স্পষ্টত গ্রে-র অনুলিখন ('Full many a flower is born to blush

unseen / And waste its sweetness on the desert air.')—জীদ-এর মতে 'অলৌকিক অনুবাদ'।

যাত্রী বেদেরা

৩ ৩ সিবেলী : ফ Cybele ; ইং Cybele ; গ্রীক Kubelē : এই দেবীর আদিনিবাস এশিয়া, ইনি 'মহামাতা', প্রকৃতির প্রজনন-শক্তির প্রতীক। গ্রীকরা এঁকে রেয়া (Rhea)-র সঙ্গে এক ক'রে দেখেছিলেন ; এবং রেয়ার সঙ্গে ধরিত্রীদেবী গে (Gē)-র বিশেষ প্রভেদ ছিলো না।

নরকে ডন জুয়ান

নিপ্রেম ও নির্বিবেক লম্পটের প্রতিরূপ হিশেবে যে-নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তা অনিশ্চিত। কিংবদন্তী অনুসারে, কাস্তিলের রাজা 'নিষ্ঠুর' পিটার-এর (১৩৩৪-৬৯) সভায় Don Juan Tenorio নামক এক ব্যভিচারী পুরুষের প্রতিষ্ঠা ছিলো ; পরে সেভিল প্রদেশেও একই নাম ও চরিত্রের অন্য এক পুরুষ উদ্গত হন। দেনিস দা রুজুমঁ তাঁর *Love in the Western World* গ্রন্থে লিখেছেন যে ডন জুয়ান কর্তৃক ভুক্তিত নারীর সংখ্যা এক স্পেন দেশেই ১০০৩, এবং অন্যান্য দেশে ১০৬২। এই সংখ্যা দুটি এমন যথাযথ যে উপরোক্ত কিংবদন্তীকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব মনে হয় না।

লিখিত সাহিত্যে ডন জুয়ানকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন স্পেনীয় নাট্যকার তির্সো দে মলিনা (Tirso de Molina, ১৫৮৪-১৬৪৮)। ইনি ছিলেন সন্ন্যাসী ; এঁর প্রকৃত নাম গাব্রিয়েল তেল্লেৎস্ (Gabriel Tellez)। 'সেভিলের ধূর্ত ও প্রস্তরময় অতিথি' (*El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra*) নামক নাটকে ডন জুয়ানের যে-সব কীর্তিকলাপ তিনি বর্ণনা করেন, তা পরবর্তী কালে সমগ্র খ্রিষ্টান জগতে ছড়িয়ে পড়ে। য়োরোপীয় বহু ভাষায়, বহু কাব্য, নাটক ও গীতিনাট্যে এই নায়ক চিত্রিত হয়েছেন ; তার মধ্যে মলিয়ের, মোৎসার্ট ও বায়রনের সৃষ্টি জগজ্জয়ী, আর হসে থসরিল্লা (Jose Zorillay Moral, ১৮১৭-৯৩) প্রণীত *Don Juan Tenorio* নাটক স্পেনে এত

দূর জনপ্রিয় যে প্রতি বৎসর ১ ও ২ নবেম্বর তারিখে দেশের প্রত্যেকটি রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় হয়।

মলিনার নাটকে ডন জুয়ানের পিতার নাম ডন লুইস, পত্নীর নাম এলভিরা, ভৃত্যের নাম কাতালিনন। কোনো-এক সেনাপতিকন্যার কৌমার্যহরণের চেষ্টায় প্রতিহত হ'য়ে ডন জুয়ান কন্যার পিতাকে নিধন করেন। বহুদিন পরে, এক মঠে সেই সেনাপতির প্রস্তরমূর্তি দেখতে পেয়ে মূর্তিটিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করলে, প্রস্তরিত পুরুষ সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ডন জুয়ানকে সবলে নরকে টেনে নিয়ে যান। এই কাহিনী অবলম্বন ক'রেই মলিয়ের তাঁর গদ্যনাটক 'ডন জুয়ান' রচনা করেন। সেখানে ভৃত্যটির নাম স্‌গানারেল্লে (মোৎসার্ট ও পুশকিনে লেপোরেল্লো); উভয় নামই ইটালি থেকে আমদানি। মলিয়েরের ডন জুয়ান, অন্তিম কালে, প্রস্তরমূর্তির হাত চেপে ধরা মাত্র এক অদৃশ্য ও আন্তরিক অনলে দগ্ধ হ'তে লাগলেন; মাটি কেটে অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো, আর সেই গহ্বরে প্রভুকে অন্তর্হিত হ'তে দেখে স্‌গানারেল্লে চেঁচিয়ে উঠলো: 'আমার বেতন! আমার বেতন চুকিয়ে দিন!' ১৬৬৫ সালে প্রথম অভিনয়কালে মলিয়ের নিজে এই ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এই কবিতার রচনাকালে বোদলেয়ারের মনের সামনে ছিলো মলিয়েরের নাটক, আর দ্যলাক্রোয়ার একটি চিত্র। চিত্রটির নাম 'ডন জুয়ানের নৌকাডুবি', ঘটনাটি বায়রন থেকে সংগৃহীত। বোদলেয়ারে নৌকো এসেছে দ্যলাক্রোয়া থেকে, স্‌গানারেল্লে মলিয়ের থেকে, আর শেষ স্তবকের 'শিলাময় পুরুষ'টি কে, তা আশা করি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

ডন জুয়ান নামের ইংরেজি উচ্চারণ রক্ষা করা হ'লো, কেননা আমরা তাতে বহুকাল ধ'রে অভ্যস্ত আছি।

কারন: গ্রীক পুরাণে পাতালের নাম হেডিস (ইং Hades; গ্রীক Haidēs = অদৃশ্য), স্টিক্স নদী (ইং Styx; গ্রীক Stux = ঘৃণ্য) পার হ'য়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। যে-মাঝি মৃতদের নিয়ে এই নদী পারাপার করে তার নাম কারন

(Charon)। কারন এক কদাকার বৃদ্ধ, পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে একটি ক'রে মুদ্রা নেয়। প্রাচীন গ্রীকরা অন্ত্যেষ্টি-কালে মৃতের মুখে একটি মুদ্রা পুরে দিতো (হিন্দুদের মধ্যে 'পারানির কড়ি'র প্রচলন আছে); খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত গ্রীসে এই প্রথা প্রচলিত ছিলো।

১ ৩ আন্তিস্থিনীস : সক্রেটিস-এর ছাত্র ও বন্ধু, 'cynic' নামধারী দার্শনিকদের গুরু। তিনি প্রচার করেন যে সুখী হ'তে হ'লে বাসনা থেকে মুক্ত হ'তে হবে। এই বৈরাগ্যবাদকে চরমে নিয়ে যান দিওজিনীস, গ্রীক ভাষায় যাঁর ডাকনাম ছিলো kuōn = কুকুর। Skeat-এর মতে 'cynic' শব্দ kuōn থেকে উদ্ভূত, তার মূল অর্থ 'কুক্কুরতুল্য'। ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে ইংরেজি ভাষায় 'cynic'-এর বর্তমান অর্থ প্রচলিত হ'তে আরম্ভ করে।

আদর্শ

২ ২ গাভার্নি : Gavarni, Paul (১৮০৪-৬৬) : ফরাশি ব্যঙ্গচিত্রকর। এঁর প্রকৃত নাম ইপলিৎ স্যুলপিস গিওম শেভালিয়ে (Hippolyte Sulpice Guillaume Chevalier)। প্যারিসের বোহিমীয় ও ছাত্রজীবনের চিত্রাবলির জন্য ইনি বিখ্যাত ছিলেন। বোদলেয়ার একটি প্রবন্ধে তাঁকে 'dandyism-এর কবি' ব'লে অভিহিত করেন।

৩ ৩ 'স্বপ্ন দেখেছেন যাকে ইস্কিলাস' : এখানে স্পষ্টত স্বামীঘাতিনী ক্লাইতেমনেস্ত্রাকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪ ১ মিকেলাঞ্জেলোর কন্যা : ফ্লরেন্সে মেদিচি চ্যাপেলের জন্য মিকেলাঞ্জেলো যে-সব মূর্তি গড়েন, 'রাত্রি' তার অন্যতম। ঢালু শয্যায় এলিয়ে ব'সে আছে এক নগ্ন যুবতী, তার মুখ আনত, চক্ষু নিমীলিত, ডান হাতটি মস্তক স্পর্শ ক'রে আছে। তার পিঠের দিকে অর্ধ-শায়িত আছে 'দিবা', এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধ পুরুষ। দুয়ের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে পরস্পরে কখনো দেখা হবে না।

মিকেলাঞ্জেলো রমণীরূপের অনুরাগী ছিলেন না; নারীর চিত্র বা মূর্তির জন্য অধিকাংশ সময় পুরুষ-মডেল ব্যবহার করতেন। এইজন্য তাঁর নারীমূর্তিতে লালিত্য বা কমনীয়তা নেই, পেশীর ভার

অত্যধিক, নারীত্বের লক্ষণগুলিকে সুসংগত মনে হয় না। 'রাত্রি'রও দেহ পুরুষোচিত, সুন্দর মুখশ্রীটি রূপবান যুবকের ব'লে কল্পনা করা যায়। 'মনে হয় মূর্তিটি প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারে'—এক বন্ধুর এই মন্তব্যের উত্তরে মিকেলাঞ্জেলো যে-পদ্য লিখে পাঠিয়েছিলেন তার ভাবার্থ এই :

'আমি ভালোবাসি নিদ্রা, কিন্তু, লজ্জা ও অন্যায় যতদিন টিকে আছে, প্রস্তরিত সুষুপ্তি আমার প্রিয়তর। আমার সৌভাগ্য এই যে আমি কিছুই দেখি না, শুনি না। জাগিয়ো না আমাকে, রুদ্ধ-শ্বাসে চ'লে যাও।'

কিন্তু মিকেলাঞ্জেলোর কবিতার তুলনায় ভাস্কর্যই সত্যবাদী; মূর্তিটিতে নিদ্রার আবেশের চাইতে প্রাণের স্পন্দন বেশি লক্ষিত হয়; বোদলেয়ার তাকে লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসিয়ে ভুল করেননি।

অলংকার

৭ ২ আন্তিওপি : Antiope : গ্রীক পুরাণে Zeus-এর অন্যতম প্রণয়িনী।

দূরাগত সুবাস

২ ৩-৪ এই পঙক্তি দুটি বিষয়ে আঁদ্রে জীদ-এর মন্তব্য : 'বোদলেয়ার উল্লেখ করেছেন পুরুষের শুধু শরীর, আর নারীর নৈতিক গুণ। এইখানেই কবিতাটির বিস্ময়।' মূলে 'সরলতা'র বিশেষণ etonne = বিস্ময়জনক।

কবিতাটির শেষ দুই পঙক্তি প'ড়ে মালার্মের বিখ্যাত পঙক্তি—'কিন্তু নাবিকের গান কী মধুর সেখানে, হৃদয়!' (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ)—মনে না-পড়া অসম্ভব।

এক মাথা চুল

এই কবিতা, ও 'ভ্রমণের আমন্ত্রণ' বোদলেয়ার দু-বার ক'রে লিখেছিলেন— পদ্যে ও গদ্যে। 'এক মাথা চুল'-এর গদ্য লেখনের অনুবাদ 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় মুদ্রিত আছে; কৌতূহলী পাঠক মিলিয়ে পড়তে পারেন। বাংলা অনুবাদে ছোটো-বড়ো পঙক্তিবিন্যাস করা হয়েছে, কিন্তু মূল রচনা গদ্যের মতো সাজানো।

১ ৪ ওবি : Obi : আফ্রিকার মাদুলি, জাদুবিদ্যা বা জাদুকর ; এখানে শেষের অর্থটাই বোঝাচ্ছে। শব্দটি পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় প্রবেশ করে, ইংরেজি অভিধানে obeah বানানও পাওয়া যায়।

সাভানা : ফ savane ; ইং savannah : দক্ষিণ আমেরিকার নিষ্পাদপ প্রান্তর।

৪ ১ মেগীরা : গ্রীক Megaera ('ঈর্ষাপরায়ণা') : গ্রীক Erīnyes (ইং the Furies)-এর অন্যতমা। এঁরা প্রতিহিংসার দেবী ; পাপীকে শাস্তিদান এঁদের বিশেষ অধিকার। কখনো-কখনো এঁরা Eumenides ('করুণাশীল') বা Semnai ('পবিত্র') আখ্যাও পেয়ে থাকেন। সর্পজড়িত পক্ষশালিনী নারীরূপে এঁদের সাধারণত কল্পনা করা হয়, যদিও এঁদের সকরুণ মূর্তিরও উল্লেখ আছে। হোমারে এঁদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই ; ইউরিপিদেস প্রথম এঁদের ত্রয়ী ব'লে নির্দেশ করেন।

৪ ৩ প্রসার্পিনা : Proserpina : গ্রীক পাতালের দেবী Persephone-র রোমান নাম।

এই সনেটে প্রথম দুটি চতুষ্পদীতে দুটিমাত্র মিল ব্যবহৃত হয়েছে (কখখক কখখক) ; অনুবাদে এই ব্যবস্থা রক্ষা করেছি। মূলের শিরোনামা লাতিনে : Sed Non Satiata।

এক শব

এই কবিতার বিষয়ে রিলকে তাঁর 'মাল্টে লাউরিড্‌জ্‌ ব্রিগ্‌গে' গ্রন্থে লিখেছেন :

'তোমার মনে আছে বোদলেয়ারের সেই অবিশ্বাস্য কবিতা, "এক শব" ? হয়তো এখন সেটি আমার বোধগম্য হয়েছে। শেষ স্তবকটিতে ছাড়া, কবি তাঁর স্বাধিকার লঙ্ঘন করেননি। এই অভিজ্ঞতার পর আর কী করবার ছিলো তাঁর ? যা-কিছু ভীষণ, শুধু আপাতদৃষ্টিতে যা-কিছু জঘন্য, তার মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সেই সত্তাকে, এই নিখিল অস্তিত্বের মধ্যে যা একমাত্র মূল্য-

বান। তা দেখতে পাওয়াই তাঁর কাজ ছিলো। নির্বাচন বা প্রত্যাখ্যান অসম্ভব।…'

ক্লারা রিলকে-কে লেখা একটি পত্রে এই কবিতা বিষয়ে রিলকে প্রায় একই কথা প্রায় একই ভাষায় বলেছিলেন। সেখানে প্রসঙ্গত সেজ়ানের উল্লেখ আছে: ' "এক শব" লেখা না-হ'লে সেই তন্ময় প্রকাশের ধারা আরম্ভ হ'তেই পারতো না, যা আজকের দিনে সেজ়ান-এ আমরা লক্ষ করছি: প্রথমে, তার সমগ্র নির্মমতা নিয়ে, এইটির প্রয়োজন ছিলো।… তুমি বুঝতে পারবে আমি কতদূর বিচলিত হয়েছিলাম এই খবরটি প'ড়ে যে সেজ়ান, তাঁর শেষ জীবনেও, এই কবিতাটিকে কণ্ঠস্থ রেখেছিলেন, পারতেন এটিকে অক্ষরে-অক্ষরে আবৃত্তি করতে।…'

পাতাল থেকে আমি ডেকেছি

মূল শিরোনামা: De Profundis Clamavi: বাইবেলের অশীতিতম স্তোত্রের লাতিন অনুবাদের আরম্ভ। De Profundis-এর একটি অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে মনস্তাপ বা আর্তিময় কোনো রচনা।

লিথি

Lethe: লাতিন কাব্যে বিস্মরণের নদী, হিন্দু বৈতরণীর সঙ্গে তুলনীয়।

সে-রাতে ছিলাম…

এই কবিতার বোদলেয়ার কোনো নামকরণ করেননি।

কোন কথা আজ বলবি রাতে

৪ ৩ সরস্বতী: মূলে Muse।

এই কবিতারও বোদলেয়ার কোনো নামকরণ করেননি।

ভ্রমণের আমন্ত্রণ

বোদলেয়ার কখনো হল্যাণ্ডে যাননি, কিন্তু এই কবিতায় যে-চিত্র আঁকা হয়েছে তা আমস্টার্ডাম বা রটার্ডাম নগরের, গৃহসজ্জাও ওলন্দাজ। ওলন্দাজ 'অভ্যন্তর' জগৎবিখ্যাত, ভের্মেয়র ও অন্যান্য শিল্পীর সাহায্যে তার সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি।

কবিতাটির একটি গদ্য লেখন আছে। পদ্যে আছে ছন্দের সম্মোহন, ধুয়োটি মূল ভাষায় ঐন্দ্রজালিক, কিন্তু সেই 'ল্যুক্স, কাল্ম্

ও ভল্যাপ্তে' গল্পরচনাটিতে আরো বেশি ব্যাপ্ত, বোদলেয়ারের বিখ্যাত 'correspondence'-এর উল্লেখ সেখানে আরো একবার পাওয়া যায়। কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করি :

'আমি পেয়েছি আমার কা লো টি উ লি প, আমার নী ল ডে লি য়া !···অতুলনীয় ফুল, পুনরাবিষ্কৃত টিউলিপ, রূপকময় ডেলিয়া, তুমি কি বাঁচবে, তুমি কি ফুটবে শুধু সেখানেই, তা-ই কি নয়, সেই সুন্দর দেশে, এমন শান্ত, এমন স্বপ্নে ভরা ? সেখানে তুমি কি তোমার নিজেরই উপমার ফ্রেমে বাঁধাই হবে না, দেখবে না নিজেকে প্রতিফলিত তোমার আপন প্রতিবঙ্গে ?

স্বপ্ন ! নিরন্তর স্বপ্ন ! আর আত্মা যত বেশি সুকুমার, যত বেশি অভীপ্সু, স্বপ্ন তত বেশি অসম্ভব। আফিমের নিজ-নিজ স্বাভাবিক মাত্রা আছে প্রত্যেক মানুষের ; অনবরত সে তা ক্ষরণ করে, জীইয়ে তোলে ; আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতটুকু সময় আমরা হিশেব করতে পারি যাতে সুখী হয়েছিলাম, পেয়েছিলাম কোনো সুস্পষ্ট কাজে কৃতিত্ব ? কখনো কি আমরা বাঁচবো তার মধ্যে, অংশ হবো তার, যে-ছবি এঁকেছে আমার কল্পনা, আর তোমারই সঙ্গে যা তুলনীয় ?'

এই কবিতার ধুয়ো :

> Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
>
> Luxe, calme et volupté—

পঙক্তি দুটির বিষয়ে আঁদ্রে জীদ তাঁর 'জর্নাল'-এ লিখেছেন :

'যেখানে অমনোযোগী পাঠক দেখতে পাবেন শুধু এক শব্দ-প্রপাত, আমি দেখছি শিল্পকর্মের নিখুঁত সংজ্ঞার্থ। এর প্রতিটি শব্দকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি আমি, তারপর মুগ্ধ হই তাদের মালা-রচনায়, সংযোগের প্রভাবে ; কেননা এর একটিও অনর্থক নয়, প্রত্যেকটি যথাযথভাবে স্বস্থ। নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে কোনো-এক গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের শিরোনামা হিশেবে আমি এদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি :

১. শৃঙ্খলা (যুক্তি, বিভিন্ন অংশের ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা) ;
২. সৌন্দর্য (রেখা, বেগ, রচনাটির অবয়ব) ;
৩. বিলাস (নিয়মনিষ্ঠ বৈভব) ;

৪. শান্তি (অস্থিরতার অপনোদন);

৫. সুখলিপ্সা (ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, আকর্ষণযোগ্যতা, জড়বস্তুর আরাধ্য সম্মোহন)।'

ফরাশি 'volupté' শব্দটি— যা বোদলেয়ারের অন্যতম প্রিয়তম— অনুবাদে আনা অসম্ভব; আত্মীয় ইংরেজি ভাষাতেও তার ব্যবহারযোগ্য প্রতিশব্দ নেই। 'Voluptuousness' একটা তথ্য, হয়তো খুব মনোরম তথ্যও নয়; আর 'volupte' একটা সুর, একটা বর্ণগন্ধস্পর্শময় আবহাওয়া। মূলের এই আবহাওয়াটিকে ধরার চেষ্টায় আমি অনুবাদে 'উৎসব' কথাটা যোগ করেছি।

কোনো ক্রেয়ল মহিলাকে

এটি বোদলেয়ারের প্রথম যৌবনের রচনা; তাঁর প্রাচ্য ভ্রমণের প্রথম প্রসূন। যাঁর উদ্দেশে লেখা হয়েছিলো, তিনি ছিলেন মরিশাস দ্বীপের বাসিন্দা; সেখানে তিন সপ্তাহ অপেক্ষাকালে এই মহিলা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে বোদলেয়ারের বন্ধুতা হয়। মহিলাটি জাতে ফরাশি, কিন্তু মরিশাসের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের আখ্যাও ক্রেয়ল।

বিড়ালেরা

২ ৪ এরেবস্: Erebos: গ্রীক পুরাণে আদিম অন্ধকার; Chaos-এর সন্তান, এবং, সহোদরা রাত্রির গর্ভে, দিনের পিতা।

প্যাঁচারা

এই কবিতার শেষ দুই পঙক্তির সঙ্গে পাস্কালের এক বিখ্যাত উক্তি তুলনীয়: 'মানুষের সব দুর্ভাগ্যের একটিমাত্র কারণ, তা এই যে সে একটি ঘরে স্থির হ'য়ে থাকতে জানে না।' 'Anywhere out of the world' (বোদলেয়ার এই নাম ইংরেজিতে দিয়েছিলেন) নামক গদ্যকবিতার আরম্ভটিও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: 'জীবন এক হাসপাতাল, যেখানে প্রত্যেক রোগী বিছানা বদল করার জন্য পাগল। কেউ চায় চুল্লির উল্টো দিকে কষ্ট পেতে, কেউ ভাবে জানলার ধারে গেলেই সে সেরে উঠবে।'

বিতৃষ্ণা

এই চারটি কবিতার মূল শিরোনামা Spleen।

বিষাদ, বিতৃষ্ণা বা মানসিক অবসাদের অর্থে এই শব্দের ব্যবহার আধুনিক ইংরেজিতে লুপ্তপ্রায়; এখন ইংরেজরা 'spleen'

বলতে বোঝে ক্রোধ অথবা বদমেজাজ; 'splenetic' বিশেষণেরও মানে দাঁড়িয়েছে 'খিটখিটে'। কিন্তু ফরাশিরা এই শব্দটিকে পরম বিতৃষ্ণার অর্থে ইংরেজি থেকে চয়ন ক'রে নিয়েছে; বোদলেয়ার একে বিখ্যাত করেছেন।

অনুকম্পায়ী ত্রাস

২ ৩-৪ নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে এমন কবির অভাব নেই জগতে; এই তালিকার মধ্যে দান্তেও আছেন, এবং আধুনিক যুগে উগো থেকে মান্ পর্যন্ত বহু নাম স্মর্তব্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথম উচ্চার্য তিনি লাতিন কবি ওভিদ (Publius Ovidius Naso : খ্রি পূ ৪৩-খ্রি প ১৮)। একান্ন বছর বয়সে এই বিলাসী ও নাগরিক কবি সম্রাট অগস্টাস কর্তৃক নির্বাসিত হন। তখন তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশীল কাব্য *Metamorphoses*('রূপান্তর') সবেমাত্র শেষ করেছেন। দণ্ডের উপলক্ষ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত *Ars Amatoria* ('প্রেমকলা') কাব্যের 'দুর্নীতি', আসল কারণ রাজসভার চক্রান্ত, মহিষী লিভিয়া ও রাজকন্যা জুলিয়ার মধ্যে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ *Ars Amatoria*-র একটি সাম্প্রতিক অনুবাদের ভূমিকার অংশে পাওয়া যাবে (*The Lover's Handbook*, F. A. Wright : Routledge & Kegan Paul)।

নির্বাসন হ'লো কৃষ্ণসাগরের তীরে টোমি নামক জনপদে, বর্তমানে সে-দেশের নাম রুমানিয়া। 'লাতিন স্বর্গে'র তুলনায় বর্বর সেই ভূখণ্ড, প্রকৃতিও প্রতিকূল, শীতে ড্যান্যুব নদী শিলাবিস্তারে পরিণত হয়। যিনি রোমক অভিজাত সমাজের প্রেমগুরু ব'লে কথিত ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই নির্বাসন মৃত্যুর মতো হয়েছিলো। স্টেফান ৎসোয়াইক দক্ষিণ আমেরিকায় সস্ত্রীক আত্মহত্যা করেছিলেন, কিন্তু ওভিদের অন্তত আশা ছিলো যে কোনো একদিন সম্রাটের মন টলবে। কিন্তু অগস্টাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিবেরিয়াস যখন সম্রাট হলেন তখন সে-আশা অস্তমিত হ'লো। টিবেরিয়াস ছিলেন সনাতনপন্থী, লিভিয়ার যোগ্য পুত্র, যে-লিভিয়া স্বামীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন ব'লে কথিত আছে। দশ বছরব্যাপী নির্বাসন-ভোগের পর, একষট্টি বছর বয়সে, সেই কৃষ্ণসাগরের তীরেই ওভিদের

মৃত্যু হ'লো। স্থানীয় লোকেরা সসম্মানে কবর দিলে তাঁকে; স্মৃতিফলকে অঙ্কিত হ'লো তাঁর খেদময় বাণী: 'আমার কবিতা, তুমি রোমে যাবে, কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না।'

ওভিদ নির্বাসনে যে-সব কাব্য রচনা করেন, তার মধ্যে *Tristia* ('দুঃখেরা') প্রধান। পত্নীকে লেখা পত্রের আকারে রচিত এই দীর্ঘ কাব্যে আছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক ও বর্ণনার প্রাচুর্য আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিষাদ, যে-গুণটি তাঁর আগে ছিলো না। আর-একটি কাব্য, *Ex Ponto* ('কৃষ্ণসাগর থেকে') বিবিধ রোমক বন্ধুর কাছে পত্রাকারে রচিত। তার দুটি পঙক্তি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য:

I am more old than Pylos' ancient king
If we take troubles in our reckoning.

(অনুবাদ: Wright)

কেননা 'বিতৃষ্ণা (২)'-এর প্রথম পঙক্তিতে এর প্রতিধ্বনি আছে।

দ্যলাক্রোয়ার একটি চিত্রের বিষয় ওভিদের নির্বাসন। প্রবীণ কবি ভূমিতে অর্ধশায়িত, সামনে সমুদ্র, দূরে পাহাড়; আর তাঁকে ঘিরে আছে স্থানীয় সিদিয়ান নরনারী। তাদের কারো সঙ্গে কুকুর, কেউ ঘোটকীর দুধ দোওয়াচ্ছে, কেউ বা ফলমূল এনেছে কবির জন্য। তাদের ভঙ্গিতে কৌতূহল, বন্ধুতা, বাৎসল্য। একটি গাঢ় বিষাদ সারা দৃশ্যটিতে ব্যাপ্ত। এই চিত্র বিষয়ে বোদলেয়ার এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন: 'ওভিদের সব উর্বরতা ও প্রাচুর্য এই চিত্রে প্রবেশ করেছে। ··· এটি সেই সব আশ্চর্য ছবির অন্যতম, যা শুধু দ্যলাক্রোয়ার পক্ষেই কল্পনা ও সৃষ্টি করা সম্ভব।'

লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে

৮ ১ বেলো: Belleau, Remi: ষোড়শ শতকের ফরাশি গীতিকবি।

১০ ৪ রঁসার: Ronsard, Pierre de (১৫২৪-৮৫): ফরাশি কবিগুরু, প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত।

১১ ৪ ভালোয়া: Valois: ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ রাজবংশ; ১৩২৮ থেকে ১৫৮৯ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

জীবনের তরুণ ও বিলাসী অধ্যায়ে বোদলেয়ার সবান্ধবে এই 'লাল চুলের ভিখিরি মেয়ে'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মেয়েটির নাম

জানা যায়নি, কিন্তু এমিল দ্যরয়-এর আঁকা প্রতিকৃতি তার মুখশ্রীকে উত্তরকালের জন্য ধ'রে রেখেছে; তার উদ্দেশে বাঁভিলও একটি কবিতা লেখেন, তার নাম 'কোনো পথচারিণী গায়িকাকে'। আর-একটি কবিতা, 'A une jeune Saltimbanque' (Saltimbanque — সার্কাস ইত্যাদির ভাঁড় বা খেলোয়াড়), বোদলেয়ারের রচনা ব'লে কোনো-এক সময়ে চলিত থাকলেও আধুনিক গবেষকরা সে-ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কবিতা দুটি পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু তাদের নাম শুনে মনে হয় মেয়েটি ঠিক ভিখারিনী ছিলো না, পথে-পথে নেচে-গেয়ে জীবিকা অর্জন করতো।

রাজহাঁস

১ ১ আন্দ্রোমাকি : ট্রয়ান সেনাপতি হেক্তোরের স্ত্রী আন্দ্রোমাকি, ট্রয় নগরীর ধ্বংসের পর আকিলিস-পুত্র পিরহুস (Pyrrhus : নামান্তরে, Neoptolemus)-এর ভাগে পড়েন। পরে ট্রয়ান গণক হেলেন্নুস-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হোমারের 'ইলিয়াডে' হেক্তোর-পত্নী জায়া ও মাতার আদর্শরূপে অঙ্কিত হয়েছেন, ইউরিপিদেসের 'আন্দ্রোমাকি' নাটকের অভাগিনী নায়িকা তিনি, 'ট্রয়ান উইমেন' নাটকেও সবচেয়ে শোকাবহ দৃশ্যের অবলম্বন, সেনেকা ও ভার্জিল কর্তৃক কীর্তিত, এবং রাসীনের 'আঁদ্রোমাক' নাটকের অরুন্তুদ ঘটনাবলির কেন্দ্রস্থল। এই কবিতায় তিনি নির্বাসিত ও নিপীড়িতের প্রতিভূ।

১ ৪ সিময়ীস (Simoïs) : উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার ক্ষুদ্র নদী, ট্রয়ান যুদ্ধের অনেক ঘটনার স্থান।

২ ২ কারুজেল (Carrousel) : প্যারিসের পাড়া।

৭ ১ ওভিদের নায়কের মতো : 'অনুকম্পায়ী ত্রাস' কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।

এক পথচারিণীকে

নের্ভালের 'ল্যুক্সেমবুর্গের গলি' এই কবিতার উত্তমর্ণ। মূল কবিতাটি তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না, কেননা সেটি আকারে ক্ষুদ্র আর তার ভাষা এত সহজ যে তার অর্থোদ্ধার করার জন্য বেশি ফরাশি জানতে হয় না :

UNE ALLEÉ DU LUXEMBOURG

Elle a passe, la jeune fille
Vive et preste comme un oiseau :

À la main une fleur qui brille,
À la bouche un refrain nouveau.

C'est peut être la seule au monde
Dont le coeur au mien répondrait,
Qui venant dans ma nuit profonde
D'un seul regard l'éclaircirait !

Mais non, — ma jeunesse est finie ...
Adieu, doux rayon qui m'as lui,—
Parfum, jeune fille harmonie ...
La bonheur passait, — il a fuit !

(সে চ'লে যায়, তরুণী মেয়েটি, পাখির মতো দ্রুত আর চঞ্চল। হাতে তার উজ্জ্বল একটি ফুল, মুখে তার নতুন এক গান।

হয়তো এই জগতে সে-ই একমাত্র, আমাকে সাড়া দেবে যার হৃদয়, আর যার একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে আলো হ'য়ে উঠবে আমার গহন রাত্রি !

কিন্তু না — অবসিত আমার যৌবন ··· বিদায়, দ্যুতিরেখা, যে আমাকে দীপ্ত করলে,—বিদায়, সুর, সৌরভ, তরুণী ··· সুসময় ফুরিয়ে যায়— ফুরিয়ে গেলো !)

জীবনের শেষ অধ্যায়ে, যখন তাঁর বুদ্ধিলোপ হয়েছে, বোদলেয়ার মাঝে-মাঝে নিজেকে নের্ভাল ব'লে কল্পনা করতেন। যে-ক'জন ফরাশি কবির কাছে তিনি ঋণী, নের্ভাল তাঁদের অন্যতম।

মরণের নৃত্য

মৃত্যু বিষয়ে হিন্দু ও খৃষ্টান মনোভাব স্পষ্টত ভিন্ন; তার একটি কারণ, আমার মনে হয়, দুই ধর্মের বিভিন্ন অন্ত্যেষ্টিপ্রথা। দগ্ধ হ'লে মৃতদেহের চিহ্নমাত্র আর থাকে না, কিন্তু কবরের তলায় কঙ্কাল দুর্মরভাবে টিকে থাকে। পচিত মাংস, মাংসভুক্ কৃমি, অস্থি, করোটি, কঙ্কাল — এগুলি তাই পাশ্চাত্ত্য মানসে নিদারুণভাবে বাস্তব। কঙ্কাল, মধ্যযুগ থেকেই, খৃষ্টান শিল্পে মৃত্যুর একটি প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে, তার একটি প্রকাশ Danse Macabre, মরণের নৃত্য।

মধ্যযুগে কুসংস্কার ছিলো, মৃতেরা মাঝে-মাঝে কবর থেকে উঠে যূথবদ্ধভাবে নৃত্য করে। হয়তো তা থেকেই এই শিল্পরূপের উদ্ভব হয়েছিলো। পনেরো ও ষোলো শতকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও প্রতিবেশী

দেশগুলিতে এই 'নৃত্যে'র চিত্ররূপ অবিরলভাবে দেখা দিতে লাগলো, সম্ভবত তার একটি কারণ সে-কালে প্লেগ-মড়কের প্রাদুর্ভাব। অনেক গির্জে ও মঠের দেয়ালে আজ পর্যন্ত সে-সব ছবি দ্রষ্টব্য। জীবিত-গণকে কঙ্কালরূপী মৃত্যু এসে ডাক দিচ্ছে বা আকস্মিকভাবে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, সম্রাট থেকে কৃষক পর্যন্ত কারোরই নিষ্কৃতি নেই, মানুষমাত্রেরই দোসর তার কঙ্কাল— এই হ'লো চিত্রপর্যায়ের বিষয়। অঙ্কিত হ'তো নানা অবস্থার নানা মর্যাদার নরনারী, দেখানো হ'তো মৃত্যুর কাছে সকলেই সমান। কখনো-কখনো প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে রচিত হ'তো মুমূর্ষু ও মৃত্যুর একটি ক'রে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ। এই পর্যায়ে কনিষ্ঠ হান্স হোলবাইন-এর অবদান বিখ্যাত; কাষ্ঠ-ফলকে ক্ষোদিত ক'রে তিনি যে-মরণের নৃত্য এঁকেছিলেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি বাস্তবধর্মী। পাঠকের কৌতূহল হ'লে ছবিগুলি দেখে নিতে পারেন (*The Dance of Death*, **Hans Holbein**: **Phaidon Press**)।

এর্নেস্ত ক্রিস্তফ (Ernest Christophe: ১৮২৭-৯২) ছিলেন বোদলেয়ারের সমকালীন একজন ভাস্কর; তাঁর গড়া 'Danse Macabre' নামক নারীকঙ্কালের মূর্তি এই কবিতার উৎসস্থল। মূর্তিটির প্রতিলিপি এই পুস্তকে মুদ্রিত হ'লো। পাঠক লক্ষ করবেন, মূর্তিটি অংশতমাত্র। বাম বক্ষটি প্রায় সুগঠিত; গ্রীবা, হস্ত ও নিম্নাঙ্গে মাংসের আভাস আছে; আছে লুণ্ঠিত ঘাঘরা, ডান কাঁধে উত্তরীয়, মস্তকে কেশগুচ্ছ। অর্ধ-নারী, অর্ধ-কঙ্কাল, মূর্তিটি তার করোটির বিকট হাস্যে জীবিতদের ব্যঙ্গ করছে। ডান হাতে এক সুশ্রী পুরুষের মুণ্ড সে ধ'রে আছে, ডান দিকের প্রস্তরের গঠনেও আরো একাধিক মুখ লক্ষণীয়। হয়তো এই পুরুষেরা এর প্রেমিক ছিলো; হয়তো এর লালসা মৃত্যুতেও নিবৃত্ত হয়নি।

মূর্তিটির বিষয়ে গুণগ্রাহী আলোচনা লিখতে গিয়ে বোদলেয়ার এই কবিতার প্রথম কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তাঁর গদ্যও এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য:

'কল্পনা করুন এক বিরাট নারীকঙ্কাল, প্রমোদস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত। চ্যাপ্টা-হ'য়ে-যাওয়া কাফ্রি ছাঁদের মুখ তার; ঠোঁট নেই, মাড়ি নেই, কিন্তু হাসি আছে; দৃষ্টি শুধু ছায়াময় গহ্বর— এই
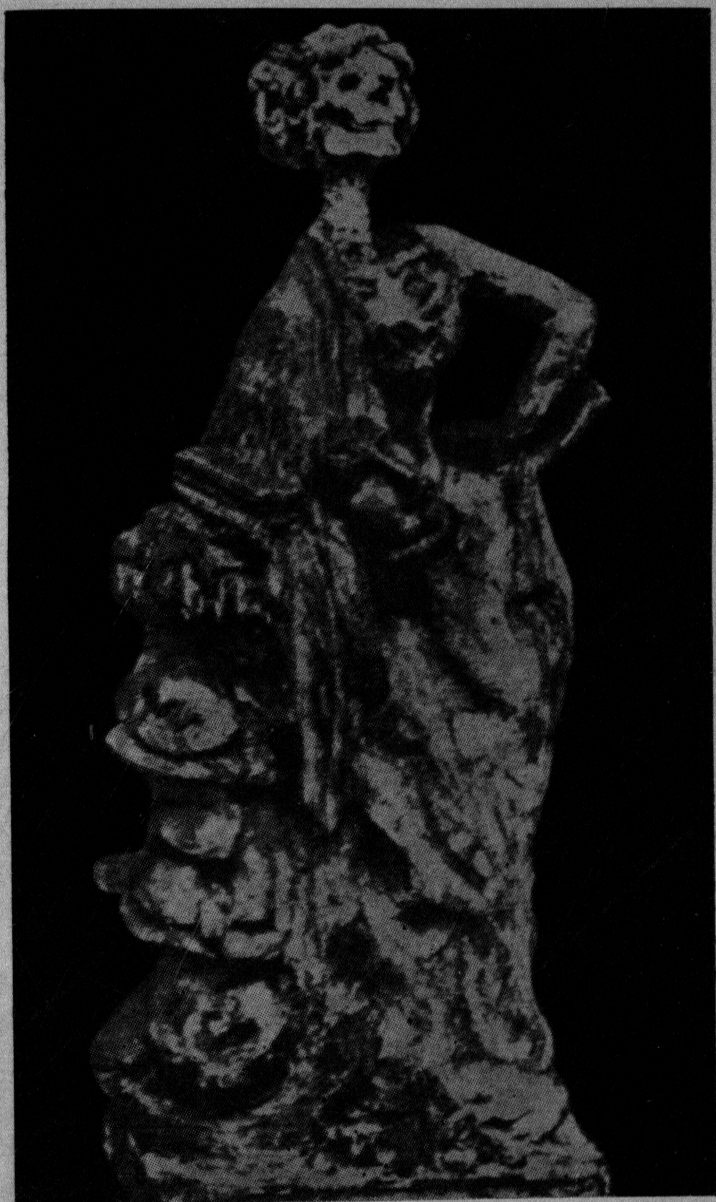
মরণের নৃত্য

এর্নেস্ত ক্রিস্তফ-রচিত প্রস্তরমূর্তি
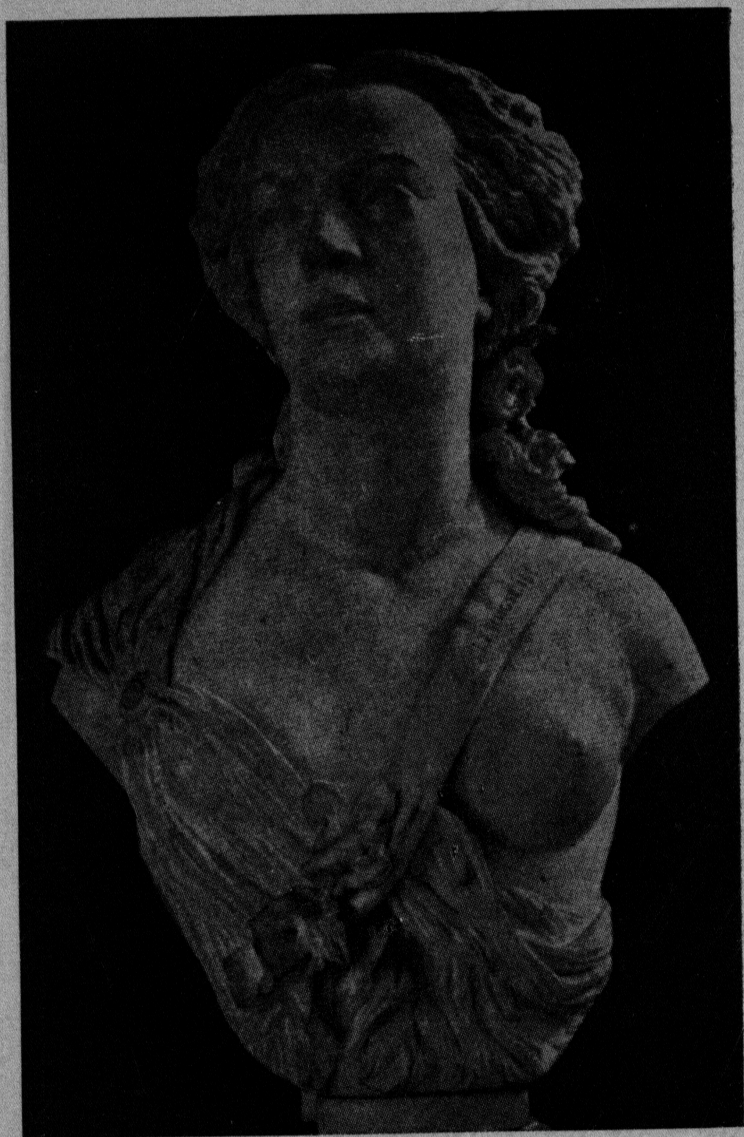
মাদাম সাবাতিয়ে

জা-বাতিস্ত ফেস্তঁাজের রচিত প্রস্তরমূর্তি

ভীষণ আকৃতি, যা একদা ছিলো এক সুন্দরী নারী, যেন অস্পষ্টভাবে মহাশূন্যে সন্ধান করছে মিলনের মধুর মুহূর্তটিকে, বা সেই গম্ভীর ঐশ্বরিক ক্ষণটিকে, যা মহাকালের অদৃশ্য ঘড়িতে অঙ্কিত হ'য়ে আছে। তার স্তন, কাল যা ভক্ষণ ক'রে নিয়েছে, চটুলভাবে লাফিয়ে উঠছে তার অন্তর্বাস থেকে, গ্রন্থি ছিঁড়ে শুকিয়ে-যাওয়া তোড়ার মতো, আর এই সমগ্র মৃত্যুময় কল্পনাটি দাঁড়িয়ে আছে এক সুপ্রচুর ক্রিনোলীনের ভিত্তির উপর।...'

মূর্তিটি এখন কোথায় আছে জানা যায় না।

১২ ১ 'দেবদাসী' : মূলে bayadere = দক্ষিণভারতীয় নর্তকী।

১২ ৪ আন্তিনুস (ফ Antinoüs ; ইং Antinous ; গ্রীক Antinoos) : রোমক সম্রাট হাদ্রিয়ানের প্রিয়পাত্র রূপবান যুবক। এঁর অনেক প্রস্তরমূর্তির এখনো অস্তিত্ব আছে।

১৩ ১ লাভিলেস (Lovelace : উচ্চারণ, লাভিলেস) : স্যামুয়েল রিচার্ডসনের *Clarissa Harlowe* উপন্যাসে এক লম্পট চরিত্র।

'এখনো ভুলিনি তাকে', 'মহাপ্রাণ সেই দাসী'

এই কবিতা দুটির বোদলেয়ার কোনো নামকরণ করেননি।

প্রথমটি যাঁর উদ্দেশে লেখা, তিনি কবির জীবনের প্রথম প্রেমাস্পদা— অর্থাৎ তাঁর মা। বালক বয়সে, যে-অল্প সময়টুকু বিধবা ও তরুণী মাতাকে একান্তভাবে নিজের কাছে পেয়েছিলেন, এই ক্ষুদ্র কবিতা তারই একটি স্মৃতিচিত্র। 'শিশুপ্রেমের সেই সবুজ স্বর্গ'কে বোদলেয়ার সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি।

'মহাপ্রাণ দাসী'টিও কাল্পনিক নয়, বোদলেয়ারের বালক বয়সে তিনি ছিলেন তাঁর ধাত্রী ও তাঁর মাতার পরিচারিকা, তাঁর নাম মারিয়েৎ। মারিয়েৎকে যিনি ঈর্ষা করেছিলেন, তিনি বোদলেয়ারের মা। বৈধব্যদশায় পুত্রের প্রতি তাঁরও ভালোবাসা ছিলো সর্বগ্রাসী। 'স্ফুলিঙ্গে' মারিয়েৎ-এর উল্লেখ আছে : 'আমার পিতা, মারিয়েৎ ও পো [ভগবানের কাছে আমার জন্য] মধ্যস্থতা করুন।' জ্বালাময় 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর মধ্যে এই কবিতা দুটির স্নিগ্ধতা বড়ো আশ্চর্য ব'লে বোধ হয়।

ন্যাকড়া-কুড়ুনির মদ

৭ ২ পাক্তলস (ফ Pactole ; ইং Pactolus ; গ্রীক Pactolos) : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নদী, যার বালু স্বর্ণরেণুতে অনুলিপ্ত।

খুনের মদ

এই কবিতার একটি গদ্য খশড়া বোদলেয়ারের পত্র থেকে উদ্ধৃত করি :

'দুষ্ক্রিয়াটির পটভূমি এই। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এটি রীতিমতো সুচিন্তিত। মিলনস্থলে প্রথম এলো পুরুষটি। সে-ই স্থানটি নির্বাচন করেছে। রবিবারের সন্ধ্যা। এক অন্ধকার পথ, অথবা খোলা প্রান্তর। দূরে নাচঘরের আওয়াজ। প্যারিসের কাছে একটি বিষণ্ণ, বৈরীভাবাপন্ন দেশ। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যথাসম্ভব করুণ একটি প্রণয়দৃশ্য। পুরুষ চায় ক্ষমা। সে চায় বাঁচতে, স্ত্রীর কাছে ফিরতে। তাকে এত সুন্দর আগে কখনো দ্যাখেনি।...দ্রব হ'লো সে, সত্য সেই দ্রবতা। আবার প্রায় প্রেমে প'ড়ে গেলো স্ত্রীর সঙ্গে। তাকে সে আকাঙ্ক্ষা করে, অনুনয় করে। স্ত্রীর কৃশতা ও মালিন্যে আরো উৎসুক হ'য়ে উঠলো সে, প্রায় উদ্দীপিত।...বেচারি স্ত্রীরও পুরোনো স্নেহ কিছুটা যেন ফিরে এলো, তবু এমন এক স্থলে স্বামীর পাশবিক আবেগে ধরা দিতে সে নারাজ। স্বামী তাতে বিরক্ত হ'য়ে ওঠে, এতে সে দেখতে পায় কোনো উপপতির অস্তিত্ব ও নিষেধাজ্ঞা। "ব্যাপারটা শেষ ক'রে দিতে হবে, কিন্তু আমি নিজে পারবো না, আমার সাহসে কুলোয় না।" '

এক শহীদ

এই 'অজ্ঞাতনামা শিল্পীর চিত্র' বিষয়ে আমি কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি।

পাতকিনী

মূল শিরোনামা : Femmes damnées। এই নামের আর-একটি দীর্ঘতর কবিতা 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ এর ঠিক আগেই মুদ্রিত আছে। তার আগের কবিতাটি Lesbos। তরুণ বয়সে বোদলেয়ার একবার ভেবেছিলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম দেবেন *Les Lesbiennes*; কিন্তু এই বিষয়টি, যা ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে তেমন প্রাধান্য পায়নি, উল্লিখিত তিনটিতে ছাড়া অন্য কোনো কবিতায় এর উল্লেখ নেই।

৩ ৪ সন্ত আন্তনি (খ্রি প ২৫১-৩৫৮) জন্মেছিলেন মিশরদেশে এক ধনীবংশে, কিন্তু খ্রিষ্টানুসরণে সন্ন্যাসী হ'য়ে দুর্গম গুহায় সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ যাপন করেন। বার-বার, এবং একবার নারীর মূর্তি ধ'রে,

শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিলো। এই 'প্রলোভন' খ্রিষ্টান শিল্পকলায় বহুবার চিত্রিত হয়েছে। ফ্লেমিশ শিল্পী হীরনিমস বস (Hieronymus Bosch, ১৪৬২ ? -১৫১৬) ও জ্যেষ্ঠ পিটার ব্র্যুগেল (Pieter Brueghel, আ ১৫২৫-৬৯)-এর চিত্র দুটি বিখ্যাত, প্রথমটির প্রভাব দ্বিতীয়টিতে তর্কাতীতভাবে উপস্থিত। ব্র্যুগেল-এর চিত্রটি দেখেই ফ্লোবেয়ার সন্ত আন্তনি বিষয়ে উপন্যাস (*La Tentation de Saint Antoine*) লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

উল্লিখিত চিত্র দুটি বোদলেয়ার দেখেছিলেন ব'লে মনে হয় না, অন্তত কোনোটির সঙ্গেই তাঁর বর্ণনার মিল নেই। বরং কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে ফ্লোবেয়ারের সঙ্গে, কিন্তু তা দৈবগত না প্রভাবনির্ভর তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। ফ্লোবেয়ার তিরিশ বছর ধ'রে তিন বার (১৮৪৯, ১৮৫৬, ১৮৭২) উপন্যাসটি লেখেন, পুস্তকটি প্রকাশিত হয় বোদলেয়ারের মৃত্যুর সাত বছর পরে। তবে দ্বিতীয় লেখনের কোনো-কোনো অংশ ১৮৫৬-৫৭-এ 'লার্তিস্ত' (*L' Artiste*) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; সে-সব অংশের সঙ্গে বোদলেয়ার পরিচিত ছিলেন ব'লে অনুমান করলে ভুল হয় না। কিন্তু এনিড স্টার্কি প্রমাণ করেছেন 'পাতকিনী'দের বিষয়ে তিনটি কবিতারই রচনাকাল ১৮৪৫ বা তার পূর্বে; অতএব ফ্লোবেয়ারের প্রভাবের সম্ভাবনাকে বর্জন করাই সংগত মনে হয়। তত্রাচ, 'নগ্ন দৃপ্ত স্তনভার' (Les seins nus et pourprés — নগ্ন ও বেগনিরঙের স্তন) ফ্লোবেয়ারকে মনে করিয়ে দেয়; কেননা উপন্যাসে আছে, সন্ত আন্তনির সামনে একবার এক তরুণীর মূর্তি দেখা দেয়, যাকে খ্রিষ্টভজনার অপরাধে নৃশংসভাবে কশাঘাত করা হচ্ছে; তরুণীটিকে সন্ন্যাসী হবার পূর্বে তিনি ভালোবেসেছিলেন। 'Pourpré' বিশেষণটি যেন সেই কশাহত, রক্তাক্ত স্তনের আভাস দিচ্ছে, কিংবা হয়তো ঐ বর্ণটি ইন্দ্রিয়বিলাসেরই অভিজ্ঞান।

বলা দরকার যে খ্রিষ্টান প্রবচনের সঙ্গে ফ্লোবেয়ারের উপন্যাসের মিল নেই; প্রবচন অনুসারে রমণীরূপী প্রলোভন মাত্র একবার এসেছিলো, ফ্লোবেয়ার সেটি বার-বার ঘটিয়েছেন।

দুই ভালো বোন

মারিও প্রাৎস দেখিয়েছেন, ভিক্তর উগোর বৃদ্ধ বয়সের একটি সনেটে এই কবিতার প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট। সেখানে মৃত্যু ও সৌন্দর্যকে দুই ভগ্নী

ব'লে কল্পনা করা হয়েছে, ভীষণতায় ও উর্বরতায় তারা সমকক্ষ, একই রহস্য ও গোপনতার তারা আধার। (*The Romantic Agony*, Mario Praz : Meridian Paperback, পৃ ৩১)

৪ ৩ পাশ্চাত্ত্য মানসে cypress শোকের প্রতীক, আর myrtle প্রেমের। সাইপ্রেস পাইনজাতীয় বৃক্ষ, পল্লব প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; য়োরোপীয় গোর-স্থানসমূহে এই উচ্চ ও গম্ভীর তরুশ্রেণী প্রায়ই লক্ষিত হয়। Myrtle ছোটো গাছ, টবেও জন্মানো যায়; এর শাদা বা গোলাপি ফুল প্রাচীন গ্রীক মতে আফ্রোদিতের প্রিয় ছিলো; খৃষ্টান শিল্পে তা মেরী-মাতার আনুষঙ্গিক। এই কবিতায় myrtle অবশ্য যৌনতার প্রতিনিধি।

রোমের প্রটেস্টাণ্ট কবরখানা কবিতাপ্রেমিকের একটি তীর্থস্থল; শেলি ও কীটসের স্মৃতিমণ্ডিত সেই আলয়ে সাইপ্রেস যেমন প্রচুর, মার্টল-এর ঝোপও তেমনি অসংখ্য। দান্নুন্‌ৎসিও তাঁর একটি উপন্যাসে এই গোরস্থানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : 'উল্লম্ব রেখায় আকাশের দিকে উঠে গেছে সাইপ্রেসের সারি, প্রায় স্তব্ধ, সূর্যের শেষ রশ্মিতে শুধু তাদের শীর্ষগুলি কম্পিত হচ্ছে। ···সেই প্রায়ান্ধকার ঘনতার মধ্য থেকে, শিলা থেকে স্বচ্ছ শীতল জলধারার মতো, নির্গত হচ্ছে এক আঁধার রহস্য, এক পবিত্র শান্তি, যেন মনুষ্যত্বের পরম মধুরতার মতো। ···উড়ে-চলা কোনো পাখির চীৎকারে মাঝে-মাঝে স্তব্ধতা ব্যাহত হচ্ছে।'

দৈবাৎ আমিও ঠিক সায়ংকালে এই গোরস্থানে গিয়ে পড়ে-ছিলাম; আর-একটি মানুষও ছিলো না তখন; সাইপ্রেসশ্রেণীর 'প্রায়ান্ধকার ঘনতার শান্তি' আমিও অনুভব করেছি।

বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনি রক্ষা করার জন্য কবিতায় 'মার্টেল' লিখতে হ'লো।

সিথেরায় যাত্রা

সিথেরা (ফ Cythère; ইং Cythera; গ্রীক Kuthera): ইয়নীয় দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম ক্ষুদ্র দ্বীপ; বর্তমান নাম চেরিগো (Cerigo)। দ্বীপটি বারো মাইল চওড়া, লম্বায় কুড়ি মাইল। কথিত আছে, এই দ্বীপের উপকূলেই দেবী আফ্রোদিতে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, তাই তাঁর নামান্তর সিথেরীয়া। প্রাচীন কালে এই দ্বীপ আফ্রোদিতের অর্চনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো; আজও শিল্পকলায় তা

রতিসুখের প্রতীক। ঠিক যে-স্থানটিতে দেবী উঠেছিলেন ব'লে প্রবাদ আছে তার আধুনিক নাম 'গ্রীক শিলা' (The Greek's Rock) সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটি ছোটো-বড়ো রুক্ষ শিলাখণ্ড প্রায় ভয়াবহভাবে উপস্থিত সেখানে, যেন সৃষ্টিকর্তা আগেই জানতেন যে বোদলেয়ারের এই কবিতাটি লেখা হবে। কিন্তু আফ্রোদিতের জন্মস্থল শুধুমাত্র মনোরম হ'লে সংগত হ'তো না।

আঁতোয়ান ওয়াতো (১৭৮৪-১৮২১), যাঁর শিল্পকে বোদলেয়ার 'মদনোৎসব' আখ্যা দেন, তাঁর প্রসিদ্ধতম চিত্রটি বস্তুতই মদনোৎসব। এই ছবিটিরও নাম 'সিথেরায় যাত্রা'। তরুশ্রেণীশোভিত বন্ধুর ও রমণীয় উপবনে বহু প্রণয়ীযুগল লীলাচঞ্চল; সামনের দিকে ডান কোণে দেবদূতসেবিত আফ্রোদিতের প্রস্তরমূর্তি; পটভূমিতে হ্রদ, হ্রদে এক সুসজ্জিত তরণী প্রস্তুত, যা একটু পরেই, এই সব যুগলদের নিয়ে, রতিরাজ্য সিথেরার দিকে যাত্রা করবে। সুখ, লাস্য ও নিষ্কণ্টক প্রমোদের একটি উজ্জ্বল রূপকথা এই ছবিটি।

এই চিত্র অবলম্বন ক'রেই নের্ভাল তাঁর 'সিলভী' উপন্যাসে 'সিথেরায় যাত্রা' নামক পরিচ্ছেদটি লেখেন: সেখানেও সবই সুখময়, উপরন্তু কিশোর প্রেমের সরলতায় বিগলিত। কিন্তু, প্রাচ্য য়োরোপে ভ্রমণকালে, সিথেরা দ্বীপ প্রত্যক্ষ ক'রে নের্ভাল তার যে-বর্ণনা লেখেন তা পুরোপুরি ওয়াতোর অনুগত নয়। তাঁর 'প্রাচ্য ভ্রমণ' (*Voyage en Orient*) নামক গ্রন্থের (গোতিয়ে-র মতে 'প্রেমে, আলোকে ও নীলিমায় পরিপূর্ণ একটি উপাস্য পুস্তক') একটি অংশ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য :

'যখন. সন্ত নিকোলো বন্দরে আশ্রয় নেবার আগে, আমাদের জাহাজ তীর ঘেঁষে চলেছে, স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে আমি হঠাৎ একটি ঊর্ধ্বগ আকৃতির অস্পষ্ট রেখা দেখতে পেলাম। দূর থেকে, শিলাশিখরে অবস্থিত সেই আকৃতিকে আমার মনে হ'লো কোনো রক্ষক-দেবতার মূর্তি। কিন্তু, জাহাজ যখন আরো কাছে এলো, আমি স্পষ্ট দেখলাম যে সেটি একটি ত্রিশাখাযুক্ত ফাঁসিকাষ্ঠ, মধ্যের শাখাটিতে মড়া ঝুলছে। জীবনে এই আমি প্রথম ফাঁসিকাঠ দেখলাম ··· আর এমনি ক'রেই আবিষ্কার করলাম যে ভেনাস তাঁর দ্বীপের রাজধানীতে নিজের কোনো চিহ্নমাত্র রাখেননি।'

এই কবিতা লেখার সময় বোদলেয়ার নের্ভালের মূল রচনাটি পড়েছিলেন কিনা, সে-বিষয়ে এনিড স্টার্কি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; তাঁর মতে কোনো-এক পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা প'ড়ে বোদলেয়ার উদ্‌বুদ্ধ হন। তবে, ফাঁসিকাঠের চিত্রকল্পটি যে নের্ভাল থেকে সংগৃহীত, সে-বিষয়ে সমালোচক-মহলে মতভেদ নেই। কিন্তু এই চিত্রকল্প যে-যন্ত্রণাকে ধারণ করছে তা অবশ্য একান্তভাবে বোদলেয়ারীয়। এটি তাঁর ভীষণতম কবিতার অন্যতম।

কবিতাটির রচনাকালে কবির উপদংশের প্রকোপ উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো।

ভ্রমণ

এই কবিতার পূর্বপুরুষ হাইনের 'বিমিনি' (Bimini); র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' এর সন্তান।

'বিমিনি' একটি দীর্ঘ আখ্যান-কবিতা, ব্যালাড-ছন্দে লেখা; 'শয্যা-কবর'স্থিত মুমূর্ষু হাইনের অন্যতম কৃতি। কবিতাটিতে স্তবকের সংখ্যা ১৬৬, পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ৬৬৪। স্পেনীয় নাবিক ও যোদ্ধা হুয়ান পন্থে দে লেঅন (Juan Ponce de Leon, ১৪৬০-১৫২১) এর নায়ক। ১৪৯৩ সালে কলম্বাস যখন দ্বিতীয়বার আটলান্টিক পাড়ি দেন, ইনি ছিলেন অন্যতম সহযাত্রী। আমেরিকায় পদার্পণ ক'রে কয়েক বছরের মধ্যে দেশকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে কাঞ্চন সংগ্রহ করেন। স্থানীয় 'ইণ্ডিয়ান'দের মধ্যে প্রবাদ ছিলো, বিমিনি নামে কোনো-এক দ্বীপে এক অলৌকিক নির্ঝরিণী আছে, তার জলে বৃদ্ধের যৌবন ফিরে আসে। সেই দ্বীপ আবিষ্কারের ভার পড়লো দে লেঅনের উপর। ১৫১৩, ৩রা মার্চ তারিখে পুয়ের্টো রিকো থেকে তাঁর জাহাজ ছাড়লো, ২রা এপ্রিলে যে-অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে পৌঁছলেন, আজকের দিনে তার নাম ফ্লরিডা। এর পরে বিমিনি আবিষ্কারের ভার তিনি অন্য এক নাবিকের উপর দিয়েছিলেন।

হাইনের কবিতায় দে লেঅনকে বৃদ্ধ বয়সে দেখা যাচ্ছে। বিত্ত তাঁর বিপুল, পদবি উচ্চ, কিন্তু জরা তাঁকে আক্রমণ করেছে। কিউবার সৈকতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের যৌবনের দিন স্মরণ করছেন। বলছেন, 'দিয়ে দিতে পারি ধনরত্ন, রাজি আছি মূর্খ ও দীন হ'তে— যদি ফিরে পাই যৌবন।' রাত্রে, জাহাজের দোলায় শুয়ে ঘুমোন;

কাকা নামে এক স্থানীয় প্রাচীনা পাখা নেড়ে মশা তাড়ায়, আর গুন-গুন গান করে। গান গায় বিমিনির, সেই আশ্চর্য দেশ, যার ঝর্নার জলে চিরযৌবনের রহস্য লুকিয়ে আছে। এই গানে উদ্দীপিত হলেন বৃদ্ধ দে লেঅন; এক প্রভাতে বিমিনির উদ্দেশে তরণী ভাসালেন। সঙ্গে আশিজন পুরুষ, আর একজনমাত্র নারী। রমণীটি কাকা, প্রভুর অনুগ্রহে স্পেনীয় সেনিয়রার পদবিতে উন্নীত। জাহাজ চলেছে যৌবনের সন্ধানে, এদিকে দিনে-দিনে আরো বৃদ্ধ হচ্ছেন দে লেঅন, আরো কৃশ ও লোলচর্ম, আরো ব্যাধিগ্রস্ত। অবশেষে এলেন সেই আশ্চর্য ও নিঃশব্দ দেশে, সাইপ্রেসে ছায়াচ্ছন্ন, যেখানে এক আরোগ্য-ময় কালো জলধারা ব'য়ে চলেছে। লিথি সেই নদীর নাম, তার জল পান করামাত্র সব দুঃখ বিস্মৃত হ'তে হয়। আর তাকে একবার খুঁজে পেলে কেউ আর ছেড়ে যায় না, কেননা সেই দেশই একমাত্র ও সত্য বিমিনি।

হাইনে কবিতাটি শেষ করেছেন মৃত্যুতে, বোদলেয়ার মৃত্যুকেই তরণীর কাণ্ডারী ক'রে দিয়েছেন। দুটি কবিতায় রচনার অংশেও সাদৃশ্য নির্ভুল। হাইনের 'মুখবন্ধে'র প্রথম কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করছি:

অলৌকিকে বিশ্বাস!— লুপ্ত নীল ফুল
আজ আর নেই, কিন্তু কী উজ্জ্বল ছিলো
যখন বিকশিত হ'তো মানবহৃদয়ে—
সেই দিনের গান গাই আমি!

বিস্ময় ছিলো সেই যুগ নিজেই
যেহেতু বিস্ময়ে বিশ্বাসী ছিলো:
অনেক-কিছুই এমন আশ্চর্য
যে শেষটায় আর অবাক হ'তো না কেউ।

...

এলো এক নববধূর মতো সুন্দরী ভোর,
সমুদ্রে জন্ম নিলো এক বিস্ময়,
নীল সাগরের তরঙ্গ থেকে
উঠে এলো এক স্বপ্নাতীত নতুন পৃথিবী।

নতুন জগৎ, তার মানুষও নতুন,
নতুন পশু আর পুষ্প,

পাখি নতুন, নতুন বৃক্ষেরা,
ব্যাধিরাও নতুন ও অসংখ্য।

আর ইতিমধ্যে আমাদের পুরোনো জগৎ
সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হ'লো,
আর চেনাই যায় না
এমন অলৌকিক সেই পরিবর্তন।

(ইংরেজি অনুবাদ থেকে; অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত।)

বর্ণনার প্রাচুর্যে ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যরাশিতে হাইনের কবিতার ক্ষতি হয়েছে; বোদলেয়ার, প্রস্তর থেকে মূর্তির মতো, নিছক কবিতাটিকে ছেঁকে তুলেছেন।

এই কবিতা, বোদলেয়ারের 'এক মাথা চুল' ও আরো অনেক কবিতার মতো, কবির প্রাচ্য ভ্রমণের স্মৃতিতে ভরপুর।

৩ ৪ কির্কী (ফ Circe; ইং Circe; গ্রীক Kirkē): হোমারে প্রখ্যাত মায়াবিনী; ইনি অদিসেয়ুস-এর সঙ্গীদের শূকরে রূপান্তরিত ক'রে, তাঁকে নিজের কাছে সংবৎসরকাল বন্দী রাখেন।

৯ ১ ইকারী (ফ Icarie; ইং Icaria; আধুনিক গ্রীক ভাষায় Nikaria): এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাশি সোশ্যালিস্ট এতিয়েন কাবে (Etienne Cabet) প্রণীত *Voyage en Icarie* গ্রন্থটি সমগ্র প্রতীচীতে প্রসিদ্ধ ছিলো; তাতে লেখক তাঁর কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রকে ইকারী দ্বীপে স্থাপন করেছিলেন।

১০ ২ এলদোরাদো (Eldorado, El Dorado = সোনালি [স্প্যানিশ]) বিমিনির মতো আর-একটি 'পশ্চিম ভারতীয়' প্রবচন। আমেরিকার আদিবাসীরা বিশ্বাস করতো, নিকটবর্তী কোনো-এক দেশের অধিবাসীরা স্বর্ণময়। আগন্তুক শ্বেতাঙ্গরাও তা অবিশ্বাস করেনি; এলদোরাদোর সন্ধান করেছেন দক্ষিণ আমেরিকার বহু স্পেনীয় বিজেতা, ১৫৯৫ সালে স্যর ওঅল্টর রলে; সমকালীন মানচিত্রেও তা স্থান পেয়েছে। বর্তমান য়োরোপীয় ভাষাসমূহে 'এলদোরাদো'র অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সব-পেয়েছির দেশ'।

১২ ৩ কাপুয়া (ফ Capone; ইং Capua; ইটালিয়ান Capua):

দক্ষিণ ইটালির শহর, বর্তমানে নগণ্য, কিন্তু রোমক আমলে কাম্পানিয়া প্রদেশের প্রধান নগর রূপে ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিলো।

৩৪ ১ পিলাদেস (Pylades): গ্রীক পুরাণে অরেস্তেস-এর বন্ধু। অরেস্তেস যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে ভগিনী এলেক্‌ত্রাকে উদ্ধার করেন, পিলাদেস ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। মৃতের দেশে পিলাদেস বন্ধুতার প্রতীক, আর এলেক্‌ত্রা কমনীয় নারীত্বের।

মাক্সিম দ্যু কাঁ (Maxime du Camp, ১৮২২-৯৪): বোদলেয়ারের বন্ধু ও সাহিত্যিক। এঁর আত্মকথায় বোদলেয়ার বিষয়ে বহু উল্লেখ আছে।

কালপঞ্জি

১৭৭৪ : গ্যেটের 'তরুণ হ্বের্টেরের দুঃখ'।

১৭৭৫ : দক্ষিণ মেরুসাগরে ভ্রমণের পর জেমস কুক-এর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন। মঁতেসকিউ-র মৃত্যু।

১৭৭৬ : আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণা। অ্যাডাম স্মিথ 'ওয়েলথ অব নেশন্স' প্রকাশ করলেন।

১৭৭৬-৭৮ : গিবন প্রণীত 'রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন'।

১৭৭৮ : রুসোর মৃত্যু। ভলতেয়ারের মৃত্যু। স্যর জশুয়া রেনল্ডস-এর 'ডিসকোর্সেস'।

১৭৮১ : শিলারের 'দস্যু'। লেসিং-এর মৃত্যু।

১৭৮১-৮৮ : রুসোর 'কনফেশন্স' প্রকাশিত হ'লো।

১৭৮৪ : দেনিস দিদেরোর মৃত্যু।

১৭৮৬ : আমেরিকায় পটোমাক নদীতে প্রথম বাষ্পচালিত জলযান। রবার্ট বার্নস-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'কিলমার্নক'।

১৭৮৭ : মোৎসার্ট-এর 'ডন জোভান্নি'। ব্লেক-এর 'সংস অব ইনোসেন্স'। শিলারের 'ডন কার্লস'।

১৭৮৮ : গইয়া বধির হলেন। বায়রনের জন্ম। শোপেনহাওয়ারের জন্ম।

১৭৮৯ : ফরাশি বিপ্লব। জেরামি বেন্টাম 'নীতি ও আইনবিধির মূলসূত্র' প্রকাশ করলেন।

১৭৯০ : জর্মান 'ষ্টুর্ম উন্ট ড্রাং'-এর অবসান।

১৭৯১ : দ্য সাদ-এর 'জ্যুস্তিন : বা পুণ্যের পরাজয়'।

১৭৯২ : শেলির জন্ম।

১৭৯৪ : মিসেস র‍্যাডক্লিফ-এর 'উডলফো-রহস্য'। শিলার ও গ্যেটের বন্ধুতার সূত্রপাত। ব্লেক-এর 'সংস অব এক্সপীরিয়েন্স'।

১৭৯৫ : শিলার 'সহজ ও সহৃদয় কবিতা' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। কীটসের জন্ম।

১৭৯৬ : ম্যাথু গ্রেগরি ল্যুইস-এর 'দি মাঙ্ক'।

১৭৯৭ : ওঅর্ডস্বার্থ ও কোলরিজের বন্ধুতার আরম্ভ। হাইনের জন্ম।

১৭৯৭-১৮১০ : শ্লেগেল-কৃত শেক্সপিয়রের জর্মান অনুবাদ।

১৭৯৮ : 'দি লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'। শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয়-সম্পাদিত, জর্মান রোমান্টিকতার মুখপত্র, 'ডাস আথেনীয়ুম' পত্রিকার প্রকাশ। ম্যালথাসের লোকসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা।

১৭৯৯ : পুশকিনের জন্ম। বালজাকের জন্ম। ফ্রীডরিখ ফন শ্লেগেল প্রণীত 'লুসিণ্ডে'। জ্যোতির্বিজ্ঞানে লাপ্লাস-এর গবেষণার প্রকাশ আরম্ভ।

১৮০০ : নোভালিস-এর 'রাত্রির স্তব'। বেটোফেনের বধিরতার আরম্ভ।

১৮০১ : শাতোব্রিয়াঁর 'আতালা'। নোভালিস-এর মৃত্যু। কার্ল ফ্রীডরিখ গাউস্‌-এর 'গাণিতিক নিবন্ধ'।

১৮০২ : শাতোব্রিয়াঁর 'রেনে'। গইয়ার 'সবসনা' ও 'বিবসনা' (আ ১৮০২)। উগোর জন্ম। স্কটের কবিতা প্রকাশ আরম্ভ।

১৮০৩ : ক্লপষ্টক-এর মৃত্যু। হের্ডারের মৃত্যু।

১৮০৪ নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হলেন। কাণ্ট-এর মৃত্যু।

১৮০৫ শিলারের মৃত্যু।

১৮০৭ হেগেল-এর 'ফেনমেনলজি অব দি স্পিরিট'।

১৮০৮ গ্যেটের ফাউস্ট, প্রথম খণ্ড। জেরার দ্য নের্ভাল-এর জন্ম।

১৮০৯ গোগোলের জন্ম। শ্লেগেলের নাট্যকলা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৮১০ সোয়েডেনবর্গ-এর রচনাবলি ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশের জন্য সমিতি-গঠন। দ্য ম্যুসের জন্ম।

১৮১১ : তেয়োফিল গোতিয়ে-র জন্ম। হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট আত্মহত্যা করলেন।

১৮১২ : গ্রিম্‌-ভ্রাতৃদ্বয়ের 'রূপকথা'। বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড'। ডিকেন্স-এর জন্ম। নেপোলিয়নের রুশ অভিযান।

১৮১৩ : হ্বাগনার-এর জন্ম। জেইন অস্টেন-এর 'অহংকার ও সংস্কার'। মাদাম দ্য স্তায়েল-এর জর্মানি বিষয়ক পুস্তকের প্রকাশ।

১৮১৪ : নেপোলিয়ন এল্‌বায় নির্বাসিত। ওঅল্টর স্কটের 'ওয়েভার্লি', তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। লের্মণ্টভের জন্ম।

১৮১৪-১৫ : গইয়ার 'তেসরা মে, ১৮০৮'।

১৮১৫ : ফেব্রুয়ারি : নেপোলিয়ন এল্‌বা থেকে পলায়ন ক'রে ফ্রান্সে এলেন। জুন : ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।

১৮১৭ : বায়রনের 'ম্যানফ্রেড'; কীটসের 'পোএমস'; কোলরিজের 'বায়োগ্রাফিয়া লিটরেরিয়া'।

১৮১৮ : টুর্গেনিভের জন্ম। কার্ল মার্ক্সের জন্ম। কীটসের 'এণ্ডিমিয়ন'। মেরি শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'।

১৮১৯ : শোপেনহাওয়ার তাঁর 'বাসনারূপী ও ধারণারূপী জগৎ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। বেটোফেন সম্পূর্ণরূপে বধির। ওঅল্ট হুইটম্যানের জন্ম। বায়রনের 'ডন জুয়ান'-এর প্রকাশ আরম্ভ।

১৮২০ : লামার্তীন-এর 'ধ্যানের কবিতা'। শেলির 'মুক্ত প্রমিথিউস'।

১৮২০-৩০ : পুশকিন, বায়রনের প্রভাবে, আধুনিক রুশ সাহিত্যের জন্ম দিলেন।

১৮২১ : প্যারিসে শার্ল বোদলেয়ার, মস্কোতে ডস্টয়েভস্কির জন্ম। আট বছরের বালক হ্বাগনার, লাইপৎসিক-এ বেটোফেনের সংগীত শুনে স্থির করলেন, তিনিও গীতকার হবেন। ডি কুইন্সির 'আফিমখোরের আত্মকথা'। জন কনস্টেবল-এর 'হ্যামস্টেড হীথ'। কীটসের মৃত্যু। ফ্রান্সের রুয়ঁ নগরে গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার-এর জন্ম। সেণ্ট এলেনায় নির্বাসনে নেপোলিয়নের মৃত্যু।

১৮২২ : শেলির মৃত্যু। ই. টি. এ. হোফমান্-এর মৃত্যু। স্তাঁদাল-এর 'দ্য লামুর' ('প্রণয়')।

১৮২৩-৩১ : পুশকিনের 'ইউজেনে ওনেগিন'।

১৮২৪ : বায়রনের মৃত্যু। গইয়া দেশত্যাগ ক'রে ফ্রান্সে এলেন। কনস্টেবল-এর ল্যাণ্ডস্কেপ প্যারিসে প্রদর্শিত হ'লো।

১৮২৫ : প্লাটেন-এর 'ভেনিসের প্রতি সনেট'। রাশিয়ায় ডিসেম্বর-বিপ্লব।

১৮২৫-৩৩ : শ্লেগেল ও টীক-কৃত শেক্সপিয়রের জর্মান অনুবাদ।

১৮২৬ : দ্য ভিন্‌ঈ-র 'প্রাচীন ও আধুনিক কবিতা'। ইংলণ্ডের খনিতে জর্জ স্টিভেনসন-এর বাষ্পচালিত রেলগাড়ি। হোল্ডার্লিনের কবিতা প্রকাশ।

১৮২৭ : হাইনের 'গানের বই' (ওঅল্টর স্কট কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত)। উগোর 'ক্রমওয়েলের ভূমিকা'। ফ্রান্সে রোমাণ্টিকতার উত্থান। ব্লেকের মৃত্যু।

১৮২৮ : ফ্রান্সের বর্দো শহরে ৮২ বছর বয়সে গইয়ার মৃত্যু। নের্ভাল-কৃত 'ফাউস্ট' প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। টলস্টয়ের জন্ম।

১৮৩০ : ফ্রান্সে জুলাই-বিপ্লব; 'এর্নানি'র যুদ্ধ; রোমাণ্টিকতার জয়। ওগ্যুস্ত কঁৎ প্রত্যক্ষবাদের ভিত্তিস্থাপন করলেন। ইংলণ্ডে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি; এঞ্জিনের নাম 'রকেট'। স্তাঁদালের 'লাল ও কালো'।

১৮৩১ : দেশত্যাগী হাইনে প্যারিসে। অনরে দোমিয়ে, রাজনৈতিক ও সামাজিক

ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে শুরু ক'রে, ছ-মাসের জন্য কারারুদ্ধ। জর্জ সাঁ, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে, সাহিত্যিকবৃত্তি গ্রহণ করলেন। উগোর 'নোৎর দাম দ্য পারী'। হেগেলের মৃত্যু।

১৮৩১-৩২ : গোগোল, হোফমান্-এর প্রেরণায়, তাঁর প্রথম গল্পসমূহ প্রকাশ করলেন।

১৮৩২ : গ্যেটের মৃত্যু। প্যারিসে কলেরা। এদুয়ার মানে-র জন্ম। ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল গৃহীত। টেনিসনের 'পোএমস'। স্কটের মৃত্যু।

১৮৩৩ : ব্রাউনিঙের 'পলীন'। দ্য ম্যুসে ও জর্জ সাঁ-র প্রণয়।

১৮৩৪ : কোলরিজের মৃত্যু। দেগা-র জন্ম। দ্য ম্যুসে ও জর্জ সাঁ-র বিচ্ছেদ।

১৮৩৪-৫৫ : কোপেনহাগেনে কীর্কেগর-এর রচনাবলি প্রকাশ।

১৮৩৫ : বালজাকের 'পিতা গরিও'। হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেনের 'রূপকথা', প্রথম খণ্ড। গোতিয়ে-র 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপাাঁ'; কলাকৈবল্যের ঘোষণা।

১৮৩৫-৪০ : দ্য ম্যুসে-র কাব্য, 'রাত্রিরা', ও গদ্যগ্রন্থ, 'শতাব্দীর সন্তানের আত্মকথা'।

১৮৩৭ : ডুয়েলে পুশকিনের মৃত্যু। লেওপার্দির মৃত্যু। 'দি পিকউইক পেপার্স'-এর প্রকাশ। সুইনবার্নের জন্ম। লের্মণ্টভের 'কবির মৃত্যু'।

১৮৩৭-৪৭ : শপ্যাঁ ও জর্জ সাঁ-র সহবাস। শপ্যাঁর প্রধান রচনাবলি।

১৮৩৮-৪১ : হ্বাগনার, দারিদ্র্যে ও নৈরাশ্যে তিন বছর প্যারিসে কাটিয়ে, ১৮৪১-এ ড্রেসডেনে ফিরে গেলেন।

১৮৩৯ : সেজ়ান-এর জন্ম। ফ্যারাডের 'বিদ্যুৎ-বিষয়ক গবেষণা'র প্রকাশ আরম্ভ।

১৮৪০ : লের্মণ্টভের 'এ-যুগের বীর'। এমিল জোলার জন্ম।

১৮৪১ : ডুয়েলে লের্মণ্টভের মৃত্যু।

১৮৪২ : মালার্মের জন্ম। গোগোলের 'ওভারকোট' ও 'মৃত আত্মা' (প্রথম খণ্ড)। স্তাঁদালের মৃত্যু।

১৮৪৩ : হোল্ডার্লিন, ৩৬ বছর উন্মাদ অবস্থায় জীবিত থাকার পর, ৭২ বছর বয়সে ট্যুবিঙ্গেন শহরে মারা গেলেন।

১৮৪৪ : নীটশের জন্ম। ভের্লেন-এর জন্ম। পিতা দ্যুমা-র 'থ্রী মাস্কেটীয়র্স'। দ্যলাক্রোয়ার 'সার্দানাপেলাস-এর মৃত্যু'। আমেরিকায় এস. এফ. বি. মর্স বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নির্মাণ করলেন।

১৮৪৫ : এডগার অ্যালেন পো-র গল্প ও কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লো। হ্বাগনার 'টানহয়জার' রচনা করলেন।

১৮৪৬ : ডস্টয়েভস্কির 'দুই আমি' (*The Double*)।

১৮৪৭ : শার্লট ব্রন্টির 'জেইন আয়ার'। এমিলি ব্রন্টির 'উদারিং হাইটস'। নের্ভাল উন্মাদরোগে আক্রান্ত। হাইনের 'আট্টা ট্রল্'।

১৮৪৮ : ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব। বুর্জোয়া-রাজা লুই-ফিলিপের পদত্যাগের পর লামার্তীন ও লাফায়েৎ-কর্তৃক গবর্মেণ্ট গঠন। হাইনে, দাঙ্গার সময় প্যারিসের পথে তাড়িত হ'য়ে, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। ডি. জি. রসেটি 'প্রির‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড' স্থাপন করলেন। থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার'।

১৮৪৮–৫১ : ফ্রান্সে দ্বিতীয় রিপাব্লিক।

১৮৪৯ : মদে, দারিদ্র্যে, ৪০ বছর বয়সে, পো-র মৃত্যু।

১৮৪৯-৭২ : ফ্লোবেয়ার 'সেণ্ট অ্যাণ্টনির প্রলোভন'-এর তিনটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ পাঠ রচনা করলেন।

১৮৫০ : ইংলণ্ডে যন্ত্র-বিপ্লব সম্পূর্ণ। হ্বাগনার-এর 'লোহেনগ্রিন'। বালজাক-এর মৃত্যু; তাঁর প্রণীত পুস্তকের সংখ্যা আশির ঊর্ধ্বে। ওঅর্ডস্বার্থের মৃত্যু। ডিকেন্স-এর 'ডেভিড কপারফীল্ড'। আধুনিক ফোটোগ্রাফির প্রচলন।

১৮৫১ : লণ্ডনে মহাপ্রদর্শনীতে স্ফটিক-প্রাসাদ। লিভিংস্টোন-এর জাম্বেজি নদী আবিষ্কার। মেলভিল-এর 'মোবি ডিক'। নের্ভাল দ্বিতীয়বার উন্মাদ; তাঁর 'প্রাচ্য ভ্রমণ' প্রকাশিত হ'লো।

১৮৫২ : ফ্রান্সে দ্বিতীয় রিপাব্লিক-এর পতন। লুই নেপোলিয়ন, তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে, ফ্রান্সের সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত। (তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে বাস্তুশিল্পী জর্জ উজীন ওসমান প্যারিস নগরের রূপান্তর ঘটালেন।) গোতিয়ে-র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। থেওডোর ষ্টর্ম-এর 'ইমমেনজে' ('মৌমাছি-হ্রদ')। হতাশজনিত অর্ধোন্মাদ অবস্থায় গোগোলের মৃত্যু।

১৮৫৩ : নের্ভাল তৃতীয়বার উন্মাদ; তাঁর কাব্যগ্রন্থ, 'ল্য শীমের' ('অলৌকিক') প্রকাশিত হ'লো। স্যর রিচার্ড বার্টন, আফগান মুসাফিরের ছদ্মবেশে, মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করলেন। শ্লেগেল-টীক-এর শেক্সপিয়র অনুবাদ সম্পূর্ণ। লেকঁৎ দ্য লিল-এর 'প্রাচীন কবিতা'।

১৮৫৪ : র‍্যাঁবোর জন্ম। নের্ভাল-এর গল্পগ্রন্থ 'বহ্নিদুহিতা'; নের্ভাল চতুর্থবার উন্মাদ।

১৮৫৪-৫৫ : কুর্বে-র 'শিল্পীর স্টুডিও'। (এই চিত্রের দক্ষিণ কোণে পাঠরত বোদলেয়ারকে দেখা যাচ্ছে।) চিত্রকলায় কুর্বে-র বাস্তবতার চরম ক্ষণ আসন্ন।

১৮৫৫ : হুইটম্যানের 'লীভস অব গ্রাস' প্রকাশিত হ'লো (বারোটি কবিতা)। নের্ভাল এক শস্তা সরাইখানায় গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন।

১৮৫৬ : প্যারিসে, আট বছর শয্যাশৃঙ্খলিত জীবনের পর, হাইনের মৃত্যু। জ়িগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর জন্ম। বর্নার্ড শ-র জন্ম।

১৮৫৭ : বোদলেয়ার 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও ফ্লোবেয়ার 'মাদাম বভারি' প্রকাশ করলেন। ডারুইনের 'দি অরিজিন অব দি স্পীশিজ়'। ভের্লেন, তাঁর বয়স ১৩, বোদলেয়ারকে আবিষ্কার করলেন। দ্য মুসে-র মৃত্যু।

১৮৫৯ : উগোর 'শতাব্দীর কাহিনী'। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'স্বাধীনতা বিষয়ক প্রবন্ধ'। জর্জ এলিয়টের 'অ্যাডাম বীড'। ফীটজ়জেরাল্ডের ওমর খৈয়াম।

১৮৬০ : শোপেনহাওয়ারের মৃত্যু। জ়্যুল লাফর্গের জন্ম। চেখভের জন্ম। বুর্কহার্ড্ট্-এর 'ইতালীয় রেনেসাঁসের সংস্কৃতি'।

আ ১৮৬০ : মানে, মনে, সেজ়ান, দেগা, পিসারো, রেনোয়ার ও সিস্‌লি প্যারিসে একত্র হলেন।

১৮৬১ : রাশিয়ার জার 'সার্ফ'দের মুক্তি দিলেন।

১৮৬১-৬৫ : আমেরিকায় অন্তর্যুদ্ধ।

১৮৬২ : টুর্গেনিভের 'পিতা ও পুত্র'। মালার্মের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তুরদৃষ্ট'। প্যারিসে, মাদাম দেসোয়ে নামে এক মহিলা প্রাচ্য (প্রধানত জাপানি) শিল্পদ্রব্যের দোকান খুললেন। ফরাশি চিত্রকলায় ইমপ্রেশানিজ়ম-এর আরম্ভ।

১৮৬২-৬৪ : মালার্মে, পো-র ভাষা শেখার জন্য, ইংলণ্ডে।

১৮৬৩, ১লা জানুয়ারি : এব্রাহাম লিঙ্কন-এর 'মুক্তির ঘোষণা'। আমেরিকায় দাসপ্রথার উচ্ছেদের আরম্ভ। দান্নুন্‌ৎসিওর জন্ম।

১৮৬৩-১৯০৫ : জ়্যুল ভের্ন-এর 'বৈজ্ঞানিক' উপন্যাস-পর্যায়।

১৮৬৪ : ডস্টয়েভস্কির 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'। ইপলিৎ তেন-এর 'ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস'।

১৮৬৫ : ইয়েটস-এর জন্ম। লুইস ক্যারল-এর 'অ্যালিস ইন ওআণ্ডার্ল্যাণ্ড'।

মানে-র 'অলিম্পিয়া' বহুনিন্দিত। (এই দশকে মানে ও তাঁর গোষ্ঠীকে সবলে সমর্থন করলেন এমিল জোলা।) মালার্মের 'ফনের অপরাহ্ণে'র প্রথম লেখন। হ্বাগনার-এর 'ট্রিস্টান ও ইজোল্ডে'।

১৮৬৫-৬৯ : 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'।

১৮৬৬ : 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। সুইনবার্নের 'পোএমস অ্যাণ্ড ব্যালাডস', প্রথম পর্যায়। ভের্লেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শনিতে-পাওয়া কবিতা'। বংশগতি বিষয়ে মেণ্ডেল-এর গবেষণা প্রকাশ। 'ল্য পার্নাস কঁতেঁপরেন', প্রথম খণ্ড।

১৮৬৭ : মানে-র 'মাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুদণ্ড'। কার্ল মার্ক্স 'ডাস কাপিটাল' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশ করলেন। টুর্গেনিভের 'ধোঁয়া'। বোদলেয়ারের মৃত্যু।

১৮৬৮ : লোত্রেয়ামঁ-র 'মালদরর-এর গান' রচনা শেষ। (১৮৭০-এ কবির মৃত্যুর আগে মাত্র এক সর্গ প্রকাশিত হয়।) ষ্টেফান গেঅর্গের জন্ম।

১৮৬৮-৬৯ : ডস্টয়েভস্কির 'দি ইডিয়ট'।

১৮৬৯ : মালার্মের 'এরদিয়াদ'। ফ্লোবেয়ারের 'হার্দ্য শিক্ষা'। সুয়েজ খাল খনন সম্পূর্ণ। 'ল্য পার্নাস কঁতেঁপরেন', দ্বিতীয় খণ্ড। আঁদ্রে জীদের জন্ম।

১৮৭০ : ডিকেন্সের মৃত্যু। ডি. জি. রসেটির 'পোএমস'।

১৮৭০-৭১ : ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ; প্যারিস কম্যুন; ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান। র‍্যাঁবো প্যারিসে; শার্লভিলে ফিরে ভের্লেনকে তাঁর কবিতা পাঠালেন, তার মধ্যে 'মাতাল তরণী'।

১৮৭০-৮০ : ইমপ্রেশনিজম-এর পূর্ণবিকাশ।

১৮৭১ : তিয়ের্স-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সে তৃতীয় রিপাব্লিক স্থাপন। মে মাসে র‍্যাঁবো দুটি পত্রে লিখলেন: 'ইন্দ্রিয়সমূহের সচেতন বিশৃঙ্খলাসাধনই কবিকর্ম ···কবিকে দ্রষ্টা হ'তে হবে···প্রথম দ্রষ্টা বোদলেয়ার।···' এই বছরেই র‍্যাঁবো আবার প্যারিসে, এবার ভের্লেনের অতিথি। দুই অসমবয়সী কবি প্রথমে বেলজিয়মে, পরে ইংলণ্ডে। র‍্যাঁবো 'দীপালি'র প্রথম কুড়িটি কবিতা লিখলেন। পল ভালেরির জন্ম। মার্সেল প্রুস্ত-এর জন্ম।

১৮৭১-৭২ : ডস্টয়েভস্কির 'দি ডেভিলস' (গার্নেটের অনুবাদ : *The Possessed*)।

১৮৭১-৯০ : গেঅর্গ ব্রাণ্ডেস-এর 'উনিশ শতকী সাহিত্যের মূল ধারা'।

১৮৭১-৯৩ : জোলার রুগঁ-মাকার উপন্যাস-পর্যায়।

১৮৭২ : নীটশের 'ট্র্যাজেডির জন্ম'। গোতিয়ে-র মৃত্যু।

১৮৭৩ : ওঅল্টর পেটারের 'স্টাডিজ ইন দি রেনেসাঁস'; ফরাশি প্রভাব ইংলণ্ডে পৌঁছলো। র‍্যাঁবো, ভের্লেনকে ত্যাগ ক'রে, 'নরকে এক ঋতু' শেষ করলেন। ব্রাসেলসে দুই বন্ধুর পুনর্মিলন। ভের্লেন গুলি করলেন র‍্যাঁবোকে, কব্জিতে লাগলো। ভের্লেনের দু-বছরের জেল। র‍্যাঁবোর কবিজীবনের অবসান। ত্রিস্তান কর্বিয়ের 'হলদে প্রেম' প্রকাশ করলেন। মাদাম ব্লাভাটস্কি কর্তৃক ন্যু য়র্কে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন।

১৮৭৪ : প্যারিসে প্রথম 'ইমপ্রেশনিস্ট' প্রদর্শনী। (এই প্রদর্শনীতে মানে-র কোনো চিত্র ছিলো না।) র‍্যাঁবোর সংসর্গকালে রচিত ভের্লেনের কবিতাগুচ্ছ 'না-বলা রোমান্স' নামে প্রকাশিত হ'লো। গোতিয়ে-র 'রোমান্টিকতার ইতিহাস'। জেমস টমসন-এর 'দি সিটি অব দি ড্রেডফুল নাইট'। হোফমানষ্টাল-এর জন্ম।

১৮৭৫ : রিলকের জন্ম। টোমাস মান্-এর জন্ম।

১৮৭৫-৭৭ : 'আনা কারেনিনা'।

১৮৭৬ : রেনোয়ার-এর 'মূল্যাঁ দ্য লা গালেৎ'। দেগা-র 'নর্তকী' পর্যায়ের আরম্ভ। এডিসনের প্রথম গ্রামোফোন। 'ফনের অপরাহ্ণ' : দ্বিতীয় লেখন।

১৮৭৬-৭৭ : বস্টনে গ্রেহাম বেল তাঁর আবিষ্কৃত টেলিফোনের পেটেন্ট নিলেন।

১৮৭৬-৭৮ : মনে-র 'সাঁ লাজার স্টেশন' চিত্রাবলি।

১৮৭৭ : লণ্ডনে হুইসলার-রাস্কিনের মামলা; হুইসলার এক ফার্দিং ক্ষতিপূরণ পেলেন। 'ল্য পার্নাস কঁতেঁপরেন', তৃতীয় ও শেষ খণ্ড।

১৮৭৮ : এডিসন কর্তৃক বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবন।

১৮৭৯ : ইবসেনের 'পুতুলের ঘর'। সুইনবার্ন, ওঅট্‌স-ডান্টন-এর তত্ত্বাবধানে, পাট্‌নিতে প্রোথিত। আইনস্টাইন-এর জন্ম।

১৮৭৯-৮০ : 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ'।

১৮৮০ : রদাঁর 'ভাবুক', 'নরকের দ্বার'। ফ্লোবেয়ার-এর মৃত্যু। আলেকজাণ্ডার ব্লক-এর জন্ম।

১৮৮০-৮৪ : দেগা-র 'ধোপানি' চিত্রপর্যায়।

১৮৮০-৯০ : গী দ্য মোপাসাঁর গল্পপর্যায়।

১৮৮১ : মোপাসাঁর সম্পাদনায় ফ্লোবেয়ার-এর অসমাপ্ত উপন্যাস 'বুভার ও পেকৃশে'র প্রকাশ। ডস্টয়েভস্কির মৃত্যু।

১৮৮১-৮৬ : জ্যুল লাফর্গ ফরাশি কবিতায় মুক্ত ছন্দ প্রবর্তন করলেন।

১৮৮২ : জেমস জয়স-এর জন্ম।

১৮৮২-৮৩ : রবার্ট কক যক্ষ্মা ও কলেরা বীজাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন।

১৮৮৩ : এডুয়ার মানে-র মৃত্যু। টুর্গেনিভের মৃত্যু। ফ্রান্‌ৎস কাফকার জন্ম।

১৮৮৩-৯২ : নীটশের 'জরথুস্ত্র'।

১৮৮৪ : জরিস কার্ল উইসমান্স-এর 'আ রেবুর'। ভের্লেনের 'কাব্যকলা' ও 'অভিশপ্ত কবিরা'। ইবসেনের 'বুনো হাঁস'।

১৮৮৫ : ভ্যান গ-র 'আলু খাওয়া'। ভিক্তর উগোর মৃত্যু। ডি. এইচ. লরেন্স-এর জন্ম। এজরা পাউণ্ডের জন্ম। লুই পাস্তর জলাতঙ্কের টিকা আবিষ্কার করলেন।

১৮৮৫-৮৬ : জ্যঁা মরেয়াস, পর-পর দুটি প্রবন্ধে, 'সৃষ্টিশীল শিল্পের গতি'কে 'সিম্বলিজম' নামে চিহ্নিত করলেন।

১৮৮৫-৮৭ : সেজ়ান-এর 'সঁা-ভিতোয়ার' পর্বতের চিত্রপর্যায়। কিউবিজম-এর জন্ম।

১৮৮৫-৮৮ : স্যর রিচার্ড বার্টন-কৃত আরব্যোপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হ'লো।

১৮৮৬ : গুস্তাভ কান্, জ্যঁা মরেয়াস ও পল আর্দ কর্তৃক স্বল্পকালের জন্য 'সিম্বলিস্ট' পত্রিকার পরিচালনা। হেনরি জেমস-এর 'দি অ্যাস্পার্ন পেপার্স'। প্যারিসে পাস্তর ইনস্টিট্যুট স্থাপিত। টলস্টয়ের 'ইভান ইলীচের মৃত্যু'। রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের 'ডাক্তার জিকল ও মিস্টর হাইড'।

১৮৮৬-১৯০০ : আন্তন চেখভের গল্পপর্যায়।

১৮৮৭ : ইয়েটস ও আর্নেস্ট রীস 'রাইমার্স ক্লাব' স্থাপন করলেন। মালার্মের 'সনেটগুচ্ছ'; 'ফনের অপরাহ্ণে'র শেষ লেখন। লাফর্গের মৃত্যু।

১৮৮৮ : গোগ্যাঁ ভ্যান গ-কে জাপানি শিল্পের পরিচয় দিলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের আর্ল শহরে ভ্যান গ ক্ষুর নিয়ে তাড়া করলেন গোগ্যাঁকে; তারপর নিজের একটি কান কেটে উপহারস্বরূপ এক গণিকাকে পাঠিয়ে দিলেন। মালার্মে-কৃত পো-র কবিতার অনুবাদ। জর্জ মূর-এর 'একটি যুবকের আত্মকথা'। টি. এস. এলিয়টের জন্ম।

১৮৮৯ : গোগ্যাঁর 'হলুদ খ্রিষ্ট'। ভ্যান গ-র 'সাইপ্রেস-বীথিকা', 'তারাভরা রাত্রি', 'চেয়ার'। ভ্যান গ পাগল ব'লে গ্রেপ্তার হলেন; এক বছর আরোগ্যশালায়। ঈফেল স্তম্ভ নির্মিত। টমাস আলভা এডিসনের ল্যাবরেটরিতে চলন্ত ছবির ('কিনেটোস্কোপ') উদ্ভাবন।

১৮৯০ : ভীইয়ে দ্য লিলাদঁ-র 'আক্সেল', যা ইয়েটস, তাঁর যৌবনে, 'ধীরে, পরিশ্রম

ক'রে, ধর্মগ্রন্থের মতো' পড়েছিলেন। বুকে গুলি চালিয়ে ভ্যান গ-র আত্মহত্যা। ফ্রেজার-এর 'দি গোল্ডেন বাউ', প্রথম খণ্ড। হুইসলার-এর 'শত্রু করার সুকুমার কলা'। টমাস হার্ডির 'টেস্'। পাস্টেরনাকের জন্ম।

১৮৯১ : গোগ্যাঁ প্রথমবার টাহিটি দ্বীপে। র‍্যাঁবো আফ্রিকা থেকে মার্সেইতে ফিরলেন; একটি বিষাক্ত পা কর্তিত হবার পরে তাঁর মৃত্যু হ'লো। আঁদ্রে জীদ, তাঁর বয়স ২২, বেনামিতে 'আঁদ্রে ওঅল্টার-এর নোটবই' প্রকাশ করলেন। আর্থার কনান ডয়েল-এর 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমজ্'। অস্কার ওআইল্ড-এর 'দি পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে'। বর্নার্ড শ-র 'দি কুইন্টেসেন্স অব ইবসেনিজ্‌ম'।

১৮৯১-৯২ : রবার্ট এডুইন পিয়ারি পাঁচবার উত্তর মেরুতে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন।

১৮৯২ : বর্নার্ড শ-র 'বিপত্নীকের গৃহ'। ইয়েটস-এর 'দি কাউন্টেস ক্যাথলীন'। স্টেফান গেঅর্গে, হুগো ফন হোফমান্‌ষ্টাল ও পল জেরার্দির সহযোগে, 'আর্টের জন্য' পত্রিকা স্থাপন করলেন। হোফমান্‌ষ্টালের 'টিশিয়ানের মৃত্যু'।

১৮৯৩ : ওআইল্ড ফরাশি ভাষায় 'সালোমে' লিখে প্রকাশ করলেন। এরেদিয়া-র সনেটগুচ্ছের প্রকাশ। দেগা-র 'আবসাঁৎ' লণ্ডনে প্রদর্শিত হ'লো; জর্জ মূর ধিক্কার দিলেন। উন্মাদ অবস্থায় মোপাসাঁর মৃত্যু; তাঁর চিকিৎসক, ডাক্তার ব্লাঁশ, ৩০ বছর পূর্বে নের্ভালের চিকিৎসা করেছিলেন। এডভার্ট মুংক-এর 'চীৎকার'; চিত্রকলায় এক্সপ্রেশনিজম-এর উদ্ভব। ন্যানসেন-এর উত্তর মেরু অভিযান। হেনরি ফোর্ডের প্রথম পেট্রলচালিত অটোমবীল। মায়াকভস্কির জন্ম।

১৮৯৪ : অব্রি বিয়ার্ডজ্‌লি-কর্তৃক 'সালোমে' ও 'দি ইয়েলো বুক্'-এর চিত্রণ। অস্কার ওআইল্ড ট্রেনে 'ইয়েলো বুক্' পড়তে-পড়তে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রুশীয় কাব্যে ও শিল্পকলায় প্রতীকিতার আরম্ভ।

১৮৯৫ : ওআইল্ডের কারাদণ্ড। ইয়েটসের 'পোএমস'। এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'দি টাইম মেশিন'। ভালেরির 'দা ভিঞ্চি'।

১৮৯৫-১৯০০ : সেজান-এর স্টিল লাইফ পর্যায়।

১৮৯৬ : গোগ্যাঁ, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে ত্যাগ ক'রে টাহিটিতে এসে, আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। উপদংশ, বহুমূত্র ও অন্যান্য রোগে ভের্লেনের মৃত্যু। ভালেরির 'মঁসিয় তেস্ত-এর সঙ্গে এক সন্ধ্যা'। বের্গসঁর 'পদার্থ ও স্মৃতি'। মার্কনি বেতার-টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন।

১৮৯৭ : ওআইল্ড জেল থেকে বেরোলেন। 'দি স্যাভয়' পত্রিকায় বিয়ার্ডজ়লির 'আণ্ডার দি হিল্'। ষ্টেফান গেঅর্গের 'আত্মার বৎসর'। সি. এ. পার্সন্স-এর 'টার্বিনিয়া'—প্রথম টার্বাইন-চালিত জাহাজ। 'দি ইয়েলো বুক্' সমাপ্ত।

১৮৯৭-৯৯ : দক্ষিণ মেরুসাগরে আমেনসেনের প্রথম অভিযান।

১৮৯৮ : পঁচিশ বছর বয়সে অব্রি বিয়ার্ডজ়লির মৃত্যু। বর্নার্ড শ-র 'প্লেজ প্লেজ়েণ্ট অ্যাণ্ড আনপ্লেজ়েণ্ট'। টোমাস মান্-এর 'ছোট্ট হের ফ্রীডেমান্'। স্টানিস্লাভস্কি 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করলেন। পিয়ের ও মারী কুরি-কর্তৃক রেডিয়ম আবিষ্কার। মালার্মের মৃত্যু।

১৮৯৯ : রিলকে 'ডাস ষ্টুণ্ডেনবুক্' ('প্রহর-পুঁথি') প্রথম খণ্ড রচনা করলেন। গেরহার্ট হাউপ্টমান্-এর 'তাঁতিরা'। ইয়েটসের 'বেণুবনে বাতাস'। আর্থার সাইমন্স-এর 'দি সিম্বলিস্ট মুভমেণ্ট ইন লিট্‌রেচার'। মাক্সিম গর্কির 'ছাব্বিশ পুরুষ ও একজন মেয়ে'।

১৮৯৯-১৯০০ : রিলকে দু-বার রাশিয়ায়; টলস্টয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯০০ : রিলকের 'ঈশ্বরের গল্প'। টোমাস মান্ 'বুডেনব্রোকস' শেষ করলেন। ফ্রয়েডের 'স্বপ্নতত্ত্ব'। পিকাসো প্যারিসে। নীটশের মৃত্যু। অস্কার ওআইল্ডের মৃত্যু।

১৯০১ : রানী ভিক্টরিয়ার মৃত্যু। জোলার 'অভিযোগে'র ফলে ফ্রান্সে 'ড্রেফ্যুস-আন্দোলন'। চেখভের 'তিন বোন'। রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে মেচনিকভ-এর গবেষণা প্রকাশ।

১৯০২ : আমেরিকায় রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় গ্লাইডারে উড্ডীন। টোমাস মান্-এর 'ট্রিস্টান'। মাক্সিম গর্কির 'দি লোয়ার ডেপথস'। মেতারলিঙ্ক-এর 'মনা ভানা'। জোলার মৃত্যু।

১৯০২-০৩ : রিলকে, প্রথমবার প্যারিসে, রদাঁর সংস্পর্শে এলেন। গোগ্যাঁর 'সৈকতে অশ্বারোহী' ও 'তাদের গায়ের সোনা'।

১৯০৩ : আঁরি মাতিস্-এর চিত্র প্যারিসে প্রদর্শিত। টাহিটিতে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হ'য়ে, গোগ্যাঁর মৃত্যু। টোমাস মান্-এর 'টোনিও ক্র্যাগার'। আমেরিকায় এডিসন কোম্পানির প্রথম সগল্প চলচ্চিত্র। রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় পেট্রলচালিত বায়ুযানে উড্ডীন। হেনরি ফোর্ডের নেতৃত্বে ফোর্ড মোটর কোম্পানি স্থাপিত হ'লো।

১৯০৪ : লেডি গ্রেগরি ও ইয়েটস-এর সহযোগে ডাবলিনে 'অ্যাবি থিয়েটার'

প্রতিষ্ঠিত। জে. এম. সিং-এর 'রাইডার্স টু দি সী'। চেখভের 'চেরি বাগিচা'। চেখভের মৃত্যু। পানামা খাল খনন আরম্ভ।

১৯০৫ : ফ্রয়েডের 'থ্রী কনট্রিবিউশন্স টু দি থিয়রি অব সেক্স'। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদের প্রথম বিবৃতি প্রকাশ করলেন। প্যারিসে fauvism। রাশিয়ায় জানুয়ারি-বিপ্লব।

১৯০৬ : ইবসেনের মৃত্যু। রিলকের 'কর্নেট ক্রিস্টফ রিলকের প্রেম ও মৃত্যু'। সেজ়ানের মৃত্যু। প্যারিসে পিকাসো ও মাতিসের সাক্ষাৎ।

বোদলেয়ার-এর জীবনীপঞ্জি

১৮২১ : জন্ম, প্যারিস, ৯ এপ্রিল। পিতা : ফ্রাঁসোয়া বোদলেয়ার ; মাতা : কার্লীন দ্যুফে (Dufays)। (এঁদের বিবাহ হয় ১৮১৯-এ ; বিপত্নীক ফ্রাঁসোয়া বোদলেয়ারের বয়স তখন ৫৯ ; কার্লীন দ্যুফে-র ২৬।) গোতিয়ে-র বয়স ১০, নের্ভালের ১৩, উগোর ১৯, বালজাকের ২২। ডস্টয়েভস্কির জন্ম। ফ্লোবেয়ারের জন্ম।

১৮২৭ : ফ্রাঁসোয়া বোদলেয়ারের মৃত্যু। ভিক্তর উগোর 'ক্রমওয়েল-এর ভূমিকা'। ফ্রান্সে রোমান্টিকতার উত্থান।

১৮২৭-২৯ : এক বৎসরের কিছু অধিক কাল, বালক বোদলেয়ার তাঁর মাতাকে একান্তভাবে ভোগ করলেন।

১৮২৮ : জেরার দ্য নের্ভাল, কুড়ি বছর বয়সে প্রথম খণ্ড 'ফাউস্টে'র আশ্চর্য অনুবাদ প্রকাশ করলেন। এই অনুবাদ বিষয়ে গ্যেটে নের্ভালকে লেখেন : 'আপনার অনুবাদ প'ড়ে আমার অভূতপূর্ব আত্ম-উপলব্ধি ঘটেছে।' আর একারমান্‌কে বলেন : 'এখন আর জর্মান ভাষায় "ফাউস্ট" পড়তে আমার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু ফরাশি অনুবাদটিকে নতুন ও জীবন্ত ব'লে মনে হয়।'

১৮২৯ : কার্লীন বোদলেয়ারের পুনর্বিবাহ ; স্বামীর নাম ক্যাপ্টেন (পরে জেনারেল) ওপিক (Aupick)। কমেদি ফ্রাঁসেস-এ দুটি রোমান্টিক নাটক অভিনীত—দ্য ভিন্‌ঈ-র 'ওথেলো' (শেক্সপিয়রের অনুলিখন) ও পিতা দ্যুমার 'তৃতীয় হেনরি ও তাঁর হৃদয়'। একুশ বছরের যুবক পেত্র্যুস বরেল (Petrus Borel)-এর নেতৃত্বে গোতিয়ে, নের্ভাল ও অন্যান্য তরুণ কবিরা 'ছোটো গোষ্ঠী' (ল্য পেতী সেনাকল) গঠন করলেন। (প্রাচীনপন্থী লেখকদের ছিলো 'গোষ্ঠী'—ল্য সেনাকল ; তা থেকে বিচ্ছেদ বোঝাবার জন্য এই নামকরণ।) সাহিত্যে ও রাজনীতিতে নিজেদের চরমপন্থী ব'লে ঘোষণা করলেন এঁরা, কিন্তু তারুণ্যের প্রত্যক্ষতম পরিচয় দিলেন বেশ, প্রসাধন ও ব্যবহারের অভিনবত্বে। বায়রন ও স্কটের প্রভাবে এঁদের ইংরেজপ্রীতি উগ্র (তার ধারা মালার্মের সময় পর্যন্ত লক্ষণীয়) ; কেউ-কেউ তাঁদের

ফরাশি নামের বানান বদলে ইংরেজ সাজলেন, 'জ্বালা ও অনল' (*Feu et Flamme*)-এর লেখক ফিলথে ও'নেভির প্রকৃত নাম ছিলো তেওফীল দোদে। এঁদের একজন (গোতিয়ে-র মতে 'প্রতিভার শিখা' বোঝাবার জন্ত) মাথার দু-পাশে সিঁথি কেটে মাঝখানকার চুল চুড়োর মতো তুলে দিলেন; কেউ সাজলেন স্পেনের আমির, কেউ বা ভারতের মহারাজা। বরেলের নিজের ছিলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব: তীক্ষ্ণ রূপ, তীক্ষ্ণ বচন, বিষাদে ভরা দৃষ্টি, দাম্ভিক ব্যবহার, স্প্যানিশ অভিজাতের মতো বর্ণিল ও আলম্বিত বেশবাস—এ-সবের সঙ্গে বহু বিচিত্র প্রণয়প্রবাদ মিশ্রিত হ'য়ে তাঁকে ক'রে তুললো অবিকল বায়রনি নায়ক, এমন এক পুরুষ, যাঁর দিকে চোখ তুললেই মরতে হবে। দলের মধ্যে গুণী আছেন অনেকেই, আছেন গোতিয়ে ও নের্ভালের মতো প্রতিভাবান; তবু, এই ব্যক্তিত্বের বলেই, বরেলের নেতৃত্ব অপ্রতিহত। গোতিয়ে-র চোখে তিনি 'মানুষ নন, মূর্ত কবিতা'; অনেকে ভাবেন, বরেলের কবিতা একবার বেরোলে উগোকে আর টিকতে হবে না। পনেরো বছর পরে বোদলেয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়; তখন বরেলের আর খ্যাতি নেই, অবস্থা হীন, তবু বোদলেয়ার মুগ্ধ হয়েছিলেন। হাবেভাবে, কথা বলার চাতুর্যে, এঁদের দু-জনের সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ করেছেন, কিন্তু আসলে হয়তো বরেল এবং ও'নেভির রচনা থেকে তরুণ বয়সে বোদলেয়ার যা পেয়েছিলেন তা অবশিষ্ট জীবনে ভুলতে পারেননি। 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ তার বহু প্রমাণ আছে। এবং বোদলেয়ারের বিখ্যাত উক্তিসমূহের মধ্যে অন্তত একটি তাঁর স্বকীয় নয়। একবার, দিজঁ শহরে, বোদলেয়ার যখন এক পত্রিকার সম্পাদক, কর্তৃপক্ষীয় এক ব্যক্তি জ্বান দ্যুভাল-এর সঙ্গে তাঁর 'অবৈধ' সম্পর্কের উল্লেখ ক'রে অসন্তোষ জানান। বোদলেয়ার উত্তর দেন: 'মঁসিয়, আইনজীবীর স্ত্রীর চাইতে কবির রক্ষিতা ঢের ভালো।' এই উত্তরের জন্ত বোদলেয়ার পেত্র্যুস বরেলের কাছে ঋণী, আর বরেল ঋণী রুসোর কাছে।

১৮৩০: শনিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি: কমেদি ফ্রঁাসেস-এ 'এর্নানি'র যুদ্ধে বরেল, গোতিয়ে, নের্ভাল প্রভৃতির অংশগ্রহণ।

ভিক্তর উগো ছিলেন বিজ্ঞাপনে ওস্তাদ; তাঁর 'এর্নানি' (*Hernani*) নাটকের প্রথম অভিনয় যাতে শত্রুপক্ষ পণ্ড করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে, অনেক আগে থেকেই, তিনি সাবধানে বরেলকে দলে টেনে-

ছিলেন। সেকালে প্যারিসীয় রঙ্গমঞ্চের সংলগ্ন ছিলো বড়ো-বড়ো 'হাততালির দল'; নাট্যকার, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, অভিনেত্রীর মুরুব্বি, সকলেই বেতন জোগাতো তাদের; নির্দেশমতো হাততালি দিয়ে তারা নাটকটিকে তরিয়ে বা ভেস্তে দিতো। 'এর্নানি'র প্রথম অভিনয়ে যুদ্ধের জন্য একত্র হলেন, ভাড়াটে বা ভক্ত দলবল নিয়ে প্রাচীন ক্লাসিকপন্থী আর টগবগে জোয়ান রোমান্টিকেরা; দ্বিতীয় দলের নেতা পেত্র্যুস বরেল, সঙ্গে গোতিয়ে, লাটিন কোয়ার্টার থেকে একশো ছাত্র জোগাড় ক'রে, বেলা একটা থেকে থিয়েটারের দরজায় হাজির; তাদের বিচিত্র বেশভূষা দেখে বিরোধীরা ছুঁড়লো ঢিল আর ডাস্টবিনের জঞ্জাল; বালজাক মুখের উপর একটি বাঁধাকপির পাতা উপহার পেলেন। চারটের সময় দরজা খোলামাত্র বন্যার মতো ঢুকে পড়লো বরেলের দল, তাদের টিকিটের গায়ে রক্তের রঙে 'hierro' শব্দটি অঙ্কিত, স্পেনীয় ভাষায় যার অর্থ 'লোহা'। চেঁচিয়ে, তাস খেলে, অশ্লীল গান গেয়ে, জানোয়ারের ডাকের নকল ক'রে, সশব্দে পানাহার ক'রে, তিন ঘণ্টা সময় তারা কাটিয়ে দিলে; ইতিমধ্যে থিয়েটারের প্রত্যেকটি আসন ভর্তি হ'য়ে গেলো, প্যারিসের নামজাদা কেউ প্রায় বাকি নেই, সাতটায় পর্দা উঠলো। তারপর দু-মিনিটের মধ্যে শুরু হ'য়ে গেলো যুদ্ধ; তর্ক ও চীৎকার, ধিক্কার বা জয়ধ্বনি ছাড়া রঙ্গমঞ্চে একটি পঙক্তি উচ্চারিত হ'তে পারলো না। ক্লাসিকপন্থীদের মতে (কথাটা ভুল নয়) ছন্দসূত্র ও নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম ভাঙা হয়েছে পদে-পদে; রোমান্টিকদের মতে এত ভালো হয়েছে সেইজন্যেই। নাট্যকার ও তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে কাগজগুলো ছী-ছি করলে পরের দিন; আরো অনেক রাত যুদ্ধ চলার পর, ক্লাসিক ঐতিহ্যের এক প্রধান পীঠস্থানে, রোমান্টিকতা নিঃসংশয়ে জয়ী হ'লো। লামার্তীন বললেন, 'রোমান্টিক ও ক্লাসিক—ঐ হতচ্ছাড়া কথা দুটো ১৮৩০-এর অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে।' বাউণ্ডুলে ছোকরাদের সাহায্যে জয়ী হ'য়ে, ভিক্তর উগো তাদের সংসর্গ থেকে সরিয়ে আনলেন নিজেকে, প্লাস রয়াল-এ বড়ো বাড়িতে উঠে এসে সাহিত্যের গুরু হ'য়ে বসলেন। কয়েক মাস পরে লামার্তীন ফরাশি আকাদেমির সভ্যরূপে বৃত হলেন; রোমান্টিকতা, সরকারি শীলমোহর পেয়ে, যৌবন হারালো।

২৬-২৯ জুলাই: জুলাই-বিপ্লব। দশম শার্ল-এর সিংহাসনত্যাগ; ফ্রান্সে বুর্বঁ রাজত্বের অবসান। অর্লীন্স-এর ডিউক, লাফায়েৎ ও তিয়ের্স-

এর সাহায্যে, লুই-ফিলিপ নাম নিয়ে ফ্রান্সের রাজা হলেন।

নূতন রাজত্ব বিষয়ে মোহভঙ্গ হ'তে 'ছোটো গোষ্ঠী'র দেরি হয়নি; আট বছর পরে রচিত 'মাদাম পুতিকার' উপন্যাসে পেত্রুস বরেল লুই-ফিলিপকে লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন: 'একটা অতিকায় গলদা-চিংড়ি, শিরায় রক্ত নেই, কিন্তু খোলশের রং ছিটোনো রক্তের মতো লাল।'

১৮৩১: পেত্রুস বরেল, বাড়ি-বদল ক'রে, তাঁর আড্ডার নাম দিলেন 'তাতার-শিবির', গোষ্ঠীর নতুন নাম হ'লো 'তরুণ ফ্রান্স'। 'তরুণ ফ্রান্স' নিজেদের ঘোষণা করলেন লুই-ফিলিপের ও ফিলিস্টাইনদের শত্রু ব'লে; সমাজের কোনো শাসন তাঁরা মানবেন না, সব প্রথা ভাঙবেন। একটিমাত্র ঘর, আসবাব অল্প, কিন্তু আভরণের বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর; সভ্যেরা, মধ্যযুগীয় পোশাক প'রে মেঝেতে ব'সে, করোটিতে সুরাপান করেন। এই ফ্যাশানের প্রবর্তন করেন লর্ড বায়রন, ফ্রান্সে সেটি চরমে নিয়ে যান নের্ভাল, যিনি একটি করোটি হাতে ক'রে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে স্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করতেন যে এটি তাঁর বাবার (অথবা মা-র) মাথার খুলি, সংগ্রহ করার জন্য হত্যা করতে হয়েছিলো। এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে আর-এক তরুণ পানীয়রূপে সমুদ্রের জল চেয়ে বসতেন—কেননা উগোর এক উপন্যাসের নায়ক করোটিতে সিন্ধুসলিল পান করেছিলো। গ্রীষ্মকালে তাঁরা বাগানে নগ্ন হ'য়ে বসেন, কখনো বিকটভাবে বাদ্য বাজিয়ে সন্ধ্যা কাটান—প্রতিবেশী ও পুলিশের সঙ্গে প্রায়ই গোলযোগ ঘটে। একবার এক বন্ধুর নামে জয়ধ্বনি দিতে-দিতে তাঁরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন; পুলিশ, দশম শার্লকে জয়ধ্বনি দেয়া হচ্ছে ভেবে, তাড়া করলে; নের্ভাল ধরা প'ড়ে এক মাসের জন্য জেলে গেলেন।

বরেলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস' (*Les Rhapsodies*) প্রকাশিত হ'লো। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বললেন, 'চিতাবাঘ যেমন রিপাব্লিকান, আমিও তেমনি।' সেই থেকে তাঁর নাম হ'লো lycanthrope—চিতা-মানুষ। জর্জ সাঁ স্বাধীন জীবন গ্রহণ করলেন; ফ্রান্সে স্ত্রী-স্বাধীনতার সূচনা।

১৮৩১-৩৫: প্যারিসে বাবুবিলাস বা ড্যাণ্ডীজম।

ফ্রান্সে লুই-ফিলিপের রাজত্বকাল মধ্যবিত্তের জীবনদর্শনে চিহ্নিত; সেই বণিকবৃত্তির প্রতিবাদে একদিকে যেমন বরেল-গোষ্ঠীর, তেমনি অন্যদিকে ড্যাণ্ডিদের উদ্ভব হ'লো। দুই সম্প্রদায়ে বিনিময় ক্ষীণ হ'লেও

মানসত্তায় মিল ছিলো প্রচুর। প্রধান মিল ইংরেজের প্রতি অন্ধ ভক্তিতে। সাধারণভাবে ভাবতে গেলে, এই ভক্তির যে-কারণ সর্বাগ্রে মনে আসে, তা তৎকালীন ইংলণ্ডের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পরে সারা য়োরোপের কূটনীতিতে তার কর্তৃত্ব। কিন্তু জয়ীর প্রতি বিজিতের মনোভাবে বিদ্বেষ ও ঈর্ষাও কি স্বাভাবিক নয়? যেমন, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পরে, মোপাসাঁর গল্প জর্মানের প্রতি ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠলো, আলোচ্য কালের ফরাশি সাহিত্যে ইংরেজের প্রতি তেমন আক্রোশের চিহ্ন নেই কেন? এর উত্তরে শুধু এ-কথা বলা যথেষ্ট নয় যে ইংরেজরা ফরাশি গৃহস্থের ভিটেমাটি উচ্ছেদ না-ক'রেও নেপোলিয়নকে হারাতে পেরেছিলো। মানতেই হবে, ইংরেজের প্রতি ফরাশি মনীষীদের এই আনুকূল্যের আসল কারণ রাষ্ট্রিক নয়, সাহিত্যিক ও সামাজিক। ইংলণ্ড, পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক দেশ, আধুনিক য়োরোপে রোমান্টিক চিন্তাধারার প্রবর্তক, আধুনিক উপন্যাসের উৎসস্থল, শেক্সপিয়র, রিচার্ডসন, স্কট ও বায়রনের জন্মভূমি—সেই ইংলণ্ড, শুধু ফ্রান্সের কেন, আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে সারা য়োরোপের সাহিত্যিক আদর্শ ব'লে গণ্য ছিলো—অন্তত, যারা প্রথা থেকে মুক্তি চেয়েছে তাদের পক্ষে তার চেয়ে অনুকরণযোগ্য দেশ আর ছিলো না। ফ্রান্সের পক্ষে, সমকালীন রাশিয়ার পক্ষেও, বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিলো ইংরেজি 'গথিক' উপন্যাস, মিসেস র‍্যাডক্লিফ-প্রবর্তিত রোমাঞ্চসিরিজ, যার পাশবিক সন্ত্রাস, মাঝে নানা হাত ঘুরে, বোদলেয়ার বা ডস্টয়েভস্কির আত্মিক যন্ত্রণায় ইন্ধন জুগিয়েছে। ইংরেজের আর-একটি বৈশিষ্ট্যে ড্যাণ্ডিরা মুগ্ধ হয়েছিলেন: সেটি এই যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে স্বীকার ক'রেও সমাজে তারা আভিজাত্যকে ব্যাহত করেনি। নীলরক্তবান ইংরেজের খ্যাতি বা অখ্যাতি এই যে সে আবেগপ্রকাশে পরাঙ্মুখ, ভীষণের বিলাসী (আঠারো শতকের শেষভাগে যখনই কোনো অপরাধীর ফাঁসি বা গিলোটিন হ'তো, সেই দৃশ্য দেখতে সবচেয়ে দামি 'আসন' সংগ্রহ করতেন জর্জ অগস্টাস সেলউইন নামক এক ইংরেজ), জাতিভেদে বিশ্বাসী, নিম্নবর্ণের প্রতি সচেতনভাবে অভদ্র বা তাদের অস্তিত্ববিষয়ে অচেতন। প্যারিসীয় বাবুরা, লর্ড হেনরি সেমুর নামক এক আধা-ইংরেজের নেতৃত্বে, এই লক্ষণগুলির অনুকরণে যত্নবান হলেন; সাজসজ্জায় বয়েল-গোষ্ঠীর মতো স্বৈরী না-হ'য়েও মৌলিকতার প্রমাণ দিতে লাগলেন

এমন সব ক্রিয়াকাণ্ডে, যা কোনো 'সুস্থ' ব্যক্তির কল্পনাতীত। এক ড্যাণ্ডি প্রায়ই কাফেতে ঢুকে চা নিতেন, চায়ের পাত্রে নুন ঢেলে দিয়ে বলতেন, 'এ কি খাওয়া যায়!'—তারপর আবার হুকুম দিতেন চায়ের, যার দাম সেকালে ছিলো পাউণ্ড-পিছু ষাট টাকার মতো। আর-একজন, লুই-ফিলিপের পুত্রের বিবাহসভায় ভিড়ের জন্য ঢুকতে না-পেরে, কম্বল মুড়ি দিয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে পড়লেন; মুমূর্ষু রোগী ভেবে সবাই পথ ছেড়ে দিলে—এমনি ক'রে উল্টোদিকের হাসপাতালের দরজায় পৌঁছনো মাত্র, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, জমকালো নাচের পোশাকে যথাস্থানে উত্তীর্ণ হলেন। দর্জির দোকানে ও অভিনেত্রীদের সাজঘরে বহু সময় কাটান এঁরা; কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে, গম্ভীর মুখে গঞ্জিকাসেবন করেন, ফ্রান্সে যা পেয় আকারে 'আশিশ' নামে প্রচলিত; মাঝে-মাঝে দু-একখানা পুস্তিকাও প্রকাশ না-করেন তা নয়। বরেল-দলের সঙ্গে এঁদের একটি তফাৎ এই যে এঁরা শুধু ব্যক্তিত্বের চর্চা দ্বারাই সার্থকতা চেয়েছেন; চেয়েছেন বুর্জোয়া আদর্শকে ছত্রখান ক'রে দিতে—রচনার দ্বারা নয়, শুধু উৎকেন্দ্রিক জীবনযাপনের অভিঘাতে। এই উচ্চাশা সার্থক করবার মতো অর্থবলও ছিলো এঁদের—যা বরেল-দলের ছিলো না—অনেকেরই ছিলো জুড়িগাড়ি, কেতাদুরস্ত অশ্লীলভাষী আইরিশ কোচোয়ান; প্রতি বছর কার্নিভালের সময় এঁদের অমিতাচারে জনগণ স্তম্ভিত হ'য়ে যেতো। তত্রাচ, এঁরা সাহিত্যচর্চায় একেবারে নিষ্ফল হননি, এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত ছিলেন আর্সেন উসে (Arsène Houssaye), বরেলেরও বন্ধু, যাঁকে বোদলেয়ার তাঁর 'ছোটো-ছোটো গদ্যকবিতা' ('প্যারিস স্প্লীন') উৎসর্গ করেন। আর ছিলেন বার্বে দোর্ভী (Barbey d'Aurevilly), যিনি 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' প'ড়ে বলেছিলেন: 'এই লেখকের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে: আত্মহত্যা, আর ধর্মীয় জীবন।' দোর্ভী, ১৮৪৪ সালে, 'জর্জ ব্রামেলের বাবুবিলাস' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যাতে এই ঘোষণাটি প্রথম পাওয়া যায় যে কৃত্রিমতা মনুষ্যত্বেরই নামান্তর। ('যিনি আবেগের অধীন তিনি তো বাস্তব হ'য়ে গেলেন, আর ড্যাণ্ডি থাকলেন না।') এই ধারণাই বোদলেয়ারীয় ড্যাণ্ডীজ্‌ম-এর যাত্রাস্থল; কিন্তু যে-আধ্যাত্মিক অর্থ বোদলেয়ার তাতে সঞ্চারিত করেন তা দোর্ভী, কল্পনা ক'রে থাকলেও, প্রকাশ করতে পারেননি।

এই একই সময়ে প্যারিসে 'এভাদিজ্‌ম' (Evadisme)-এর প্রাদুর্ভাব

হ'লো। গানো (Ganneau) নামক এক করোটিতত্ত্ববিদ এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন, যার প্রধান সূত্র উভলিঙ্গতা, ও পুরুষের তুলনায় নারীর প্রাধান্য। ঈভ ও আদমের নাম মিশিয়ে যেমন ধর্মের নাম হ'লো 'এভাদিজ়ম', তেমনি, মাতা ও পিতা শব্দের আদ্যক্ষর মিশিয়ে গানো নিজে নাম নিলেন 'মাপা' (Le Mapah); উভয় ক্ষেত্রেই নারী পুরোবর্তিনী। শেষ পর্যন্ত 'মাপা'র একজনের বেশি শিষ্য ছিলো না; কিন্তু ম্লান, করুণ, বহুবসনা ও শ্লথগামিনী রোমান্টিক নায়িকার আদর্শ ভেঙে দিয়ে ফরাশি মানসে দৃপ্ত আধুনিকার চিত্রপ্রতিষ্ঠায় এভাদিজ়ম-এর অবদান স্বীকার্য।

বরেল-গোষ্ঠী, বাবুবিলাস, তার উপরে কার্নিভাল ও কলেরা—সব মিলে প্যারিসে এই পাঁচ বছর যেন দ্যলাক্রোয়ার কোনো পটের মতো গতিশীল গরম রঙে চীৎকার করছে। হাওয়ায় লাগলো এক জোরো তীব্রতা, অস্থির, তৃপ্তিহীন; ফরাশি রোমান্টিকতা যেন মন্দিরে ঢুকেই দশায় পড়লো, যার প্রভাব, উগো ও বালজ়াকই শুধু নন, মেরিমে-র মতো স্বভাবক্লাসিকও এড়াতে পারলেন না। সাহিত্য হ'য়ে উঠলো 'মড়াপোড়া কাব্য', অর্থাৎ হত্যা, আত্মহত্যা, রক্ত, শবধর্ষণ, কঙ্কাল ও শয়তানের মিছিল। শবসাধনা জীবনেও প্রবেশ করলে; অপেরাপ্রণেতা বের্লিঅজ় (Berlioz) ফ্লরেন্সে এক সত্তমৃত তরুণীর সুন্দর শবকে সাশ্রু ও সচুম্বন প্রণয়নিবেদন করেন; এক ইতালীয় রাজকন্যা, তাঁর প্রণয়ীর মৃত্যুর পরে, এক কাষ্ঠখণ্ডকে কবর দিয়ে ঔষধলিপ্ত শবটিকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখতে দ্বিধা করলেন না। এই সবই বীজ, 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর জমিকে যা তৈরি ক'রে তুলছে।

১৮৩২ : প্যারিসে কার্নিভাল ও কলেরা। বরেলের বুজ়িংগো-দল।

'কার্নিভাল' শব্দের উৎপত্তি লাতিন carnem levare থেকে; মূল অর্থ : (খাদ্যহিশেবে) মাংসবর্জন; লেণ্ট-এর পূর্ববর্তী শেষ দিবসত্রয় এই নামে চিহ্নিত ছিলো। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় থেকে কার্নিভালের অর্থ দাঁড়ালো রক্তমাংসের প্রমত্ত তৃপ্তিসাধন। রোমান ক্যাথলিক দেশগুলিতে, লেণ্ট-এর পূর্ববর্তী সপ্তাহে, এই ইন্দ্রিয়-মহোৎসব পালিত হ'তো। ভারতীয় ঐতিহ্যে এর সঙ্গে তুলনীয় কিছুই মনে করতে পারি না; হয়তো হোলি, কোনো দূর অতীতে, এর সধর্মী ছিলো, আর তান্ত্রিক বা বৈষ্ণব ঐতিহ্যে অনুরূপ কিছু থাকলেও আমরা তা বিস্মৃত হয়েছি। সবচেয়ে বৃহৎ, উজ্জ্বল ও উদ্দাম কার্নিভালের অনুষ্ঠান ঘটে রেনেসাঁসের সময় ফ্লরেন্সে ও ভেনিসে,

তারপর লুই-ফিলিপের প্যারিসে। তার মধ্যে ১৮৩২-এর কার্নিভাল আকারে ও উন্মাদনায় অন্তগুলিকে হার মানিয়ে দেয় : সারা প্যারিস পথে বেরিয়েছে ভোর থেকে, শহরের উপর ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমেছে চোর, গুণ্ডা, বেশ্যা, লম্পট ও ভিখিরি, আর তাদের মধ্যে, শৌখিন-ছদ্মবেশের সুযোগে চক্ষুলজ্জা খসিয়ে ফেলে, অবাধে মিশে যাচ্ছেন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলারা। তামাশা দেখার জন্য যারা জানলা বা বারান্দা ভাড়া দিতে পারলে, তাদের একদিনে বছরের রোজগার হ'য়ে গেলো ; সার্থকনামা 'নারকী নাচে' (le galop infernal) মত্ত হ'য়ে রাত্রিশেষে ললনাকুল মূর্ছা গেলেন। এই আতিশয্যের বিশেষ একটু কারণ ছিলো : যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে মারীর আশঙ্কা। য়োরোপে কলেরা লেগেছে সে-বছর, লণ্ডনে তাণ্ডব চলছে, এবারে খাল টপকে প্যারিসে পৌঁছলেই হয়। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে রঙ্গমঞ্চ চমৎকার সাজিয়ে দিলে ; মার্চ মাসেই বসন্তের কুঁড়ি ধরেছে, মৃত্যুর সান্নিধ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেছে সম্ভোগ, এমন সময়, উৎসবের ঠিক চরম মুহূর্তে, এডগার পো-র গল্পের 'লাল মৃত্যু'র মতো—কিন্তু আরো ক্ষিপ্র, চতুর, নিশ্চিত ও বিপুল হ'য়ে—কলেরা নামলো। প্রথম নামলো এক প্রমোদশালায় ; একদল নাচিয়েকে, মুখের রং আর সাজগোজসুদ্ধ, নামাতে হ'লো কবরে। কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুর এক অপরূপ লীলা দেখতে পেলো প্যারিসবাসীরা। রাস্তায়, যে-কোনো সময়ে, সারি-সারি কফিন-টানা গাড়ি চলেছে, কখনো এক গাড়িতে একাধিক কফিন, আর যখন গাড়িতে আর কুলোয় না, ঠেলাগাড়িতে বোঝাই হ'য়ে শবেরা চলে কবরখানায়, যেখানে, স্থানাভাববশত, একই গহ্বরে অনেকগুলোকে ফেলা হবে। এদিকে আকাশ নীল, মনোরম বসন্ত, রাত্রে জ্যোৎস্না। তরুণ লেখকরা সন্ধ্যার পরে হাসপাতালে ঘুরে-ঘুরে বেড়ান, মৃত্যুর দৃশ্যে মন ভ'রে নিয়ে উগোর বাড়িতে এসে আড্ডা জমান, লিস্ট্ বাজিয়ে শোনান বেটোফেনের 'শবযাত্রা'। মার্চ থেকে নবেম্বরের মধ্যে কুড়ি হাজার মানুষ মরলো। ফলত মৃত্যু যেন খুব বেশি চেনা হ'য়ে গেলো ফরাশিদের, প্রায় প্রিয়জন। আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়লো, তার সমর্থন ক'রে এক সাহিত্যিক লিখলেন : 'তৃষ্ণানিবারণের জন্য সুরাপান করি আমরা ; আসলে মৃত্যুকেই পান করি। খাদ্য গ্রহণ করি পুষ্টির জন্য, সেখানেও আস্বাদ নিই মৃত্যুর।' মাক্সিম দ্যু কাঁ, যিনি সে-সময়ে বোদলেয়ারের মতোই বালক, পরে তাঁর

'স্মৃতিকথা'য় লিখলেন, 'অমন ক'রে মৃত্যুকে মানুষ আর কখনো ভালোবাসেনি।' মৃত্যু হ'য়ে উঠলো ফরাশি সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয়—আর শুধু ফরাশিই বা কেন? ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, রিলকে, টোমাস মান্—আধুনিক য়োরোপীয় মহাকবিদের কথা ভাবলে কি মনে হয় না যে অতল মৃত্যুর তল থেকেই রত্ন তুলে এনেছেন তাঁরা?

এদিকে বাড়িওলার তাড়া খেয়ে বরেল আবার বাড়ি-বদল করলেন, এবার যে-রাস্তায় বাসা জুটলো, তার নাম, আশ্চর্যের বিষয়, 'নরক-পথ' (rue d'enfer)। গৃহপ্রবেশের উৎসবে করোটিতে যে-মিশ্রিত সুরা পরিবেশিত হ'লো তা এতই উগ্র যে অনেকেই মেঝের উপর লম্বা হলেন। তখন পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর নাম বদল হয়নি; নের্ভাল একটি গলদা-চিংড়ি সুতোয় বেঁধে নিয়ে পার্কে ভ্রমণ করেন, যেহেতু চিংড়িরা কুকুরের মতো দংশন করে না, বা শিশুদের মতো কলরব ক'রে চিন্তাধারাকে ব্যাহত করে না। গোতিয়ে পরেন টকটকে লাল রঙের ক্লোক, সবুজ রং লাগান কেশগুচ্ছে; আর বরেলের জামা, তাঁর নিজের ভাষায়, পোলিশ রক্তের মতো লাল। গীতবাদ্য ও সমবেত চীৎকার দ্বারা প্রতিবেশীর ও পথচারীর কর্ণপীড়নও সমানে চলছে। এই সব আতিশয্যের ফলে লোকের মুখে-মুখে তাঁদের নাম হ'য়ে গেলো 'বুজিংগো' বা 'ঝালাপালা' (les bouzingos — চ্যাচানে দল)। নামটি তাঁরা সগর্বে গ্রহণ করলেন, এবং তাকে গৌরবান্বিত করার জন্য পাগলামির মাত্রা আরো চড়িয়ে দিলেন। তাঁদের আক্রমণ ক'রে 'ল্য ফিগারো' পত্রিকায় ছ-মাসে একুশটি প্রবন্ধ বেরোলো। সে-সব প্রবন্ধ অনুসারে, বুজিংগোরা মৃত্যু ও নরকের উল্লেখ না-ক'রে একটি পঙক্তিও লিখতে পারেন না; ঘর সাজান বিষাক্ত তীরে ও ছোরায়, দেয়ালের তাকে রাখেন স্পিরিটে-ডোবানো মানবভ্রূণ, আহার করেন ময়ূর অথবা বন্য বরাহ, আনন্দকে বলেন 'পচা', বিনোদন খোঁজেন কবরখানায় বা লাশকাটা ঘরে। আক্রমণের প্রাবল্যে বোঝা যায়, এই তরুণদের নিন্দে করা সহজ হ'লেও উপেক্ষা করা সম্ভব ছিলো না। কয়েকমাস পরে এঁরা আবার 'তরুণ ফ্রান্স' নাম নিলেন; বরেল বের করলেন 'স্বাধীনতা' নামে অচিরস্থায়ী পত্রিকা, তাতে চিত্রকলা বিষয়ে আলোচনা লিখলেন দ্যলাক্রোয়া।

বিপিতার কর্মস্থল লিয়ঁতে বোদলেয়ার 'কলেজ রয়াল'-এ ভর্তি হলেন; সেখানে পড়াশুনো করলেন ১৮৩৫ পর্যন্ত। এই আবাসিক

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ছিলো কঠোর, কিন্তু বোদলেয়ার তখনো অসুখী হ'তে শেখেননি। উগো ও লামার্তীনকে আবিষ্কার করেছিলেন ইতিমধ্যে, ভাষা বিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। স্কুলে কয়েকটি ছোটো-ছোটো প্রাইজ্‌ও জুটলো, তার একটি ড্রয়িঙের জন্য।

১৮৩৩ : পেত্রুস বরেল প্রকাশ করলেন 'শাঁপাভের, বা দুর্নীতির গল্প' (*Champavert, Contes immoraux*) আর তেওফীল গ'তিয়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ, 'জ্বালা ও অনল'। দুটি গ্রন্থেই বোদলেয়ারের পূর্বাভাস আছে।

১৮৩৫ : গোতিয়ে-র 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' (*Mademoiselle de Maupin*)।

এই উপন্যাসের ভূমিকায় 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সূত্রটি প্রথম প্রস্তাবিত হয়। দীর্ঘ ও প্রাণোচ্ছল সেই প্রবন্ধটি রোমান্টিক মানসের একটি প্রধান ইস্তাহার। তার সার কথা এই যে শিল্পবিচারে উপযোগ-বাদের স্থান নেই ; 'কোন কাজে লাগবে ?' এই প্রশ্ন সেখানে নিতান্ত অবান্তর। যুক্তির ধারা বোঝাবার জন্য দু-একটি কথা উদ্ধৃত করি : 'যা সুন্দর তা জগতের পক্ষে অপরিহার্য নয়। ফুলেদের উচ্ছেদ ক'রে দিন ; জগতের কোনো বৈষয়িক ক্ষতি হবে না। নারী, ডাক্তারি মতে সুগঠিত ও সন্তানধারণের উপযোগী হ'লেই সমাজবিজ্ঞানীরা তাকে ভালো বলবেন। যাঁরা উপযোগ চান, তাঁরা মিকেলাঞ্জেলোর চাইতে বেশি মূল্য দেবেন শ্বেতসর্ষপের আবিষ্কর্তাকে। সত্যিই যা সুন্দর তা কখনোই কাজে লাগতে পারে না ; যা-কিছু কাজে লাগে তা-ই কুৎসিত, কেননা তার জন্ম কোনো প্রয়োজন থেকে, আর মানুষের প্রকৃতি দীন ব'লে তার প্রয়োজনগুলি জঘন্য।'

১৮৩৬ : কর্নেল ওপিক প্যারিসে বদলি হ'য়ে, বোদলেয়ারকে ভর্তি ক'রে দিলেন একটি নামজাদা 'ল্যিসে' বা উচ্চ বিদ্যালয়ে। অধ্যক্ষকে বললেন, 'মঁসিয়, আপনার জন্য একটি মূল্যবান উপহার এনেছি। এই ছাত্র আপনার বিদ্যালয়ের গৌরব বাড়াবে, সন্দেহ নেই।'

১৮৩৬-৩৯ : বোদলেয়ার বিদ্যালয়ে। মা-র কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন ছেলে-বেলায়, স্কুলেও চর্চা ছিলো। মগ্ন হলেন ফরাশি ও ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যে। বয়ঃসন্ধি নিয়ে এলো বিষাদ, যে-বিষাদ—অল্প কিছু সময় বাদ দিয়ে আজীবন সঙ্গী ছিলো তাঁর। সঁ্যাৎ-ব্যভ-এর কবিতা, তাঁর উপন্যাস, 'ইন্দ্রিয়বিলাস' (*Volupté*)—এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে বোদলেয়ার নিজেকে

খুঁজে পেলেন যেন ; আরম্ভ হ'লো পদ্যরচনা। মাষ্টারমশাইরা, যাঁরা তখন ফ্রান্সের গোল্ডস্মিথ অথবা কুপারদেরই কবি ব'লে মানেন—তাঁরা ছাত্রের মতিগতি দেখে প্রীত হলেন না। বার-বার মন্তব্য হ'লো : 'খাটতে রাজি নয়, অলস, অবাধ্য।' বোদলেয়ার তখন থেকেই জিভে শান দিচ্ছেন, বেঁকিয়ে ছাড়া বলেন না ; শিক্ষকেরা ভাবেন মিথ্যে কথা বলছে। ইতিহাসকে 'অর্থহীন' ব'লে কর্তৃপক্ষের আঁতে ঘা দিলেন। এই বেসামাল ছাত্রের কৃতিত্ব তবু মানতে হ'লো : লাতিন ও গ্রীক রচনায় বার-বার পুরস্কার পায়, লাতিন পদ্যরচনায় প্রথম হয়, ফরাশি রচনাতেও কম যায় না। কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না ; ১৮৩৯ সালে, কোনো-এক রহস্যময় কারণে, বোদলেয়ার বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেন ; এক 'প্রাইভেট' শিক্ষকের বাড়িতে থেকে, সেই বছরেই 'বাকালোরেয়া' (baccalauréat = বি.এ.) পাশ করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিপিতা 'জেনারেল'-পদে উন্নীত হয়েছেন, তিনি জোর করলেন ছেলেকে বৈদেশিক বিভাগে সরকারি চাকরি নেবার জন্য। ছেলে রাজি হ'লো না।

১৮৩৯ : পেত্রুস বরেলের 'মাদাম পুতিফার' (*Madame Putiphar*)। বরেল, তাঁর মহিমা অস্তমিত, পাড়াগাঁয়ে দীনবেশে ও অর্ধাশনে থেকে এই উপন্যাসটি লিখে উঠেছিলেন। এই গ্রন্থের পদ্য মুখবন্ধটি, ও'নেভির অনেক কবিতার মতো, সেই আবহে পরিপ্লুত, যা পরে বোদলেয়ারীয় ব'লে চিহ্নিত হয়েছে। তিন অশ্বারোহী কবির কাছে সমাগত : জগৎ, নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যু। জগৎ বলছে, 'এসো আমার সঙ্গে, তৃপ্ত করো বাসনা, ভোগ করো গৌরব, সুখ, নারী।' নিঃসঙ্গতা উপহার আনে মঠবাসীর তপস্যা, কঠিন ও আনন্দময় সমাধি। আর মৃত্যু দিতে চায় লুপ্তি, শূন্যতা, স্তব্ধতা, অনুপস্থিতি—সবচেয়ে মহার্ঘ সেই রত্ন, যার তুলনায় অন্য সবই মলিন ও ঐকাহিক। কিন্তু কবির আকর্ষণ তিন দিকেই প্রবল ; তিনি মনস্থির করতে পারেন না।

১৮৩৯-৪১ : বোদলেয়ার লাটিন কোয়ার্টারে বাসা নিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন না। প্যারিসীয় ছাত্রজীবনের প্রথা মেনে নিয়ে গ্রহণ করলেন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। আফিম ও সিদ্ধিসেবনে দীক্ষা হ'লো। লুশেৎ (Louchette) নামে একটি ট্যারা মেয়েকে রক্ষিতা নিলেন ; সম্ভবত লুশেৎই তাঁকে উপহার দেয় উপদংশ, যা শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলো।

১৮৪০ : ল্যুহ্বর-এ দ্যলাক্রোয়ার প্রথম প্রদর্শনী দেখে, চিত্রকলায় বোদলেয়ারের উৎসাহ আরম্ভ হ'লো। স্যাঁৎ-ব্যভ তাঁর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করলেন; তৎকালীন তরুণ কবিরা মোহিত হলেন।

১৮৪১ : মাতা ও বিপিতা, পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে, এক নাবিক-বন্ধুর জাহাজে তাঁকে ভ্রমণে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। বোদলেয়ার প্রথমে প্যারিস ছাড়তে চাইলেন না, অবশেষে ভ্রমণে অভিজ্ঞ নের্ভালের পরামর্শে রাজি হলেন। ৯ জুন তারিখে বর্দো থেকে জাহাজ ছাড়লো; জাহাজের নাম 'দক্ষিণ আকাশ'; গন্তব্য, কলকাতা। উত্তমাশা অন্তরীপে ঝড়ে জখম হ'লো জাহাজ; মরিশাস দ্বীপে এসে তিন সপ্তাহ মেরামতের অপেক্ষায় কাটলো। বোদলেয়ার প্যারিসের জন্য ব্যাকুল, প্রবাসের মেয়াদ বাড়াতে নারাজ, কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপরোধের কাছে অগত্যা হার মানলেন। এলেন ভারতসমুদ্রের রেয়ুনিয়ঁ দ্বীপে; সেখান থেকে অন্য জাহাজ নিয়ে প্যারিসের দিকে যাত্রা করলেন। সত্যিকার বিদেশভ্রমণ তাঁর জীবনে এই একবারই ঘটেছিলো, কেননা ফরাশির পক্ষে বেলজিয়মকে ঠিক বিদেশ বলা যায় না। এবং তাঁর কাব্যে এই প্রাচ্য ভ্রমণের অবদান কতখানি, তাঁর কোনো পাঠকের তা অজানা নেই। পরবর্তী কালে বন্ধুদের কাছে তিনি গল্প করতেন যে তিনি কলকাতাতেও গিয়েছিলেন, আর মৃত্যুর অল্পকাল আগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভারতবর্ষ বিষয়ে একটি কবিতা লিখবেন ব'লে।

১৮৪২ : ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। দু-মাস পরে বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটলো। তেওদর দ্য বাঁভিল (Theodore de Banville) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন।

১৮৪২-৪৪ : আইনত সাবালক হ'য়ে বোদলেয়ার তাঁর পিতার অর্থের অধিকারী হলেন; সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর জীবনযাপন রূপান্তরিত হ'লো। ল্যাটিন কোয়ার্টারের শস্তা 'পঁসিয়ঁ' ছেড়ে উঠে এলেন উঁচু দরের অতেল পিমদাঁয় (হোটেলের নাম, কারো-কারো মতে, অতেল লোজ্যাঁ); হ'য়ে উঠলেন পুরোদস্তুর ড্যাণ্ডি। তাঁর এই সময়কার উজ্জ্বল জীবন বহু লেখক বর্ণনা করেছেন। অজস্র ছিলো বিলাসিতা; আরাধ্য ও আলোচ্য ছিলো শিল্পকলা; নেশা ছিলো আফিম, সুরা ও সিদ্ধি: সঙ্গী ছিলেন গোতিয়ে, বাঁভিল, দ্য বোভোয়ার (Roger de Beauvoir: মূল ড্যাণ্ডি-দলের অন্যতম), কুর্বে ও দ্যরয় প্রভৃতি শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা।

হোটেলের সালঁতে, যার দেয়ালে গ্রীক অর্ধছাগ-মানবেরা বনদেবীদের পশ্চাদ্ধাবন করছেন, আলো যেখানে সুন্দর থেকে সুন্দরতর সরঞ্জামে বিচ্ছুরিত, সেখানে ব'সে আছে চিত্রশিল্পীর মডেল-মেয়েরা—উদ্ধত বেশে, সুগন্ধি দেহে, লাস্যময় ভঙ্গিতে। বোদলেয়ারের নিজের ঘরে ঘন গালিচা, প্রাচীন কবিদের সোনা-বাঁধানো মূল্যবান সংস্করণ, চিত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ অতিথির দৃষ্টিকে বিহ্বল ক'রে তোলে। এক নিঃশব্দ ভৃত্য মাঝে-মাঝে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আসে, মাঝে-মাঝে বোদলেয়ার নিঃশব্দে উঠে বন্ধুদের গায়ে প্রাচ্য আতর ছিটিয়ে দেন। কৃশ মানুষ (এই কার্শ্য তিনি সারা জীবনেও হারাননি), শ্বেতাঙ্গের পক্ষে আশ্চর্য কালো চুল ও চোখ (বাঁভিল বলেছিলেন 'দু-ফোঁটা কালো কফি'), গায়ের রং ম্লান, মুখের ছাঁদ ডিমের মতো, চাপা ঠোঁটে বিদ্যুতের মতো ভাষণ। বাবুবিলাসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য অনুসারে, বেশভূষা বিষয়ে তৃপ্তিহীনভাবে যত্নবান; যেমন, পরবর্তী জীবনে, রচনার প্রুফ দেখার সময় ক্ষুদ্রতম কমার গরমিল নিয়ে প্রকাশককে পাগল ক'রে দিয়েছেন, তেমনি এখন দর্জিকে কাতর ক'রে ফেলছেন পৌনঃপুনিক সংশোধনের নির্দেশ দিয়ে। কোনোদিন তাঁর কালো মখমলের জামার উপর সোনালি বেল্ট বাঁধা; কোনোদিন আঁটো পাজামার সঙ্গে সরু আচকানের মতো কোট, কোনোদিন বা গলা-খোলা শাদা শার্টের সঙ্গে ঢিলে-ক'রে-বাঁধা টকটকে লাল নেকটাই। বন্ধুরা কেউ বলতেন 'টিশিয়ানের ছবি', কেউ বলতেন, 'বায়রন', একজন নাম দিয়েছিলেন 'ট্যারচা খ্রিষ্ট'। (এই সময়ে এমিল দ্যরয় তাঁর একটি প্রতিকৃতি আঁকেন, তাই তাঁর 'সুখী' চেহারাও আমরা দেখতে পাই, যদিও, মানতেই হবে, পরবর্তী চিত্রসমূহেই 'লে ফ্লর দ্যু মাল'-এর কবিকে আমরা চিনতে পারি।) এ-সব কথা চাটুবাক্য নয়, তাঁর সংস্পর্শে এলে সম্মোহিত না-হ'য়ে উপায় ছিলো না সেই সময়ে। তখনও কোনো কবিতা তিনি প্রকাশ করেননি, কিন্তু গোতিয়ে ও বাঁভিল, যাঁরা জীবনে বা সাহিত্যে তাঁর অগ্রজ, তাঁরাও হ'য়ে পড়েছিলেন—শুধু অনুরাগী নয়, তাঁর ভক্ত। তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে—বা তাঁর কথা শুনে—রাত ভোর হ'য়ে যেতো এঁদের। বাঁভিলের 'স্মৃতিকথা' থেকে উদ্ধৃত করি:

'রাত্রি নামলো (বাঁভিল বোদলেয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের

বর্ণনা দিচ্ছেন), স্বচ্ছ, শান্ত, মায়াময় রাত্রি ; ল্যুক্সাঁবুর্গ বাগান থেকে বেরিয়ে আমরা ধুলভারে হেঁটে বেড়াচ্ছি। রহস্যময় গতি ও মর্মরে ভরা পথ, কবি (বোদলেয়ার) যা ভালোবাসতেন, যার জন্ত তাঁর আগ্রহ ছিলো অশেষ। আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি সেই রাত্রিটি, যা গত হ'তে-হ'তে বোদলেয়ার তাঁর মনের অকূল ঐশ্বর্য উজোড় করলেন শুধু আমার কাছে—যেন রূপকথার এক রাজপুত্র, আধো ঠোঁট খুলে, হীরক ও মণিমুক্তার বন্যা ঢেলে দিলেন। আমাদের এই আলাপ চলতে-চলতেই মায়াবী রাত্রি দ্রুত ডানা মেলে পালিয়ে গেলো।'

বোদলেয়ারের এই জীবনযাত্রা, বা তার প্রবচন অবলম্বন ক'রে উইসমান্স (J.K. Huysmans) তাঁর 'আ রেবুর' (*A rebours*) উপন্যাসটি নির্মাণ করেন, আর সে-উপন্যাস পাঠ ক'রেই ইংলণ্ডে অস্কার ওআইল্ড তাঁর ডরিয়ান গ্রে-র চিত্র আঁকতে সমর্থ হন। বিশ শতকের কাব্যকে যা পথ দেখিয়েছে সেই প্রতীকিতার উৎস যেমন বোদলেয়ারের কবিতা, তেমনি, যা আজকের দিনে কৌতূহলের বিষয় মাত্র, সেই 'ডেকাডেন্স' বা শতকান্তিকতাও রূপ নিয়েছে তাঁর জীবন থেকে। ঠিকই হয়েছে ;—কেননা জীবন স্বভাবতই ম্রিয়মাণ, কবিতাই শুধু কালোত্তর হ'তে পারে।

এই দু-বছর কাল, বলা যায়, আমাদের কবির বয়স্ক জীবনের একমাত্র 'সুখের সময়', কিন্তু এই সময়েই দুটি স্থায়ী দুঃখের বীজ তিনি বপন করেছিলেন—দুঃখ ছাড়া তাঁর চলবে কেন ? ধারে কিনেছিলেন বহু চিত্র ও শিল্পকর্ম, বিক্রেতাটি ধর্মপুত্র ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিকে সেই ঋণ শোধ করতে হয়েছে। আর, তাঁর জীবনে 'ছোরার মতো প্রবেশ করেছিলো' যে-নারী, সেই জ়ান দ্যুভাল-এর সঙ্গেও, ঠিক কোন তারিখে জানা যায়নি, এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জ়ান দ্যুভালের পূর্ব-ইতিহাস এখনো অস্পষ্ট—তা দিয়ে কোনো প্রয়োজনও নেই আমাদের—তাঁর নামটি প্রকৃতপক্ষে কী, তাও গবেষণার বিষয় হ'য়ে আছে। নানা কারণে, প্রধানত পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার জন্য, এই রমণী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করেন ; তার মধ্যে 'দ্যুভাল'ই টিকে গেছে। আধা-কাফ্রি ও আধা-ফরাশি, শ্যামা, তন্বী, স্বল্পশিক্ষিতা, একটি নগণ্য থিয়েটারে নগণ্য অভিনেত্রী ছিলেন তিনি, বোদলেয়ার তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার ক'রে আলাদা বাসায় রানীর

হালে রাখলেন। শ্বেতাঙ্গিনী রূপসী ও বিদুষীদের উপেক্ষা ক'রে বোদলেয়ার যে এঁর সঙ্গেই নিজের জীবন যুক্ত করলেন, তার কারণ 'অন্ধ প্রেম' নয়, এরও পিছনে তাঁর সচেতন সাহিত্যিক মন কাজ করেছে। স্কট ও বায়রন-প্রবর্তিত প্রাচীপ্রবণতার 'পোশাকি' রূপটি তাঁর রচনায় দেখতে পাই না, কিন্তু প্রাচ্য দেশ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূ'ত হয়েছিলো; তিনি দেখেছিলেন গ্রীষ্মমণ্ডলের তপ্ত আকাশ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, অরণ্যের ঘনতা, দেখেছিলেন নিগ্রো নারীর উদ্বেল ও মদালস যৌবন;—আর সেই সব অভিজ্ঞতাকেই নতুন ও নিবিড় ক'রে পেতে চেয়েছিলেন এই শ্যামাঙ্গী কামদার সাহচর্যে। যা চেয়েছিলেন তা পাননি তাও নয়, 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর পাতায়-পাতায় তার প্রমাণ আছে। কোন শ্বেতাঙ্গিনী তাঁকে দিতে পারতো 'পিরিচের মতো' বড়ো-বড়ো তরল চক্ষু, গরম দেশের অরণ্য অথবা রাত্রির মতো অপর্যাপ্ত নিবিড় কৃষ্ণ কেশভার, পারতো 'মৃগনাভি, আলকাৎরা আর নারকোল-তেলের মিশ্রিত গন্ধ' ছড়াতে, তাঁর অপূর্বের অন্বেষণকে অনবরত খাদ্য জোগাতে? অন্তত, বোদলেয়ার তা-ই ভেবেছিলেন; অন্তত, দু-জন ফরাশিনীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ব্যাপার বিভিন্নভাবে ব্যর্থ হয়েছিলো। অতএব, কবির জীবনে যত দুঃখই তিনি এনে থাকুন, এক শতাব্দীর পরপার থেকে আমরা 'কালো ভেনাস'কে নিন্দা করতে পারি না।

কেউ-কেউ বলেন, 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর অনেক, এমনকি অধিকাংশ কবিতা এই দু-বছরের মধ্যেই রচিত হয়। সে-সব রচনার পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁরা কেউ-কেউ সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁদের বন্ধুটি শুধু একটি বিলাসী যুবকমাত্র নয়, অমর কবিদের অন্যতম। তত্রাচ, 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সবচেয়ে মর্মভেদী অংশ বেছে নিলে দেখা যাবে, সে-সব কবিতা তাঁর পরবর্তী জীবনের রচনা।

১৮৪৪ : পুত্রের অমিতব্যয়িতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মাদাম ওপিক আইনের শরণ নিলেন। প্রস্তাব হ'লো, বোদলেয়ারের অর্থ তাঁর নিজের হাতে রাখা যেহেতু নিরাপদ নয়, তাই আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য 'আইনসম্মত অভিভাবক' নিযুক্ত করা হোক। বোদলেয়ারের ক্রুদ্ধ, ব্যাকুল ও কাতর প্রতিবাদে হিতাকাঙ্ক্ষীরা বিচলিত হলেন না: ২১ সেপ্টেম্বর

তারিখে আদালতের হাকিম অভিভাবকত্বের আদেশ দিলেন। যিনি অছি নিযুক্ত হলেন তাঁর নাম আঁসেল (Ancelle), আইনজীবী তিনি, ওপিক-পরিবারের বন্ধু, বোদলেয়ারের নাবালক অবস্থায় তিনিই ছিলেন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে এখন থেকে বোদলেয়ার মাসে-মাসে তাঁর মূলধনের সুদ মাত্র পাবেন, আসলে হাত দিতে পারবেন না। তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিলো।

এমনি ক'রে, না-জেনে, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, মা তাঁর সন্তানের কবর খুঁড়লেন। যে-সব ঘটনার যোগাযোগে বোদলেয়ারের পরবর্তী জীবন কালো হ'য়ে গেলো, তার মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর এই অভিভাবকত্ব। নিঃসঙ্গতা, সাহিত্যিক অসাফল্য, প্রণয়িনীর বিশ্বাসঘাতকতা—যে-সব দুঃখ বোদলেয়ার নিজে অর্জন করেছিলেন, সেগুলো সবই তাঁর আগুনের ইন্ধন হ'তে পেরেছিলো, অর্থাৎ কবিতায় প্রকাশের দ্বারাই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন তাদের। কিন্তু অর্থকষ্ট কবিতার বিষয় হ'তে পারে না, তাই সেটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর সেই কষ্ট, এর পরে যে-বাইশ বছর বোদলেয়ার বেঁচে ছিলেন, তার প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিলো। এর পর থেকে উদ্‌ভ্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো জীবন কেটেছে তাঁর, প্যারিস শহরে কতবার বাসা-বদল করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তাঁর পক্ষে ঘৃণ্য শস্তা হোটেলে অনেক রাত কাটাতে হয়েছে। একশো দু-শো টাকার জন্য, এমনকি দশ-পাঁচ টাকার জন্য অসংখ্যবার চিঠি লিখেছেন মাতাকে ও আঁসেলকে—কখনো ভয়ে-ভয়ে, কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো বা কাতর অনুনয় জানিয়ে। কখনো এ-সব চিঠিতে ফল হ'তো, প্রায়ই হ'তো না। দু-একবার, একেবারে মরীয়া অবস্থায়, মূলধনের কিছু অংশ ভাঙিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু আঁসেলের কঠিন সুবুদ্ধিকে আজীবন আঘাতেও বেশি দূর টলাতে পারেননি।

আঁসেল দুর্জন ছিলেন না, বোদলেয়ারকে তাঁর নিজের ধরনে ভালোওবাসতেন। আর বোদলেয়ার, যদিও একবার কুপিত হ'য়ে আঁসেলকে প্রহার করবেন ব'লে শাসিয়েছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত, বহু-দিনের সংস্রবের ফলে, অভিভাবকের প্রতি মমতা অনুভব না-ক'রে পারেননি। আত্মীয় যদি অপ্রীতিকর হয়, তবু যেমন মনে-মনে আমাদের টান থাকে, এও তেমনি। প্রৌঢ় ও আইনজীবী, আঁসেল ছিলেন

সাংসারিক বিষয়ে বিচক্ষণ, অন্য সব বিষয়ে নির্বোধ। একখানা ভালো বই পড়েননি, বিষয় ব্যতীত দ্বিতীয় চিন্তা করেননি জীবনে; বোদলেয়ারের অন্তিম দশায় তাঁর রচনাবলি প্রকাশের জন্য যখন সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখনও আঁসেলের উদ্দেশ্য ছিলো অর্থকরী, সাহিত্যিক নয়। শার্ল বোদলেয়ারকে আবাল্য দেখেও কখনো ভাবেননি যে তাঁর রচনাসমূহের আর্থিক ভিন্ন অন্য কোনো মূল্য থাকতে পারে।

বোদলেয়ার জীবন ভ'রে সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর মা-কে; একই তারিখে লেখা ছ-সাতখানা চিঠি পর্যন্ত পাওয়া যায়। মা-কে তিনি অস্বাভাবিকরকম ভালোবাসতেন, সন্দেহ নেই; বাল্যে যে-অল্পকাল তরুণী ও বিধবা মাতাকে একান্তরূপে ভোগ করেছিলেন, সেই 'বাল্যপ্রণয়ের সবুজ স্বর্গে'র স্মৃতি তাঁকে আমৃত্যু হানা দিয়েছে। মা ছিলেন সুন্দরী, শিক্ষিতা, বিলাসিনী; বালক কবি ভালোবাসতেন সুসজ্জিতা মা-কে দেখতে, তাঁর উত্তরীয়ের কোমল পশুরোমে গাল ঘষতে, তাঁর অঙ্গের আঘ্রাণ ভালোবাসতেন। কথিত আছে, মা যখন পুনর্বার বিবাহ করলেন তখন অষ্টমবর্ষীয় বোদলেয়ার তাঁদের শয়ন-কক্ষের চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে মা এই নতুন ব্যক্তির সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে না পারেন। বড়ো হ'য়ে বলেছিলেন, 'আমার মতো পুত্র যার আছে সে-নারী পুনর্বিবাহ করে কেমন ক'রে?' এ-সব তথ্য থেকে কোনো-কোনো সমালোচক অয়দিপৌস-এষণা অনুমান করেছেন, কিন্তু ঐ শব্দটির আমদানি না-ক'রেও বোদলেয়ারের ব্যবহার আমরা বুঝতে পারি। বস্তুত, তিনি প্রথম দিকে বিপিতার প্রতি কোনো বিদ্বেষের পরিচয় দেননি, বরং বালক বয়সে ঐ কৃতী রাজপুরুষটির তুষ্টি-সাধনেরই চেষ্টা করেছেন। অভিভাবকত্ব স্থাপিত হবার পর থেকে ক্রমশ যদি জেনারেল ওপিককে তাঁর শত্রু ব'লে মনে হ'য়ে থাকে, সেটা স্বাভাবিক মাত্র; কেননা এই ব্যবস্থায় জেনারেল ওপিকের পূর্ণ সমর্থন ছিলো, আর বোদলেয়ারের সাহিত্যচর্চার প্রতি তিনি ছিলেন প্রথমে প্রতিকূল, পরে উদাসীন।

বোদলেয়ারের মায়ের কথা ভাবতে অবাক লাগে আমাদের। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে কোনো সন্তান হয়নি তাঁর; শার্ল তাঁর অনন্য সন্তান। এবং এই শার্ল সাহিত্যে কোনো যশ অর্জন করেনি তাও নয়। তা নিয়ে মাদাম ওপিক মাঝে-মাঝে গর্বও বোধ করেছেন, যাকে

স্নেহ বলে তা ছিলো না ব'লেও মনে হয় না; অথচ, এক স্বাভাবিক অক্ষমতার ফলে, এবং স্বামীর জাজ্বল্যমান আদর্শের প্রভাবে, এ-ধারণা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারেননি যে তাঁর ছেলের 'কিছু হ'লো না'। একবার, ওপিক-দম্পতি যখন প্যারিসে অধিষ্ঠিত, বোদলেয়ার তাঁদের ঠিকানা পর্যন্ত জানতে পারেননি; মাদাম ওপিক, পুত্রকে জীবিকা-অর্জনে অক্ষম বা অমনোযোগী দেখে, তাঁর চিঠিপত্রও না-খোলা অবস্থায় আঁসেলের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। পুত্রের কাতরোক্তির উত্তরে মাঝে-মাঝে যখন অর্থসাহায্য করেছেন, তাও সতর্কভাবে ও সুমিত মাত্রায়; এ-বিষয়ে তাঁর আচরণে আঁসেলের চেয়ে এক তিল অধিক উদারতা প্রকাশ পায়নি। সত্য, জেনারেল ওপিকের মৃত্যুর পর থেকে শুধু সরকারি পেন্সনের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে, হয়তো তখন আর সামর্থ্য ছিলো না তাঁর, কিন্তু মা-র কাছে বোদলেয়ার কি শুধু অর্থ ই চেয়েছিলেন? 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-সংক্রান্ত মামলার পীড়নের পর, বোদলেয়ার খুব ইচ্ছে করেছিলেন সদ্যবিধবা মা-র কাছে তাঁর অঁফ্ল্যর (Honfleur)-এর সাগরতীরবর্তী কুটিরে কিছুদিন বিশ্রাম নেন, কিন্তু মাদাম ওপিক অনেকদিন পর্যন্ত পুত্রকে আমন্ত্রণ জানাননি, পাছে তাঁর কুখ্যাত পুত্রের প্রতিবেশে তাঁর এক বয়স্কা সঙ্গিনীর সুনীতি-ও সুরুচিবোধে আঘাত লাগে। এক ধর্মপ্রাণ পুরোহিত ছিলেন এই সময়ে তাঁর উপদেষ্টা; তিনি 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল' প'ড়ে (বা না-প'ড়ে) পুঁথিটিকে আগুনে ভস্মীভূত করেন। ফলত, মাদাম ওপিকও কিছুদিন পর্যন্ত ও-বইয়ের পাতা ওল্টাননি, যদিও পরে, একটি চিঠিতে, কুপুত্রের কাব্যরচনার এমনভাবে প্রশংসা করেছিলেন যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সাহিত্যবিষয়ে তিনি একেবারে নিঃসাড় ছিলেন না। কিন্তু নিঃসাড় না-হ'লেই বোধশক্তি আসে না; বুঝতে হ'লে চেষ্টাও চাই, চর্চাও চাই, যুদ্ধ করার শক্তিও চাই। মাদাম ওপিক, মনে হয়, তাঁর পুত্র ব্যতীত অন্ত সকলেরই প্রভাবের অধীন ছিলেন; এই চারিত্রিক দুর্বলতাবশত শেষদিন পর্যন্ত তাঁর কবিপুত্রের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর স্মৃতির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আছি পুত্রের পত্রাবলি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন ব'লে; কিন্তু এও আমরা মনে না-ক'রে পারি না যে তিনি, একটু চেষ্টা করলে, শুধু অল্প একটু চেষ্টা ও সাহস খাটালে, জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে অন্তত

কিছু শান্তি দিতে পারতেন কবিকে, মাঝে-মাঝে বিশ্রামের দিন, হয়তো আরো কয়েকটি কবিতা লেখার অবকাশ। বোদলেয়ার ভালোবেসেছিলেন তাঁর অঁফ্লর‍্যরের কুটির (তার নাম দিয়েছিলেন 'খেলনাবাড়ি'), মাদাম ওপিকও একটি ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন ছেলের জন্য; কিন্তু ঐ ঘরে, সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, বোদলেয়ার যে-ক'টি বেলা বইয়ে দিতে পেরেছিলেন তাদের সংখ্যা যৎকিঞ্চিৎ। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে বোদলেয়ারকে ঋণের জাল প্যারিসে বেঁধে রাখতো, মায়ের দিক থেকেও অভ্যর্থনায় কার্পণ্য ছিলো, কেননা মাদাম ওপিক, লোকনিন্দার ভয়ে, অনেক সময়ই পুত্রের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। বোদলেয়ার যাকে বলতেন তাঁর 'দুরদৃষ্ট' (le guignon), তার এই রকম উদাহরণ পদে-পদে পাওয়া যায় তাঁর জীবনে। এমনকি তিনি মৃত্যুর পরেও মুক্তি পাননি তা থেকে। অঁফ্ল্যরে মাদাম ওপিকের বাড়ির রাস্তাটি যখন কবির নাম ধারণ করলে, তখনও সেই নামের বানানে ঠিক সেই ভুলটি হ'লো যে-ভুল তাঁকে জীবন ভ'রে লাঞ্ছিত করেছে। জীবৎকালে বহু পত্রিকায় তাঁর নাম ছাপা হ'তো 'Beaudelaire'—তা অসহ্য লাগতো কবির—রাস্তাতেও সেই বানান লেখা হ'লো।

পক্ষান্তরে, মা-র সঙ্গে বোদলেয়ারের ব্যবহার ভাবলে তাঁকে সু-পুত্রের উদাহরণ বলতে লোভ হয়। তিনি যে সদাসর্বদা মা-র কথা ভাবতেন তাঁর পত্রসংখ্যাই তার প্রমাণ দেয়। সে-সব চিঠি প'ড়ে সন্দেহ থাকে না যে—শুধু ভালোবাসাই নয়, জননীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিলো গভীর। আর ছিলো এক ছেলেমানুষি আকাঙ্ক্ষা, নিজের কৃতিত্ব মা-র কাছে প্রমাণ করবার। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, স্বীয় রচনার সমালোচনার জন্য বার-বার অনুনয় করেছেন সঁ্যাৎ-ব্যভকে, শেষ পর্যন্ত আকাদেমির সভ্যপদের জন্য প্রার্থী হবার সেই পাগলামি—এই সব-কিছুর পিছনে যতটা ছিলো নষ্টভাগ্য উদ্ধারের চেষ্টা, ঠিক ততটাই এই অভিলাষ যে মা যেন তাঁকে কিছু মূল্য দিতে পারেন, যেন বোঝেন যে তাঁর পুত্র নেহাৎ অপদার্থ নয়। কাগজে কিছু অনুকূল মন্তব্য বেরোলে তার কর্তিকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন মা-কে, চিঠিতে লিখছেন পরিকল্পিত রচনাবলির বর্ণনা, জান যখন তাঁকে ছেড়ে গেলো সেই নিতান্ত ব্যক্তিগত দুঃখটিরও মা-কেই শুধু অংশ দিতে

চেয়েছিলেন। তিনি, শিল্পের শহীদ, নিজের জল্লাদ, তাঁর চরিত্রের এই একটা দিকে কেমন অসহায় ছিলেন, কেমন করুণ ও পরনির্ভর। নিজে কি তিনি বোঝেননি তাঁর কবিতার মূল্য—আর, দেশে এত লোক থাকতে, গোতিয়ে, বাঁভিল, ফ্লোবেয়ার থাকতে, মা-কে বিশ্বাস করাবার এত গরজই বা কিসের।

কিন্তু যাঁর মনে ঐশ্বর্য বেশি, তাঁর চরিত্রে দ্বন্দ্বও অনেক। যেমন তিনি দুর্বল মুহূর্তে 'মায়ের ছেলে' হ'তে চেয়েছেন, তেমনি, মাদাম ওপিক যখন বৃদ্ধা হলেন, নিঃসঙ্গ হলেন, তখন বোদলেয়ার, নিজের দুঃখ বিপুল হওয়া সত্ত্বেও, মা-কে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করেছেন, চেষ্টা করেছেন তাঁর কষ্ট বাঁচিয়ে চলতে। রোগ যখন উৎকট হ'য়ে উঠলো, মা-র কাছে স্পষ্ট ক'রে তা প্রকাশ করেননি; আত্মহত্যার কথা ভেবেও পেছিয়ে গেছেন, প্রধানত মা-র কথা ভেবেই। 'আমার এই এক ভাবনা, পাছে তোমার আগে আমার মৃত্যু হয়'—এই সুর কত চিঠিতেই না ধ্বনিত হয়েছে। 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে জ়ানের উল্লেখ যতবার আছে, মায়ের উল্লেখ তার কিছু বেশিই হবে। সেই যন্ত্রণাময় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন 'প্রার্থনা': 'আমার অপরাধে মা-কে শাস্তি দিয়ো না, মা-র মধ্য দিয়ে শাস্তি দিয়ো না আমাকে।' আবার: 'স্বাস্থ্য, নীতি, আচার'—এই শিরোনামার তলে: 'আমার মা ও জ়ান—আমার স্বাস্থ্য; দোহাই, দয়া করো, কর্তব্য আছে। জ়ানের ব্যাধি। মা-র বার্ধক্য ও নিঃসঙ্গতা।' আর-একবার: 'জ়ানকে ৩০০, মা-কে ২০০, নিজের জন্য ৩০০, মাসিক ৮০০ ফ্রাঁ। সকাল ছ-টা থেকে কাজ, দুপুরে উপোশ। অন্ধের মতো কাজ, লক্ষ্যহীন, পাগলের মতো। দেখা যাক, কী ফল হয়।'

কোনো ফল হয়নি; এই কথাগুলো যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর রোগ ও দারিদ্র্য এতদূর এগিয়েছে যে কোনো নতুন ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। কোনো কাজে সমাহিত হবার মতো দেহমনের অবস্থা বিগত হয়েছে; আমরা এক অক্ষম চৈতন্যের হাহাকার শুনছি।

পরিহাস এই যে আঁসেল ও মাদাম ওপিকের প্রযত্নের ফলে, বোদলেয়ারের মৃত্যুকালে তাঁর মূলধনের একটি বড়ো অংশ অবশিষ্ট ছিলো। উপরন্তু, মাদাম ওপিকের নিজেরও কিছু সঞ্চয় ছিলো; তাঁর মৃত্যুর পরে অংশত তার উত্তরাধিকারী হলেন আসলিনো

(Asselineau), যিনি ছিলেন বোদলেয়ারের আজীবন বন্ধু। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে লোকেরা যাকে সুবুদ্ধি বলে তাকে হীনতাময় নির্বুদ্ধিতায় পরিণত করার কৌশল ভাগ্যবিধাতার অজানা নেই। পিতার অর্থ ও মাতার অর্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দারিদ্র্যের চরমে নেমে বোদলেয়ারকে মরতে হ'লো। কী লাভ হ'লো কার? কার ভালো করা হ'লো? যদি বোদলেয়ার দশ বছরে—বা পাঁচ বছরেও—তাঁর পুরো মূলধন উড়িয়ে দিতেন, তাহ'লেও কি এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হ'তো তাঁকে? তাহ'লে, দরিদ্র হ'য়েও, অন্তত নিজের টাকা নিজে ভিক্ষে ক'রে নেবার গ্লানি তাঁকে সইতে হ'তো না। কিংবা হয়তো, কোনো উপায় নেই দেখে, উপায়হীনতার মধ্যেই বাঁচতে শিখতেন—ভের্লেনের মতো। তাঁকে পঙ্গু করেছিলো অভিভাবকত্বের অসম্মান, নিজের উত্তরাধিকারের চেতনা, আর সেই উত্তরাধিকার স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে না-পারার জন্য আক্রোশের অস্থিরতা।

মনে হ'তে পারে, যে-কোনো অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর কাজ ক'রে গেছেন, আমরা পেয়েছি একগুচ্ছ সৌন্দর্য ও পবিত্রতা—এখন এ-সব আলোচনা ক'রে লাভ কী। কিন্তু সত্যি কি কোনোই লাভ নেই? যা হয়নি তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না; তাই, বাধ্য হ'য়ে, যা হয়েছে তাকেই সম্পূর্ণ ব'লে ধ'রে নেই। ভাবতে পারি না, কীট্‌স বেঁচে থাকলে আরো কী কবিতা লিখতেন, তাই ঐ চারটি-পাঁচটি ওড নিয়েই নিরন্তর মুগ্ধ হ'য়ে থাকি। কিন্তু কীট্‌স তো র‍্যাঁবোর মতো ফুরিয়ে যাননি, কবিতায় অভিজ্ঞ পাঠক তাঁর অপূর্ণ ও বিরাট সম্ভাবনার উদ্দেশে একবার নিশ্বাস না-ফেলে পারে না। বোদলেয়ারের কাব্যকৃতি আরো অনেক বড়ো ও দূরস্পর্শী, কিন্তু তিনি যে আরো বহু কবিতার ও গল্পগ্রন্থের পরিকল্পনা করেছিলেন, এমনকি তাদের নামকরণও করেছিলেন, তা তো আমরা জেনেছি। যদি ধ'রে নেয়া যায় যে তাঁর রোগ সেকালে অচিকিৎস্য ছিলো ব'লে আয়ু তাঁর বাড়ানো যেতো না, তবু ঐ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই, আরো অনেক রচনা সম্পূর্ণ করার সময় ও শক্তি তাঁর ছিলো না তা তো নয়। কেমন ক'রে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি যে তিনি যদি অর্থচিন্তায় নিরন্তর তাড়িত না-হতেন, যদি পেতেন অবসর, সাধারণ জৈব আরাম, অন্তত কিছুদিনের জন্য একটা নির্দিষ্ট বাসস্থান, তাহ'লে, ব্যাধি তাঁকে আঘাত

করার আগেই, শেষ করতে পারতেন না একটি নূতনতর 'ফ্ল্যর দ্যু মাল', বা আর-এক খণ্ড 'প্যারিস স্প্লীন্'? বা রূপ দিতে পারতেন না সেই আত্মজীবনীকে যার আশ্চর্য কঙ্কালমাত্র 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে রেখে গেছেন?

১৮৪৫: হোটেল পিমদাঁর উজ্জ্বল জীবন আগের বছরই শেষ হ'য়ে গেছে। বোদলেয়ার মাঝারি পাড়ায় উঠে এসেছেন, নতুন ক'রে রচনা করেছেন নিজেকে। আর চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না তাঁর বেশবাস; যে-সাজে বাকি জীবন কাটবে, এখন তা-ই ধারণ করলেন। মোটা কাপড়ের কালো কোর্তা, গলা-খোলা শাদা কামিজ, অধিকাংশ সময় গলবন্ধটিও কালো। সেই বেশ সযত্নে রচিত, নিজে দর্জিকে নকশা ব'লে দেন, কিন্তু চোখে দেখতে তা কঠিন ও নির্লিপ্ত। ছেঁটে ফেললেন বাবরি, শৌখিন দাড়ি-গোঁফ দূর হ'লো, মুখের রেখা তিক্ত হ'য়ে উঠলো ক্রমশ, তিক্ত আর কঠিন। গঁকুর-ভ্রাতারা ডায়েরিতে লিখলেন, 'গিলোটিনের আসামির মতো বেশবাশ'; সন্ন্যাসীর মতো তপঃকৃশ বললেও ভুল হ'তো না। যে-মানুষ দুঃখ পেয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে আরো অনেক দুঃখের জন্য, তার মুখ রূপ নিলো ধীরে-ধীরে, গ'ড়ে উঠলো 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কবির কৃশ, তীক্ষ্ণ, গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক মুখশ্রী। কবিতাতেও দেখা দিলো অবিকল বোদলেয়ারীয় বিষাদ, তাঁর বিখ্যাত 'spleen', তাঁর 'অমরতার সমান' নির্বেদ। বিলাসী জীবনকে বিদায় দিয়ে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হ'লো।

এ-বছর প্রথম তিনি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলেন। প্রথমে একটি প্রবন্ধ (সে-বছরের সালঁ বা চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা) তারপর একটি কবিতা। রচনার দ্বারা উপার্জনের চেষ্টা ক'রে হতাশ হলেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন জুন মাসে। কথিত আছে, এক সন্ধ্যাবেলা যখন জ্বান দ্যুভালের সঙ্গে কাফেতে ব'সে আছেন, হঠাৎ বোদলেয়ার ছুরি বসিয়ে দেন নিজের বুকে। এই আখ্যান কতদূর সত্য বলা যায় না, কেননা আঁসেলকে লেখা একটি 'বিদায়পত্র' জ্বানের হাতেই পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিলো: 'আমি আর বেঁচে থাকতে পারছি না ব'লেই আত্মহত্যা করছি, ঘুমোতে যাবার আর জেগে ওঠার পরিশ্রম অসহ্য হ'য়ে উঠেছে আমার পক্ষে।... আমার যা-কিছু আছে, আসবাবপত্র, আমার পোর্ট্রেটটি (কোনটি জানা যায় না)

—সব দিয়ে যাচ্ছি মাদমোয়াজেল লেমেরকে (দ্যুভালের নামান্তর), কেননা সে-ই একমাত্র মানুষ যার মধ্যে আমি কিছু শান্তি পেয়েছি, কিছু বিশ্রাম।··· আমার মা, যিনি ইচ্ছে না-ক'রে বার-বার আমার জীবন বিষাক্ত করেছেন, আমার অর্থে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই ; তাঁর আছে স্বামী, আছে একজন মানুষ, আছে স্নেহ ও বন্ধুতা। আর জ্বান লেমের ছাড়া আর-কেউ নেই আমার। শুধু তার মধ্যেই আমি শান্তি পেয়েছি।···'

কুর্বে-কৃত বোদলেয়ারের প্রতিকৃতি আনুমানিক এই সময়ের।

১৮৪৫-এর আর-একটি ঘটনা উল্লেখ্য : আসলিনো-র সঙ্গে আমাদের কবির বন্ধুতার সূত্রপাত। আসলিনো, অত্যন্ত মৃদু-মানুষ, নিজে বিশেষ লিখতেন না বা লিখলেও লুকিয়ে রাখতেন, কিন্তু তাঁর জীবনের অক্ষয় প্রেম ছিলো কবিতা, সত্যিকার রসজ্ঞ ছিলেন। এই সময় থেকে বোদলেয়ারের মৃত্যু পর্যন্ত, তাঁর অনুরাগ ও সাহচর্য ছিলো অফুরান ; বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোদলেয়ারকে কখনো ঈর্ষা করেননি। এই দু-জনের বন্ধুতা দেখে বাঁভিল পদ্য লিখলেন :

'On voit le doux Asselineau
Près du farouche Baudelaire.'

(ঐ দ্যাখো—বন্য বোদলেয়ার, আর তার পাশে কোমল আসলিনো।)

১৮৪৬ : আরো তিনটি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লো ; শাঁদালের অনুসরণে 'প্রণয়কথা' প্রকাশ করলেন, সেটি বর্তমানে 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র অন্তর্ভূত আছে। আমরা লক্ষ করি যে যদিও তখন তাঁর বহু কবিতা রচিত হ'য়ে গেছে, প্রকাশিত হচ্ছে খুবই ক্ষীণ পরিমাণে ; তার কারণ হয়তো সম্পাদকদের আনুকূল্যের অভাব, হয়তো তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা, বা তাঁর ধারাবাহিক 'দুরদৃষ্ট'। 'তরুণ মায়াবী' নামে একটি বড়ো গল্প ছাপালেন ; সেটি, কিছুকাল পূর্বে জানা গিয়েছে, এক অখ্যাত ইংরেজ লেখকের রচনার, স্বীকার না-ক'রে, হুবহু অনুবাদ। এ-বছরের চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা ছাপা হ'লো। হোফমান্-এর 'ক্রাইজ্‌লেরিয়ানা' (Kreisleriana) নামক গল্প প'ড়ে প্রতিসাম্য বা করেসপঁদাস-এর ধারণা জন্মালো তাঁর মনে।

১৮৪৭ : 'লা ফাঁফার্লো' (*La Fanfarlo*), কথাসাহিত্যে বোদলেয়ারের

একমাত্র প্রচেষ্টা, প্রকাশিত হ'লো। এই কাহিনীতে প্রবেশ করেছে তাঁর হোটেল পিমদাঁর জীবন, সেই সময়েই রচনা আরম্ভ করেন। মা-র কাছে একটি চিঠিতে লিখলেন: 'আমি এখনো বিশ্বাস করি যে ভাবীকাল আমার জন্ম ভাবিত।'

'লা ফাঁফার্লো'র নায়কের নাম স্যামুয়েল ক্রেমার। নামত সে ইংরেজ, ব্যক্তিত্বে ফরাশি, আর চরিত্রে তার স্রষ্টারই প্রতিচ্ছবি। যে-অভিনেত্রীর সে প্রেমে পড়েছে তার নাম ফাঁফার্লো। প্রণয়িনী বিবসনা হ'লে সে সহ্য করতে পারে না; চায় রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র সাজসজ্জা, অঙ্গরাগটুকু না-থাকলেও কুপিত হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ, বোদলেয়ারের মতোই, সে প্রকৃতির স্বভাবশত্রু।

এই বছর, প্যারিসের এক থিয়েটারে, 'কনককেশিনী সুন্দরী' নামক নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রে খ্যাতিলাভ করলেন ঊনবিংশবর্ষীয়া মারী দোব্রঁা (Marie Daubrun)। তাঁর নিজের ছিলো সোনালি চুল, চোখ সবুজ। বোদলেয়ার, তাঁর জ্ঞানের প্রতি প্রেমে তখন ভাঙন ধরেছে, এই অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচিত হলেন।

১৮৪৮: ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব। 'আমার '৪৮-এর উন্মাদনা!' দ্বিতীয় রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৫ থেকেই প্যারিসের তরুণ লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে একটি বিপ্লবী বোহিমীয় দল গ'ড়ে উঠছিলো, তার নেতা ছিলেন চিত্রকর কুর্বে (Courbet)। বোদলেয়ার কিছুকালের জন্ম এই দলে মিশেছিলেন, কুর্বে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই সুযোগে, দরিদ্রের জীবন প্রথম তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে: কুর্বে কৃষকসন্তান, কবি দ্যুপঁ (Dupont) মজুরপুত্র, ম্যুর্জে'র (Murger)-এর পিতা দ্বাররক্ষক। খাঁটি বোহিমীয় তারা, স্নান করে না, কাপড় কাচে না, ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শালীনতাকে এড়িয়ে চলে;—এ-সব বিষয়ে বোদলেয়ার এঁদের বিপরীত, তবু এঁদের সঙ্গে স্বল্পকাল মেলামেশার ফলে বোদলেয়ারের মনে ধরা পড়েছিলো জীবনের অন্য একটি স্তর, যাকে তিনি, দরিদ্র, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও অন্ত্যজদের বিষয়ে তাঁর কবিতাবলিতে, নিজস্ব ও নতুন অর্থে মহিমান্বিত করেন।

কুর্বে-র সঙ্গে বোদলেয়ারও বিপ্লবে মেতেছিলেন; জীবনে এই একবার, ক্ষণকালের জন্ম যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। ২৪ ফেব্রুয়ারি

তারিখে, প্যারিসে যখন দাঙ্গা চলছে, বোদলেয়ারকে রাস্তায় দেখা গেলো নতুন একটা বন্দুক হাতে নিয়ে পাগলের মতো ছুটতে-ছুটতে চীৎকার করছেন: 'জেনারেল ওপিককে বধ করা চাই! চলো, জেনারেল ওপিককে গুলি ক'রে আসি!' অক্টোবর মাসে যখন সংবিধানপত্র রচিত হ'লো, এত রক্তপাতের পরেও আবার জয়ী হ'লো রক্ষণশীলতা, তখন বোদলেয়ার ও অন্যান্য সাহিত্যিকরা মোহমুক্ত হলেন, রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ স'রে এসে যথাস্থানে জীবন উৎসর্গ করলেন। তিন বছর পরে, লুই-নেপোলিয়ন যখন সমারূঢ়, বোদলেয়ার এক চিঠিতে লিখলেন: 'আমি যদি কাউকে ভোট দিই, নিজেকে ছাড়া কাউকেই দেবো না।'

১৮৪৮ বিষয়ে পরবর্তী জীবনে বোদলেয়ার যা লিখেছিলেন তা 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি' থেকে উদ্ধৃত করি:

'১৮৪৮-এ আমার বন্য উত্তেজনা।

সেই উত্তেজনার প্রকৃতি কী ছিলো?

প্রতিহিংসার স্বাদ। ধ্বংসের স্বাভাবিক সুখ। সাহিত্যিক উত্তেজনা; আমার পঠনপাঠনের স্মৃতি।

১৫ই মে। ধ্বংসের সুখ এখনো। যদি স্বাভাবিকমাত্রই সংগত হয় তাহ'লে এই সুখও সংগত।

জুন মাসের বিভীষিকা। জনগণের মত্ততা, বুর্জোয়াদের মত্ততা। দুষ্ক্রিয়ার স্বাভাবিক সুখ…[তারপর] আর-এক বনাপার্ট! কী কলঙ্ক!…

১৮৪৮-এর আমোদ: একমাত্র কারণ প্রত্যেক মানুষের নিজ-নিজ ইউটপিয়ার আকাশ-প্রাসাদ।

১৮৪৮-এর আকর্ষণ। একমাত্র কারণ হাস্যকরের আতিশয্য।…

বিপ্লব, বলিদান ক'রে, কুসংস্কারের সমর্থন করে।…

প্রগতিতে বিশ্বাস,…তার অর্থ ব্যক্তি তার নিজের কর্মসম্পাদনের জন্য প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করছে।

সত্যিকার প্রগতি (সত্যিকার, মানে নৈতিক)—তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু ব্যক্তির ভিতরে, একান্তভাবে তার নিজের চেষ্টায়।…

এমনও অনেক লোক আছে যারা গড্ডলিকায় ব্যতীত সুখভোগ করতে পারে না। প্রকৃত বীর একা-একা সুখভোগ করেন।

ভ্যাণ্ডির চিরন্তন শ্রেষ্ঠতা।'

ফ্লোবেয়ারের *Sentimental Education* উপন্যাসে এই বিপ্লবের দীর্ঘায়িত বর্ণনা আছে।

১৮৪৯-৫০ : বোদলেয়ার-জীবনীর এই দু-বছরের ইতিবৃত্ত এখনো কিছুটা অস্পষ্ট আছে। এ-সময়ে, একটি পত্রিকা-সম্পাদনার ভার নিয়ে তিনি দিজ্‌ঁ শহরে যান, সেখানে যাবার আর-একটি উদ্দেশ্য হ'তে পারে ইজ়াবেল ম্যনিয়ে (Isabelle Meunier)-র সঙ্গে সাক্ষাৎ, যিনি ফরাশি ভাষায় পো-র গল্প ('কালো বিড়াল') প্রথম অনুবাদ করেন। এডগার পো-র রচনার সঙ্গে বোদলেয়ার কবে প্রথম পরিচিত হন তা সঠিকভাবে জানা যায় না, কিন্তু ১৮৬০ সালে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, '১৮৪৬ বা ১৮৪৭-এ আমি প্রথম পো-র কয়েকটি খণ্ডরচনা পড়েছিলাম —আশ্চর্য সেই অভিভূতি!' যদিও এখন পর্যন্ত পো-তে তেমন মগ্ন হননি, ১৮৪৮ সালেই পো-র 'মেসমেরীয় উন্মীলন' গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটি তাঁর প্রথম পো-অনুবাদ।

১৮৫০ : প্যারিসে প্রত্যাবর্তন। দুটো আলাদা বাসা আর চালানো যাচ্ছে না; জ়ানের সঙ্গে এক বাড়িতে বাসা বাঁধলেন। দুটি কবিতা ছাপা হ'লো।

১৮৫১ : 'কৃত্রিম স্বর্গে' (*Les Paradis artificiels*)-র প্রথম লেখন, 'সুরা ও সিদ্ধি বিষয়ে' প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, এবং আরো কয়েকটি কবিতা। গ্রন্থাকারে কবিতা প্রকাশের বিজ্ঞাপন বেরোলো; বইয়ের নাম 'লঁ্যাব্‌' (*Limbes* — Limbo)।

২ ডিসেম্বর তারিখে লুই-নেপোলিয়নের 'রাষ্ট্রাঘাত' সাধিত হ'লো। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আরম্ভ। এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে কার্ল মার্ক্স লেখেন যে যাদের সহযোগে, কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিণাম-স্বরূপ, ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তাদের মধ্যে ছিলো 'গাঁটকাটা, ছাড়া-পাওয়া কয়েদি, পেশাদার ভিখিরি, তাসের জোচ্চোর, ভেলকিওলা, বেশ্যার দালাল, বেশ্যার বাড়িওলা, মুটে, সাহিত্যিক, আর্গিনবাজিয়ে, ন্যাকড়া-কুড়োনি, ছুরি-শানিয়ে আর টিনের কামার।' এই তালিকায় সাহিত্যিককে যেখানে স্থান দেয়া হয়েছে তাতে মার্ক্স-এর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫২ : বোদলেয়ার প্রকৃত অর্থে পো-কে আবিষ্কার করলেন, জীবনব্যাপী আসক্তির সূচনা হ'লো। সম্ভবত বিদেশী লেখক তাঁর বিষয়ে কিছুই

প্রায় জানেন না; সন্ধান ক'রে-ক'রে অস্থির ক'রে দেন বন্ধুদের, আর-কোনো বিষয়ে চিন্তা করা বা কথা বলা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। কথ্য ইংরেজিতে দখল বাড়াবার জন্য এক শস্তা পানশালায় ব'সে থাকেন—প্যারিসবাসী ইংরেজ ধনীদের ভৃত্যেরা আড্ডা দেয় সেখানে, তাদের সঙ্গে আলাপ করেন, 'পাক'-ধরনের রসিকতারও রসজ্ঞ হবার চেষ্টা করেন। পো-র বিষয়ে একটি প্রবন্ধে এবং গল্পের অনুবাদে হাত দিলেন প্রায় একই সময়ে। মৌলিক রচনার চেষ্টা করলেই অনীহা তাঁকে অভিভূত করে, কিন্তু অনুবাদকর্মে একেবারে উৎসর্গ ক'রে দিলেন নিজেকে। যা-কিছু তাঁর প্রিয়—কাফেতে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব, নিশীথকালে সবান্ধবে নিরুদ্দেশ পদচারণা—সব ত্যাগ করলেন। কোথাও বেরোন না; ঘরের দরজায় বাইরে থেকে চাবি ঝুলিয়ে রাখেন, যাতে বন্ধুরা এলে চেয়ার ছেড়ে উঠতে না হয়। বন্ধুরা আসেন মাঝে-মাঝে, তাঁকে কাজে নিবিষ্ট দেখে ফিরে যান, বোদলেয়ার জানতেও পারেন না। একবার, এক 'বিখ্যাত মার্কিন লেখক' প্যারিসে এসেছেন শুনে, ছুটে গেলেন দেখা করতে। পো-র স্বদেশবাসীটি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন স্যুটের পরীক্ষায় রত। বোদলেয়ার, ভ্রূক্ষেপমাত্র না-ক'রে, গেঞ্জি আর পাৎলুন-পরা লেখকটিকে নানা প্রশ্নে জর্জর করলেন। অবশেষে উত্তর পেলেন যে পো এমন কোনো লেখক নন যাঁকে নিয়ে কোনো ভদ্র ব্যক্তি মাথা ঘামাতে পারেন। তত্রাচ, বোদলেয়ারের ৪০-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ এই বছরেই প্রকাশিত হ'লো।

বোদলেয়ারের এই প্রবন্ধের প্রায় অর্ধেক তাঁর নিজস্ব নয়। পো যে-পত্রিকায় কিছুকাল কাজ করেছিলেন, সেই 'সাদার্ন লিটেরেরি মেসেঞ্জার'-এর প্যারিসীয় প্রতিনিধির কাছ থেকে ঐ পত্রিকার কয়েকটি পুরোনো সংখ্যা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি; তার একটি সংখ্যায় (মার্চ, ১৮৫০) প্রকাশিত জন এম. ড্যানিয়েলের প্রবন্ধ থেকে প্রভূতভাবে আহরণ বা হরণ করতে হয়েছিলো। 'হয়েছিলো', কেননা পো-র বিষয়ে আর-কোনো উপাদান ছিলো না তাঁর হাতের কাছে (প্রায় কোনোখানেই ছিলো না), অথচ পো-র মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার আবেগ ছিলো অদম্য। বোদলেয়ারের প্রবন্ধটিকে আমরা সারত মৌলিক বলতে বাধ্য, আর তা শুধু এইজন্যে নয় যে তার অর্ধাংশ তাঁর স্বকীয়। পো সেখানে যে-ভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন, তা মার্কিন

লেখকের কল্পনার মধ্যে ছিলো না। বোদলেয়ারের পণ—'আমি পো-কে ফ্রান্সের এক মহাপুরুষ ক'রে তুলবো'—এই প্রবন্ধ সেই পণরক্ষার প্রথম সোপান। পো-র জীবনে ও রচনায় তিনি দেখেছিলেন 'দুরদৃষ্ট দ্বারা তাড়িত এক সাহিত্যিক মাতাল', তাঁদেরই একজনকে, যাঁরা 'আমাদের জন্ম বহু দুঃখ ভোগ করেন'; আসল কথা, নিজেকেই দেখেছিলেন। ১৮৬৪ সালে, যখন মানে-র কোনো ছবিকে গইয়ার অনুকরণ বলা হয় আর মানে জবাব দেন যে গইয়ার ছবি তখনো তিনি দ্যাখেননি, সেই প্রসঙ্গে বোদলেয়ার এক বন্ধুকে লেখেন যে প্রকৃতিতেই একরকম 'গাণিতিক সাদৃশ্য' বিরাজ করে। তারপর :

'আচ্ছা, লোকে কি বলে না আমি এডগার অ্যালান পো-র অনুকারক? আর তুমি কি জানো কেন, অমন অসীম ধৈর্য নিয়ে, আমি পো-র অনুবাদ করেছিলাম? তার কারণ, পো যে আমারই মতো! প্রথমবার তাঁর বই যখন খুলি, আমি, বিস্ময়ে ও পুলকে বিহ্বল হ'য়ে, সেই মুহূর্তেই দেখতে পেয়েছিলাম যে আমি যে-সব বিষয় কল্পনা করেছি—শুধু তা-ই নয়, যে-সব বাক্যবন্ধ রচনা করেছি মনে-মনে—সেই সবই ইনি কুড়ি বছর আগে লিখে গেছেন।'

বোদলেয়ারের জীবনে এডগার পো-র প্রধান অবদান এই যে বোদলেয়ার যখন, নিজের সাহিত্যিক অসাফল্যে, হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন, তখন পো-র রচনা তাঁর উৎসাহ ও মনস্বিতাকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে। যেন ভগবান ও মানবের মধ্যে এক 'মধ্যবর্তী' দূত দেখা দিলেন। সেইভাবেই পো-কে দেখতেন বোদলেয়ার; 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে লিখেছেন: 'প্রতি প্রভাতে প্রার্থনা ভগবানের কাছে, যিনি সব ক্ষমতা ও সুবিচারের উৎস, প্রার্থনা আমার পিতার কাছে, মারিয়েৎ-এর (পরিচারিকা) কাছে, এবং পো-র কাছে, তাঁরা যেন আমার জন্ম দৌত্য করেন, শক্তি দেন আমাকে···।' কিন্তু এ-কথা স্মর্তব্য যে বোদলেয়ারের কবিতায় পো-র প্রভাব দেখতে যাওয়া একেবারেই ভুল হবে, কেননা প্রথম সংস্করণ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর প্রায় সব কবিতা এর আগেই লেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর জীবদ্দশায় পাঠকসাধারণের মধ্যে বোদলেয়ারের যেটুকু খ্যাতি ছিলো তা, তাঁর শিল্পসমালোচনা ও পো-অনুবাদের জন্ম, কবিতার জন্ম নয়। নিজেও সগর্বে নিজের পরিচয় দিতেন পো-র অনুবাদক ব'লে। তাছাড়া,

এই পাঁচ খণ্ড অনুবাদের দ্বারাই বলবার মতো কিছু উপার্জন হয়েছিলো তাঁর।

প্রায় একই সময়ে, আরো দু-জনের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিলো: জুসেফ দ্য মেস্ত্র্ (Joseph de Maistre) ও সোয়েডেনবর্গ। দ্য মেস্ত্র্ (১৭৫৪-১৮২১) ছিলেন দার্শনিক ও কূটনীতিজ্ঞ, আঠারো শতকী যুক্তিবাদের তাঁর চেয়ে বড়ো শত্রু ফ্রান্সে আর ছিলো না। তিনি ধর্মগুরু পোপের অধীনে একীভূত জগৎ কল্পনা করেছিলেন, ভূপতিদের সেখানে স্বকীয় অধিকার নেই। প্রজাতন্ত্রের প্রতি বোদলেয়ারের সাময়িক উৎসাহ এঁর রচনাপাঠে নির্বাপিত হয়। ('জুসেফ দ্য মেস্ত্র্ ও পো আমাকে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন'—'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'।) এমান্থয়েল সোয়েডেনবর্গ (Emanuel Swedenborg) (১৬৮৮-১৭৭২) তাঁর দীর্ঘ জীবনের অর্ধকাল ছিলেন বৈজ্ঞানিক, তারপর একটি নূতন ধর্মতত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তাঁর নিজের উক্তি অনুসারে, তাঁর সামনে স্বর্গ খুলে গিয়েছিলো, তাঁকে পরামর্শ দিতেন দেবদূতগণ, বাইবেলের প্রকৃত অর্থ একমাত্র তিনিই বুঝেছিলেন। তাঁর নামে নূতন কোনো সম্প্রদায় স্থাপিত হয়নি—সে-অভিপ্রায়ও তাঁর ছিলো না; কিন্তু যেহেতু তিনি পরমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর প্রভাব অনেক কবিতে লক্ষণীয়। এঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বোদলেয়ার পরিচিত হন বালজাক-এর 'মিস্টিক' উপন্যাসত্রয়ের সাহায্যে। আর তাঁর নিজের মনেই যে অলৌকিকের দিকে উন্মুখতা ছিলো, 'প্রতিসাম্য' বা 'পূর্বজন্ম' কবিতাই তার প্রমাণ দেয়।

আগের বছর গোতিয়ে, মাক্সিম দ্যু কাঁ, আর্সেন উসে প্রভৃতি বন্ধুরা 'রেভ্যু দ্য পারী' নামক পত্রিকাটি কিনে নিয়েছিলেন। বোদলেয়ারের আশা হ'লো এতদিনে তাঁর কবিতা সসম্মানে ছাপা হ'তে পারবে। দুই কিস্তিতে বারোটি কবিতা গোতিয়েকে পাঠালেন, তার মধ্যে কয়েকটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—যেমন 'প্রভাত', 'সন্ধ্যা', 'লাল চুলের ভিখারিনীকে', 'গরিবের মৃত্যু' ও 'সিথেরায় যাত্রা'। সঙ্গের পত্রটি প্রায় কোনো নবীন কবির মতো বিনীত। দুটিমাত্র কবিতা ছাপা হ'লো। গোতিয়ে তখন সম্প্রতি *Emaux et Camées* প্রকাশ করেছেন, বয়েলের অন্তর্ধানের পর স্বাধিকারে সাহিত্যনায়ক হয়েছেন, বোদলেয়ারের খ্যাতি হয়তো তাঁকে আর তেমন সুখ দেয় না। দ্যু কাঁ-কে বলেছিলেন: 'আজকাল

সবাই শাসাচ্ছে আমাদের—বোদলেয়ারের কবিতা ছাপা হ'লে ম্যুসে, লাপার, আমি, সবাই নাকি ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে যাবো। বিশ্বাস করি না—পেত্রুস বরেলের যেমন তাক ক্ষণকালো, বোদলেয়ারেরও তেমনি হবে।' আর দ্যু কাঁ, যাঁকে বোদলেয়ার তাঁর 'ভ্রমণ' উৎসর্গ করেছিলেন, ১৮৮৩ সালে লিখেছিলেন যে বোদলেয়ার উপেক্ষণীয় নন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে সসম্মান আসন তাঁর প্রাপ্য। অথচ ততদিনে তরুণ ফরাশি কবিরা বোদলেয়ারকে 'দেবতা'র আসন দিয়েছে, ইংলণ্ডেও তাঁর খ্যাতি পৌঁছতে দেরি নেই। সাহিত্যের ইতিহাস এমনি কৌতুকময়।

ইতিমধ্যে বোদলেয়ার জ্ঞান দ্যুভালকে ত্যাগ করেছিলেন—তাঁর নিজের ধারণায়, 'চিরকালের মতো'। নিঃসঙ্গতা যখন অসহ্য হ'য়ে উঠলো, পরবর্তী কালের প্রখ্যাত এক পত্রে মারী দোব্রাঁকে প্রেমনিবেদন করলেন। কিন্তু মারীর দেখা গেলো বাঁভিলের দিকে ঝোঁক। ঠাণ্ডা ডিসেম্বরে এই অসুখী, অনিকেত, ঋণাক্ত কবি অন্য এক আশ্রয় খুঁজলেন: মাদাম সাবাতিয়ে।

এক ফরাশি ভিকেঁৎ-এর অবৈধ সন্তান এই মহিলা। বয়সে বোদলেয়ারের এক বছরের ছোটো, অসামান্য রূপসী, বহু শিল্পীর মডেল, এক ধনী ব্যবসায়ীর রক্ষিতা। কেশ তাঁর তাম্রবর্ণ, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল, স্বভাব সদাসহাস্য, হৃদয় অকৃপণ ও বন্ধুবৎসল। বাড়িতে ডাকেন প্রতি রবিবারে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আসর: দ্যুমা, গোতিয়ে, ফ্লোবেয়ার প্রভৃতি নানা বয়সের নামজাদারা আসেন, তেমন নামজাদা যাঁরা নন তাঁদের প্রতিও আতিথ্যে কোনো ত্রুটি হয় না। 'মাদাম সাবাতিয়ে' তাঁর স্বদত্ত উপাধি, বিবাহিতা 'মাদাম' তিনি কখনোই হননি। সবাই ডাকেন আপলনী, গোতিয়ে বলেন 'সভানেত্রী' (La Presidente)—অর্থাৎ 'মক্ষিরানী'; বোদলেয়ার-প্রসঙ্গে উত্তরকালে তাঁর নাম হয়েছে 'শ্বেত ভেনাস'। হোটেল পিমদাঁর যুগে বোদলেয়ার চিনতেন তাঁকে, এবার মাঝে-মাঝে তাঁর রবিবারে আসতে লাগলেন। মনে-মনে তাঁকে যে-ভাবে রচনা ক'রে নিলেন, তাতে মানবীয় কিছু রইলো না: ম্যাডোনা তিনি, তিনিই সরস্বতী ও দেবদূত। দুই বছরে এক গুচ্ছ কবিতা লিখলেন তাঁর উদ্দেশে: প্রথমটি তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ৯ ডিসেম্বর তারিখে। বেনামিতে পাঠালেন, হস্তাক্ষর গোপন ক'রে। সঙ্গে চিঠিতে প্রতিশ্রুতি: 'এই প্রেমিক দাস কখনো তার মনের কথা ব্যক্ত করবে

না।' কিছুদিন পরে আর-একটি কবিতা। এইভাবে কিছুদিন চললো।

আপলনীর উদ্দেশে গোতিয়েরও একাধিক কবিতা আছে; তাদের সুর চপল ও হাস্যস্ফূরিত। 'একটি রক্তবাসের প্রতি' কবিতার শেষ পঙক্তিতে কবি অভীষ্টাকে চুম্বনের বসন পরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আর-একটি কবিতার শিরোনামা 'আপলনী', তার প্রথম স্তবক এই রকম:

আমি ভালোবাসি তোমার আপলনী নাম, পুণ্যময় গ্রীক উপত্যকার তা প্রতিধ্বনি, তারই সবল ছন্দ তোমার নামকরণ করেছে আপোলোর বোন।

১৮৫২-৫৫: পো-অনুবাদের সমাপ্তি। ১৮৫৬ ও '৫৭-এ গ্রন্থাকারে দুই খণ্ড প্রকাশিত হ'লো (*Les Histoires extraordinaires* ও *Les Nouvelles histoires extraordinaires*)। দ্বিতীয়টিতে পো-র বিষয়ে একটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করলেন। আরো তিন খণ্ড বেরোলো ১৮৫৮, '৬৩ ও '৬৫-এ। পো-র চারটি মাত্র কবিতা বোদলেয়ার অনুবাদ করেছিলেন: 'The Raven' (গদ্যে), 'To My Mother', 'The Haunted Palace' ('The Fall of the House of Usher' গল্পের অংশ), ও 'The Conqueror Worm' ('Ligeia' গল্পের অংশ)। সমালোচনায় সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় চলছে।

১৮৫৪: মারী দোব্রাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ; এবারে, স্বল্পকালের জন্য প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লো দু-জনের মধ্যে। যদিও নিজের চালচুলো নেই, প্রতিপত্তিও নামমাত্র, বোদলেয়ার রঙ্গজগতে মারীর উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলেন; সাংবাদিক বন্ধুদের পিড়াপিড়ি করলেন মারীর অভিনয়ের গুণগান করতে; যে-জর্জ্ সাঁ-কে 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে 'বিষ্ঠাগার' বলেছিলেন, তাঁকে আবেদন জানালেন মারীকে তাঁর নাটকে ভূমিকা দেবার জন্য। এ-সব চেষ্টায় কোনোই ফল হয়নি; মারীর জন্য 'মাতাল' নামে যে-নাটকটি লিখতে শুরু করেন তাও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েই থেমে গেলো। কিন্তু, 'সবুজ ভেনাসে'র সঙ্গে কবির এই সম্বন্ধ সফলতা ও স্থায়িত্ব পেলো কয়েকটি দ্যুতিময় কবিতায়: অতুলনীয় 'সুন্দর জাহাজ' তার প্রথম।

এই বছরেই ৮ মে তারিখে 'শ্বেত ভেনাস'কে তাঁর শেষ অর্ঘ্য পাঠিয়েছিলেন: হৃদয়দ্রাবী 'স্তব' কবিতাটি, যে-রকম শান্ত, নম্র ও ভক্তিরসাপ্লুত কবিতা বোদলেয়ারের অল্পই আছে। তারপর আকস্মিক-ভাবে বন্ধ হ'য়ে গেলো এই পত্রচালিত অনামী নিবেদন: তার কারণ,

সহজেই বোঝা যায়, মারী দোব্রাঁর সংসর্গলাভ। তিন বছরের মধ্যে মাদাম সাবাতিয়েকে আর পত্র পাঠাননি।

১৮৫৫ : রক্ষণশীল রোমান্টিকতার মুখপত্র ছিলো 'দুই জগতের পত্রিকা' (*Revue des deux mondes*); তার সম্পাদক, একটি সতর্ক মুখবন্ধে দায়িত্ব পরিহার ক'রে, বোদলেয়ারের আঠারোটি কবিতা একসঙ্গে প্রকাশ করলেন। 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল' নামটি এই গুচ্ছেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে ছিলো 'সিথেরায় যাত্রা', 'পিশাচীর রূপান্তর', 'বৈপরীত্য', 'ধ্বংস', 'আধ্যাত্মিক উষা'—সর্বোপরি, 'পাঠকের প্রতি'। 'ল্য ফিগারো'তে একটি হিংস্র আক্রমণ ছাপা হ'লো। যে-কুখ্যাতি কবিকে আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে তার সূত্রপাত এখানেই।

এই ঘটনার মাস দুই পরে বোদলেয়ার অন্য দিক থেকে আঘাত পেলেন। মারী দোব্রাঁ, স্বদেশে কোনো কাজ না-পেয়ে, এক ভ্রাম্যমাণ দলের সঙ্গে ইটালিতে গিয়েছিলেন; ফিরে এলেন অগস্ট মাসে। মারীর কাছে বোদলেয়ার যা চেয়েছিলেন তা শুধু ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নয়; 'একখানি বাসা'র জন্যও তাঁর মনে হাহাকার ছিলো—তাঁর তৎকালীন অবস্থায় সে-ক্ষুধা আরো তীব্র হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর 'আশা'কে রূপও দিয়েছিলেন কবিতায়, মারীর কাছে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, 'শান্তি, বিলাস ও শৃঙ্খলা', 'দয়িতা ও ভগ্নী' ব'লে ডেকে-ছিলেন তাঁকে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, মারী তাঁর 'ল্যুক্স, কাল্‌ম্‌ এ ভল্যুপ্তে' যাঁকে উপহার দিলেন তিনি বোদলেয়ার নন, বাঁভিল। বাঁভিল অসুস্থ তখন, স্নেহ ও শুশ্রূষার জন্য কাতর, এবং নারীহৃদয়ে দুর্বলের প্রতি আকর্ষণ বেশি। তাছাড়া, বোদলেয়ারের সাহিত্যিক কুখ্যাতিও হয়তো তাঁকে বিমুখ করেছিলো। বোদলেয়ার, মারীর আশায়, প্যারিসে যে-নতুন বাসা নিয়েছিলেন, তাতে আবির্ভূত হলেন জ়ান দ্যুভাল। প্রথম দুটি গদ্যকবিতা ('গোধূলি' ও 'নিঃসঙ্গতা') প্রকাশিত হ'লো।

১৮৫৬ : সাঁৎ-ব্যভকে অনুনয় জানালেন প্রথম খণ্ড পো-অনুবাদের সমালোচনার জন্য; সাঁৎ-ব্যভ কথা দিয়ে কথা রাখলেন না। প্রকাশক পুলে মালাসী (Poulet Malassis)-র সঙ্গে 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। জ়ান দ্যুভাল তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেলেন; বোদলেয়ার শোকে আত্মহারা। মা-কে লিখলেন, '... আমার চোদ্দ বছরের সঙ্গিনী জ়ান আমাকে ছেড়ে গেছে। ... আমার একমাত্র বন্ধু ছিলো ঐ নারী, একমাত্র

সুখ ও বিনোদ। তার উপর আমি স্থাপন করেছিলাম আমার সর্বস্ব আশা, জুয়াড়ির মতো। ··· অন্য যে-কোনো কথা ভাবতে যাই, শাশ্বত এক প্রশ্ন জেগে ওঠে : কী হবে ? ··· আমি সাতদিন ঘুমোইনি, সারাক্ষণ বমি করেছি। অবিরাম কেঁদেছি ব'লে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ··· দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে অফুরন্ত বৎসরের ধারা—বন্ধু নেই, পরিবার নেই, প্রণয়িনী নেই—শুধু কষ্ট আর নিঃসঙ্গতায় ভরা বছর-গুলি—কিছু নেই, যা আমার হৃদয়কে ভরাতে পারে। এমনকি আমার গর্ব আর সান্ত্বনা দিতে পারে না আমাকে—আমারই দোষ, আমি তাকে যন্ত্রণা দিয়ে সুখ পেয়েছি—বিনিময়ে এখন যন্ত্রনা পাচ্ছি নিজে। ···'

১৮৫৭ : ২৫ জুন : পাঁচমাসব্যাপী তৃপ্তিহীন প্রুফ দেখার পরে, একশোটি কবিতা নিয়ে 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল' প্রকাশিত হ'লো। ১০০০ কপি ছাপা হ'লো, দাম ২ ফ্রাঁ, লেখক প্রায় ১২½% রয়্যালটি পাবেন। (কোনো-এক রহস্যময় কারণে, 'আলবাট্রস' ও 'স্তব' এই সংস্করণে ছাপা হয়নি।) স্বদেশে ও বিদেশে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কবিকে বই উপহার পাঠালেন বোদলেয়ার : ইংলণ্ডে টেনিসন, এমনকি আমেরিকায় উইলিস পর্যন্ত বাদ গেলেন না।

গ্রন্থটি, সকলেই জানেন, তেয়োফিল গোতিয়ে-কে উৎসর্গিত। উৎসর্গপত্রে বোদলেয়ার প্রথমে স্বীয় রচনার বর্ণনা দেন 'বিষাদ ও দুক্রিয়ার একটি শোচনীয় অভিধান' ব'লে, কিন্তু গোতিয়ে-র অপছন্দ হওয়াতে বদল করেন। সম্পূর্ণ উৎসর্গটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

নিষ্কলঙ্ক কবি

ফরাশি সাহিত্যের পরম জাদুকর

আমার অতি প্রিয়, অতি শ্রদ্ধেয়

গুরু ও বন্ধু

তেয়োফিল গোতিয়ে-কে

গভীরতম বিনয়ের

অনুভূতিসমেত

এই দূষিত পুষ্পগুচ্ছ

উৎসর্গ করলাম

শা. বো.

বইয়ের নামকরণ বোদলেয়ার নিজে করেননি। তিনি প্রথমে

ভেবেছিলেন 'লেসবিয়েন' (*Lesbiennes*), তারপর 'ল্যাব্', কিন্তু কিছু দিন আগে দ্বিতীয় নামের অন্য একটি বই বেরিয়ে যায়। সমালোচক ইপলিৎ বাবু (Hippolyte Babou) একদিন কাফেতে ব'সে এই নাম প্রস্তাব করেন।

৫ জুলাই : 'ল্য ফিগারো'-র সমালোচক লিখলেন : 'মানবহৃদয়ে যা-কিছু পচা, মানবচিত্তে যা-কিছু নিঃসার, এই পুস্তক আত্মন্ত তারই সংকলন।' ১২ তারিখে একই পত্রিকায় আর-একটি বিষময় প্রবন্ধ। 'জুর্নাল দ্য ব্রুসেল' নখদন্তময় আক্রমণ করলেন। ১৬ তারিখে আইনের যন্ত্র সচল ; 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সমুদয় সংস্করণ ধৃত হবার আদেশ বেরোলো।

বোদলেয়ার তাঁর 'খুড়ো ব্যভ'-এর শরণাপন্ন হলেন। স্যাঁৎ-ব্যভ তখন আকাদেমির সভ্য ; সরকারি পত্রিকা 'ল্য মনিত্যর' (*Le Moniteur*)-এর সম্পাদক। বোদলেয়ার তাঁকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। পো-অনুবাদ প্রতি খণ্ডের সমালোচনা প্রার্থনা করেছেন তাঁর কাছে, একবারও সফল হননি। 'তুমি সাহিত্যের সুদূর কামস্কাটকা জয় করেছো'—এ-কথা যিনি চিঠিতে একবার লিখেছিলেন, তিনি বোদলেয়ারের প্রতিভা বিষয়ে অন্ধ ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু স্যাঁৎ-ব্যভ বহু যুদ্ধ ক'রে জীবনে 'উন্নতি' করেছেন ; তিনি কি পারেন এক দুর্নামগ্রস্ত দুর্ভাগ্যপীড়িত কবিকে লোকসমক্ষে সমর্থন ক'রে তাঁর নিজের পদ বিপন্ন করতে ? এই পাপের সংসারে, যেখানে ক্ষুধা আছে, সন্তান আছে, আছে মারাত্মক যৌন আকর্ষণ, সেখানে ক-জন পারে সব সময় মনের কথা স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে ? আপোশ ভিন্ন সংসারে টেকা যায় না, আর আপোশ মানেই কপটতা। যারা কপটতায় অভ্যস্ত হ'তে পারে না, তাদেরই জীবন, বোদলেয়ারের মতো, দগ্ধতায় পর্যবসিত হয়। স্যাঁৎ-ব্যভ, যৌবনে রোমান্টিক কবিতা লিখে থাকলেও, প্রৌঢ়ত্বে স্থিতধী হয়েছেন ; অতএব এই সংকটেও মুখ ফুটে একটি কথা বললেন না। উৎসর্গপ্রাপক গোতিয়ে, সম্পাদক দ্যু কাঁ, আর অন্য সব প্রতিপত্তিশীল বন্ধুরা, তাঁদের মধ্যেও একজনকে পাওয়া গেলো না যিনি বোদলেয়ারের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে রাজি। সপ্রশংস সমালোচনা লিখলেন একমাত্র বার্বে দোর্ভী, 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর 'গোপন স্থাপত্যে'র প্রথম আবিষ্কারক তিনি ; আর ফ্লোবেয়ার ১৩ জুলাই তারিখের একটি চিঠিতে বোদলেয়ারকে লিখলেন যে 'ফ্ল্যর

হ্যু মাল' 'রোমাণ্টিকতাকে নবযৌবন দিয়েছে, কেননা তার রচনাশিল্প মর্মরের মতো কঠিন আর ইংলণ্ডের কুয়াশার মতো সর্বভেদী।' আর শেষ মুহূর্তে সঁ্যাৎ-ব্যভ তাঁর এক সহকারীকে দিয়ে 'ল্য মনিত্যর'-এ প্রবন্ধ লেখালেন; তাতে বোদলেয়ারকে দান্তের সঙ্গে তুলনা করা হ'লো।

এ-সবে কোনো ফল হ'লো না; তার কারণটা একটু মজার। কিছুদিন আগেই 'মাদাম বভারি'র বিরুদ্ধে 'অশ্লীলতা'র অভিযোগ আনা হয়েছিলো, কিন্তু সে-মামলা টেকেনি। এবার আভ্যন্তরিক মন্ত্রীমশাই শাস্তিদানে বদ্ধপরিকর; 'ল্য ফিগারো'র প্রবন্ধ তাঁরই প্ররোচনায় লেখা হয়েছিলো। ২০ অগস্ট তারিখে বোদলেয়ার 'আসামি' হ'য়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ: 'দেবনিন্দা' ('ব্লাসফেমি') ও 'অশ্লীলতা'। আদালতে বন্ধুরা উপস্থিত, বুড়ো আঁসেলও না-এসে পারেননি; গ্রীষ্মাবকাশের সুযোগে ভিড় করেছে ছাত্রের দল, অশ্লীলতা উপভোগের আশায় বহু মহিলাও এসেছেন। বোদলেয়ারের পক্ষে যিনি উকিল সে-বেচারা সাহিত্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বুদ্ধিও তেমন ধারালো নয়; গোতিয়ে, ম্যুসে, বেরাঁজের প্রভৃতি খ্যাতিমানদের রচনা থেকে তুলনীয় 'অশ্লীল' অংশ উদ্ধার ক'রে দায় সারলেন তিনি। (এ-বুদ্ধিটা আবার সঁ্যাৎ-ব্যভই দিয়েছিলেন।) এক যুগ পরে, লণ্ডনে হুইসলার-রাস্কিনের মামলায় যেমন বিদ্যুৎ-বিনিময় হয়েছিলো, এখানে তেমন কিছু হ'লো না, বোদলেয়ার সারাক্ষণ শুধু ভিতরে-ভিতরে দগ্ধ হলেন, কিছু বলেছিলেন ব'লে জানা যায়নি। আখেরে, দেবনিন্দার অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তি পেলেন, কিন্তু 'অশ্লীলতা'র জন্য তাঁর জরিমানা হ'লো তিনশো ফ্রাঁ আর প্রকাশকের দু-শো। উপরন্তু, অভিযুক্ত গ্রন্থের ছয়টি কবিতার নির্বাসন-দণ্ড হ'লো: 'অলংকার', 'লিথি', 'অতিশয় লাস্যময়ীকে', 'লেসবস', 'পাতকিনী' ও 'পিশাচীর রূপান্তর'। এই দণ্ড যিনি ঘটালেন, সেই সরকারি উকিলেরই পরামর্শমতো বোদলেয়ার আবেদন পাঠালেন সম্রাজ্ঞী য়ুজেনীর কাছে; তিনি জরিমানার অঙ্ক ৫০ ফ্রাঁতে ধার্য করলেন।

আশ্চর্য এই, ফ্রান্সের মতো সুসভ্য দেশে, এই ছয়টি কবিতার নির্বাসনদণ্ড প্রায় একশতাব্দীকাল বলবৎ ছিলো। যদিও প্রায় সব

সংস্করণেই ক্রোড়পত্ররূপে এই কবিতা ছ-টি মুদ্রিত হ'য়ে এসেছে, আইনত এদের পুনর্বাসন ঘটলো, পঁচিশ বছরব্যাপী সাস্তর প্রচেষ্টার পরে, মাত্র ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে।

মাদাম সাবাতিয়েকে মনে পড়লো এই সময়ে। মামলার দু-দিন আগে, একখানা ভালো কাগজে ছাপা 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে একটি মনোরম চিঠি, নিজের নাম বা হস্তাক্ষর আর গোপন করলেন না এবার। অবিচল ভক্তিনিবেদন করার পরে, বিপদে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন—যদি বা, আপলনীর চেষ্টায়, হাকিম অথবা সরকারি উকিলের আনুকূল্য জাগে। 'আপনাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। এমন সব কবির কথা শুনেছি যাঁরা একটি প্রেমাস্পদ মূর্তির ধ্যান ক'রে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমিও বিশ্বাস করি··· যে প্রতিভার একটি লক্ষণ প্রণয়নিষ্ঠা।··· আপনি আমার কাছে শুধু একটি স্বপ্ন বা যত্নলালিত আদর্শ নন, আপনি আমার কুসংস্কার।··· ফ্লোবেয়ারের সপক্ষে ছিলেন সম্রাজ্ঞী, আমিও কোনো নারীর সাহায্য চাই।··· হয়তো আপনি, কোনো জটিল সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন ক'রে, ঐ মূঢ়দের (হাকিমবৃন্দ) মধ্যে অন্তত একজনের মত বদলাতে পারবেন।··· ৮৪ ও ১০৫ পৃষ্ঠার মধ্যে যে-ক'টি কবিতা আছে, সেগুলোর অধিকারিণী আপনি।' উত্তরে, আপলনী বোদলেয়ারকে পত্রপাঠ দেখা করার জন্য লিখলেন। দেখা হ'লো, নিভৃতে দেখা হ'লো দু-একবার। তারপরেই, বোদলেয়ারের ভাষায়, 'সব উল্টে গেলো।'

আপলনীর সঙ্গে এই অধ্যায়টি একটু রহস্যময়। তাঁর উদ্দেশে কবিতা ও প্রেমপত্র কে পাঠাচ্ছেন তা অনুমান করতে আপলনীর অবশ্য দেরি হয়নি; আর তিনি, ফ্রান্সের প্রধান লেখকদের সহচরী, সে-সব রচনায় মুগ্ধ হবেন না তাও সম্ভব নয়। চাটুপ্রীতি নারীচরিত্রে স্বাভাবিক হ'লেও, আপলনীর হার্দ্য গুণেরও অভাব ছিলো না। বোদলেয়ারের শেষ পত্রটি প'ড়ে নিশ্চয়ই তিনি বিচলিত হয়েছিলেন—আর তার কারণ শুধু করুণা নয়, কে জানে মনে-মনে কবিকে তিনি ভালোবেসেছিলেন কিনা। অন্তত, এবারে দেখা হওয়ামাত্র, গভীরভাবে প্রেমে প'ড়ে গেলেন, কিন্তু বোদলেয়ার সেদিন সাড়া দিলেন না। দু-এক দিন পরে, আপলনী তাঁকে যে-চিঠি লিখলেন তা তাঁর মতো বয়স্ক অভিজ্ঞার পক্ষে রীতিমতো বিস্ময়কর। '··· আমি একটুও অতি-

রঞ্জন করছি না, পৃথিবীতে আমার মতো সুখী নারী আর নেই, আর কখনো আমি এমন সত্য ক'রে বুঝিনি যে তোমাকে ভালোবাসি, কখনো এমন রূপবান দেখিনি তোমাকে—আমার দেবতা তুমি, আমার স্বর্গীয় বন্ধু! দেখো, বেশি দেমাক কোরো না, আয়নার দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই—কেননা, যা-ই করো না তুমি, এক চকিত মুহূর্তে আমি তোমার যে-মুখশ্রী দেখেছিলাম, তা তুমি চেষ্টা ক'রে ফিরে পাবে না কখনো!…' অগস্ট মাস শেষ হবার আগেই তাঁদের 'মিলন' হ'লো। তারপর ৩১ তারিখে বোদলেয়ারের চিঠি:

'… **তুমি কী বলছো তা কি তুমি জানো?** দেনা শোধ করতে না-পারলে লোকের জেল হয়, কিন্তু প্রণয় বা বন্ধুতার প্রতিশ্রুতি ভাঙলে কোনো শাস্তি হয় না।

'আর তাই কাল তোমাকে বলেছিলাম: তুমি আমাকে ভুলে যাবে; বঞ্চনা করবে আমাকে; আজ যাকে ভালো লাগছে কাল সে ক্লান্তি জাগাবে তোমার।—আজ তাই আরো বলছি: দুঃখ শুধু সে-ই পাবে যে মূঢ়ের মতো প্রণয়ব্যাপারকেও মনের গভীরে গ্রহণ করে।—আমার প্রিয়তমা, আমার রূপসী, দেখছো তো আমি কী ভয়ানকরকম নারীবিদ্বেষী! …এক কথায়, আমার আস্থা নেই। সুন্দর তোমার আত্মা, কিন্তু সে-আত্মা তো নারীর।

'দেখছো, কেমন ক'রে কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধ একেবারে উল্টে গেলো। প্রথমত, আমাদের দু-জনেরই ভয়, পাছে—সেই সজ্জন, যাঁর এখনো এমন ভাগ্য যে তোমার প্রেমে প'ড়ে আছেন—তাঁকে আঘাত দিই।

'তারপর, আমাদের নিজেদের ঝোড়ো স্বভাবকেও ভয়, কেননা আমরা জানি (বিশেষত আমি জানি) যে অনেক গ্রন্থি আছে যা ছাড়ানো শক্ত।

'আর সবশেষে, সবশেষে, কয়েকদিন আগে তুমি ছিলে দেবী—কী সুন্দর তা, কী সুবিধাজনক, কী অনাক্রমণীয়। আর এখন—তুমি এক মানবীমাত্র।—আর ভাবো, যদি দুর্ভাগ্যবশত, তোমার বিষয়ে ঈর্ষাপোষণের অধিকার অর্জন করি আমি! সে-কথা ভাবতেও কী ভীষণ লাগে!…

'তোমার দ্বিতীয় চিঠির শীলমোহরে যে-বাণীটি অঙ্কিত আছে, তার

গাম্ভীর্যে সুখী হ'তে পারতাম, যদি জানতাম তার অর্থ তুমি বুঝেছো।...
তার অর্থ স্পষ্টত এই দাঁড়ায় যে আমাদের কখনো দেখা না-হ'লেই ভালো ছিলো, কিন্তু দেখা যখন হয়েছে কখনো আর বিচ্ছেদ উচিত নয়। কোনো বিদায়পত্রে এই বাণী বিদ্রূপের মতো শোনাবে।...'

বোদলেয়ার যে এ-ভাবে আপলনীকে 'প্রত্যাখ্যান' করলেন তার কারণস্বরূপ কোনো-কোনো গবেষক তাঁর যৌন অক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। এই অনুমান ভিত্তিহীন যদি নাও হয়, তবু একমাত্র কারণ সেটা হ'তে পারে না। আমরা লক্ষ করি, দু-বছর আগে মারী দোব্রাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকালে কবির দিক থেকে এ-রকম কোনো বিকর্ষণ ঘটেনি। নিশ্চয়ই বোদলেয়ারের মনেও কুণ্ঠা ছিলো। মনে হয়—আর চিঠিতে তা স্পষ্টই বলা আছে—আপলনীকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। মাঝারি গোছের অভিনেত্রী মারী দোব্রাঁর বিষয়ে যে-'আশা' তিনি পোষণ করতে পেরেছেন তা আপলনীর বেলায় সম্ভব হ'লো না—কেননা তিনি শ্রেষ্ঠ রূপসীদের অন্যতমা, ধনে অভ্যস্ত, বহু কৃতী পুরুষের বান্ধবী—আর বোদলেয়ারের পরিবেশে দুর্নাম ও দারিদ্র্য শুধু বিরাজ করে। আমরা কি সন্দেহ করতে পারি যে এই একবার তাঁর কবির গর্ব তাঁর কাজে লাগেনি, মনে কি হয় না যে এক সামান্য সংকোচ-বশত জীবনের এক নিমন্ত্রণের তিনি উত্তর দেননি? কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। হয়তো, কবি ব'লেই, মাদাম সাবাতিয়েকে তিনি চেয়েছিলেন শুধু 'ম্যাডোনা ও সরস্বতী' রূপে—সুদূর, স্পর্শাতীত, চিন্ময়ী, 'অসীমের গহ্বরে এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী'র মতো; তাঁর দেবীত্ব থেকে মানবীত্বে অবতরণ, তাই, তাঁর দুঃসহ লেগেছিলো। কিংবা হয়তো ভীত হয়েছিলেন পাছে গভীরভাবে আসক্ত হ'য়ে পড়েন—জীবনে আরো এক গ্রন্থি সংযুক্ত হয়। কিংবা হয়তো আপলনীর সন্দেহই সত্য: তিনি তাঁর 'শ্বেত ভেনাস'কে কখনোই প্রেমিকের মতো ভালোবাসেননি। অথবা, কোনো-কোনো কবি যেহেতু 'জগতের হ'য়ে দুঃখ ভোগ করেন', তাঁদের অচেতন মন দুঃখের পথই বরণ ক'রে নেয়, কোথাও কোনো তৃপ্তির সম্ভাবনা দেখলে পলায়ন করে।

এর পরে আরো কয়েক বছর বোদলেয়ার আপলনীকে চিঠিপত্র লিখেছেন—সে-সব চিঠি ক্রমশই 'পোশাকি' হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু তাঁর উদ্দেশে কোনো কবিতা আর লেখেননি।

এই বছরই জেনারেল ওপিকের মৃত্যু হ'লো। কর্মজীবনে বহু দূর পর্যন্ত উন্নতি করেছিলেন তিনি, বিদেশে রাজদূত ছিলেন, তারপর প্যারিসে সেনেটের সদস্য। তাঁর মৃত্যুর পর মাদাম ওপিক অঁফ্ল্যর-এর ছোটো বাড়িতে বাসা নিলেন।

বোদলেয়ারের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরলো।

১৮৫৮: এর আগের বছরে, অন্যান্য পীড়ন ছাড়াও, তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন গেছে যে পাওনাদার এড়াবার জন্য মাঝে-মাঝে বাথরুমে লুকিয়ে থাকতে হয়। কোনো-একজন প্রকাশক তাঁর সব রচনার ভার নেবেন, এই আশা বারে-বারে ব্যর্থ হচ্ছে; এবারে তাঁর বার্ষিক আয় থেকে ২৪০০ ফ্রাঁ অগ্রিম নেবার চেষ্টা ক'রে হতোদ্যম হলেন। অথচ, উঞ্ছবৃত্তির এই অসম্মান সত্ত্বেও, স্বাস্থ্যের ক্ষয় ও সংকল্পের বিনষ্টি সত্ত্বেও, আশা তিনি কখনো হারাননি—যতদিন পর্যন্ত চৈতন্য অক্ষত ছিলো, নিজের মনে স্বীকার করেননি পরাজয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে মা-কে লিখলেন: '…দুটি নাটক মনে-মনে আমার ভাবা আছে, আর খান কুড়ি উপন্যাস। আমি চাই না ভদ্রগোছের সাধারণ খ্যাতি, চাই মানুষকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে, বায়রন, বালজাক বা শাতোব্রিয়াঁর মতো চূড়ান্ত মর্যাদা চাই। সময় আছে কি এখনো? আ—যদি জানতাম, বয়স যখন অল্প ছিলো, সময় স্বাস্থ্য ও অর্থের মূল্য বুঝতাম যদি! আর ঐ আমার অভিশপ্ত "ফ্ল্যর দ্যু মাল"—যা আবার আরম্ভ করতে হবে আমাকে! তার জন্য শান্তি চাই মনে। আবার কবি হ'তে হবে আমাকে কৃত্রিম উপায়ে; ফিরতে হবে সেই পথে, যা চিরকালের মতো কাটা হ'য়ে গেছে ভেবেছিলাম; যে-প্রসঙ্গ নিঃশেষ হ'য়ে গেছে ভেবেছি তা-ই নিয়ে লিখতে হবে আবার। কেন? তিন-জন হাকিমের আজ্ঞাপালনের জন্য।' এই পত্রের আর-একটি অংশ: 'শুনবে আমার শখের সংকল্প? আমি এখন পড়তে চাই, পড়তে চাই, পড়তে চাই—আমার সৃষ্টিশীলতা তাতে ব্যাহত হবে না। আমার মনকে নতুন ক'রে সম্পন্ন ক'রে তুলুক আমার দিনগুলি।… যৌবন মিলিয়ে যাচ্ছে আমার, উড়ে চলেছে বছরের পর বছর—প্রায়ই ভাবি সে-কথা, শিউরে উঠি আতঙ্কে। ঘণ্টা-মিনিট যোগ ক'রে-ক'রেই বৎসর রচিত হয়, কিন্তু আমরা যখন সময় নষ্ট করি ঐ টুকরোগুলোকেই মনে রাখি কেবল, তাদের যোগফলের কথা ভাবি না।' তারপর:

'মা, তোমার কাছে আমি অপরিচিত, বলতে গেলে তুমি আমাকে চেনোই না। একসঙ্গে বাস করার সময় আমাদের হয়নি। তবু, অন্তত দু-এক বছর, একসঙ্গে সুখী আমাদের হ'তেই হবে।'

কোনোটাই হয়নি; না অধ্যয়নের অবসর, না মা-র সঙ্গে দু-এক বছরের সুখ।

নবেম্বর মাসে জ্বান তাঁর কাছে ফিরে এলেন; বোদলেয়ার আলাদা বাসায় রাখলেন তাঁকে।

জ্বান দ্যুভালের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ বিষয়ে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। মা-কে লেখা দুটি চিঠি থেকে পাশাপাশি দুটি উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে, এই সম্বন্ধ কিছুকাল পরে এমন এক অবস্থায় পৌঁচেছিলো যেখানে সহবাস অসহ্য, কিন্তু বিচ্ছেদ ততোধিক। ১৮৫২, ১৭ মার্চ তারিখে দশ বছরের যুগ্ম জীবনের পরে লিখছেন: 'জ্বান আমার সুখের অন্তরায় হ'য়ে উঠছে—সেটা ছোটো কথা, আমিও পারি সুখ বর্জন করতে, তা প্রমাণও করেছি। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হ'লো আমার মনকে যে-পূর্ণতা আমি দিতে চাই, জ্বান তাতেও বাধা দিচ্ছে। গত নয় মাসে তার চরম পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। যে-সব জরুরি কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে—ঋণশোধ, সমৃদ্ধিতে অধিকারলাভ, যশ উপার্জন, তোমাকে যত দুঃখ দিয়েছি তার ক্ষতি-পূরণ—এ-রকম অবস্থার মধ্যে কিছুতেই সে-সব সাধিত হ'তে পারে না। আগে তার কিছু সদ্‌গুণ ছিলো এখন সব গেছে; আর আমার দৃষ্টিও হয়েছে মোহমুক্ত। এমন মানুষের সঙ্গে সহজীবন কি কোনো-রকমেই সম্ভব, তোমার যত্নের জন্য যে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, নিরন্তর অসূয়ার দ্বারা, এবং অপটুতার ফলে, যে তোমার সব চেষ্টা ছারখার ক'রে দেয়? যে তোমাকে মনে করে নেহাৎই নিজের ভৃত্য ও সম্পত্তি ব'লে, যার সঙ্গে রাজনীতি বা সাহিত্য বিষয়ে কখনোই বাগ্‌বিনিময় সম্ভব নয়; এমন এক জীব, যে—তুমি নিজে শেখাতে চাইলেও কোনো-কিছু শিক্ষা করতে নারাজ; এমন জীব, যে আমাকে শ্রদ্ধা করে না, আমার অধ্যয়নাদি বিষয়ে যার আগ্রহ নেই; যে আমার পাণ্ডুলিপি-গুলো আগুনে পোড়াতো, যদি জানতো প্রকাশ না-ক'রে পোড়ালেই সে বেশি টাকা পাবে; যে আমার বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দেয়—

বাড়িতে আমার অন্ন কোনো আমোদ নেই জেনেও, আর তার বদলে নিয়ে আসে কুকুর, যেহেতু কুকুর দেখলেই আমি অসুস্থ বোধ করি? যে বোঝে না, বুঝতে চায় না, যে মাত্র এক মাস কাল দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেলে সেই ক্ষণিক অবসরে আমি একটি বড়ো বই লিখে উঠতে পারি? এও কি সম্ভব? তোমাকে লিখতে-লিখতে রাগে লজ্জায় আমার চোখে জল আসছে; কত ভাগ্যে বাড়িতে কোনো অস্ত্র নেই; মনে পড়ছে সেই সব মুহূর্তের কথা যখন মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে আমার পক্ষে, মনে পড়ছে সেই ভীষণ রাত্রি যখন টেবিলে ঠুকে ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। যেখানে দশ মাস আগেও আমার আশা ছিলো আরাম ও শান্তির, সেখানে—এ-ই আমার লাভ হ'লো।...'

১৮৫৩, ২৬ মার্চ তারিখে: 'এক বছর আগে জ্ঞানকে আমি ছেড়ে যাই।...মাঝে কয়েকমাস, মাসে দু-তিনবার দেখতে যেতাম তাকে, অল্প কিছু টাকা দিয়ে আসতাম।...এখন সে গুরুতর পীড়িত, তার দারিদ্র্যও চরম হ'য়ে উঠছে।—মঁসিয় আঁসেলকে কখনো কিছু বলি না এ-বিষয়ে—শুনলে পাপিষ্ঠের আহ্লাদ আর ধরবে না, জানি।—বুঝতেই পারছো, তুমি আমাকে যা টাকা পাঠাবে তার একটি ছোটো অংশ জ্ঞান পাবে।...তুমি বুঝে দেখো, জ্ঞানের জন্য আমি কী-রকম দুঃখ পাচ্ছি এখন—সত্যি সে আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তা-ই না? কতবার—আর এই সেদিন পর্যন্ত—কতবার তোমার কাছে অভিযোগ করেছি আমি!—কিন্তু আজ এমন চরম সর্বনাশের সামনে, এমন অতল বিষাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল আসছে আমার, আর—সব কথাই বলি তোমাকে—নিজেকে তিরস্কারও কম করছি না। দু-দুবার আমি বেচে দিয়েছি তার অলংকার ও আসবাবপত্র, আমার জন্য ঋণ করিয়েছি তাকে দিয়ে, হুণ্ডি সই করিয়েছি, নির্দয়ের মতো প্রহার করেছি, আর—সবশেষে, তার সামনে রেখেছি বরাবর এক দুশ্চালিত লম্পট জীবনের আদর্শ। দুঃখ পেয়েও সে কিছু বলে না—আমার মনস্তাপের এই কি যথেষ্ট কারণ নয়? আর, যেমন অন্য সব বিষয়ে, তেমনি এ-বিষয়েও আমি কি অপরাধী নই?...

'আমি নিজের কাছে অপরাধী;—আমার ধারণাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে এই বৈষম্য আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। কর্তব্য ও কার্যকারিতা

বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ ও সত্য, অথচ কাজের বেলায় সব সময় আমি উল্টো করি কেন?…'

১৮৫৬ সালে জ্বান যখন তাঁকে ত্যাগ ক'রে যান, বোদলেয়ারের তখনকার মানসিক অবস্থাবিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটের উপর, তাঁর পত্রধারা ও কবিতাবলির অনুশীলন করলে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, সব সত্ত্বেও, জ্বানের সঙ্গে যে-রকম সমৃদ্ধ ও মানবিক সম্বন্ধ তাঁর স্থাপিত হয়েছিলো তেমন সারা জীবনে আর কারো সঙ্গে হয়নি তাঁর; না কোনো বন্ধুর সঙ্গে, না আপলনী বা মারীর সঙ্গে, আর তাঁর মায়ের সঙ্গে তো নয়ই। তাঁর দিক থেকে এই সম্বন্ধ ছিলো বহু বৃত্তির সন্নিপাত: কাম ছিলো তাতে, ছিলো সঙ্গতা ও স্নেহ, মমতা, আক্রোশ ও ঘৃণা, ছিলো বৈনাশিকতা ও কল্যাণকামনা। অর্থাৎ, মানবিক অর্থে, এইটি ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে পরিপূর্ণ প্রেম; বিপরীত, সম্পৃক্ত ও পরস্পরপূরক আবেগ-সমূহের মুক্তির জন্য উদারতম প্রণালী। কবিতায় যখন বলছেন, 'তোকে জন্তুর মতো বধ করতে পারি', তখনও এই চেতনা তাঁর তীব্র যে সে-আঘাত তাঁর নিজের বুকেই লাগবে, যে তিনি নিজেই একাধারে বিক্ষত মাংস ও ছুরিকা। একমাত্র জ্বানের সঙ্গেই, সারা জীবনে, তাঁর আত্মানুভূতি ঘটেছিলো। একমাত্র জ্বানের কাছেই—তাঁর নিজেরই ভাষায়—কিছু শান্তি ও বিশ্রাম তিনি পেয়েছিলেন; একমাত্র জ্বানই তাঁকে, দীর্ঘকাল না হোক কিছুকাল ধ'রে, তৃপ্তি দিয়েছিলো—আর তা শুধু দৈহিক অর্থেই নয়, সূক্ষ্মতম ও কোমলতম অনুভূতির দিক থেকেও। 'বারান্দা'র মতো স্মৃতি- ও আবেগস্পন্দিত কবিতা যার জন্য লেখা হয়েছিলো, সেই নারীকে নিতান্তই কামকুণ্ড ব'লে উপেক্ষা করা অসম্ভব। সর্বোপরি, শহীদবৃত্তির দিকে যে-সহজ ও উগ্র উন্মুখতা আমাদের কবির চরিত্রে লক্ষ করা যায়, তারও অপর্যাপ্ত তৃপ্তি ছিলো জ্বানের কাছে। সত্য, সে শিক্ষিত ছিলো না, বোদলেয়ারের কবিতার মূল্য কিছুই বুঝতো না, কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? পৃথিবীতে ক-জন কবির ভাগ্যে এমন স্ত্রী বা প্রণয়িনী জুটেছে, কবিতার রসজ্ঞ হবার যার ক্ষমতা ছিলো? হাইনের নিরক্ষর ও বালবুদ্ধি মাথিল্ড অভ্যাগতদের জিগেস করতেন, 'হ্যাগো, মঁসিয় নাকি কবিতা লেখেন?' —কিন্তু সেজন্য হাইনে তাঁকে কিছু কম ভালোবাসেননি। 'সোনার

পিত্তলমূর্তি'দের বধিরতাকে উদ্দেশ ক'রেই চিরকাল ধ'রে প্রেমের গান গেয়ে গেছেন কবিরা—জগতের লোক শুনেছে। যারা শুনবে বা বুঝবে তাদের আশায় ব'সে থাকলে সৃষ্টি টিকতো না।

জ়ানকে লেখা কবির চিঠিপত্র খুব কমই পাওয়া গেছে, কিন্তু অন্যদের কাছে চিঠিতে তার বিষয়ে উল্লেখ অফুরন্ত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ভাবনা ও দায়িত্ব মাথা থেকে নামাতে পারেননি। তার পীড়া-কালে সযত্নে চিকিৎসা করিয়েছেন; সে যখন রোগে পঙ্গু ও অতি-মাদকতায় বিমূঢ় হ'লো তখন তাকে জৈব আরাম দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি; যখন সে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ দিলে, চুরি ও মিথ্যাচরণে অভ্যস্ত হ'লো, তখন বোদলেয়ার, নিজের মনে অতি কঠিন আঘাত পেয়েও, অন্যের কাছে তার দোষ ঢাকার চেষ্টা করলেন. বেলজিয়মে, নিজের যখন একেবারে অসহায় অবস্থা, এবং হার্দ্য বা দৈহিক কোনো সম্বন্ধের আর কথা ওঠে না, তখনও তাঁর অন্যতম উদ্বেগ ছিলো, পাছে জ়ানের ভরণপোষণের ব্যাঘাত ঘটে। নিজে যখন খুবই কষ্টে আছেন তখনও অন্যের কষ্টকে বড়ো ক'রে দেখা বোদলেয়ারের স্বভাব ছিলো: প্রকাশকদের কত সনির্বন্ধ চিঠি লিখেছেন জ়ানকে কিছু টাকা দেবার জন্য, কত সোৎসাহ প্রবন্ধ লিখেছেন তরুণ ও অখ্যাত শিল্পীদের সাহায্যকল্পে। ভাবেননি, তাঁর নিজের অবস্থা অচল; ভাবেননি, সাহিত্যজগতে তাঁর নিজের কোনো প্রতিষ্ঠা নেই।

১৮৫৯: এপ্রিল মাসে জ়ান দ্যুভাল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত; বোদলেয়ার ব্যাকুল হ'য়ে তাকে হাসপাতালে পাঠালেন, মে মাসে ফিরে এলো জ়ান। এদিকে বাঁভিল অসুস্থ; তাঁর চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে মারী দোব্রঁ বোদলেয়ারের সাহায্য চাইলেন; গ্রীষ্ম ও হেমন্তকালে কয়েকবার মারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'লো। কিন্তু নভেম্বর মাসে বাঁভিল যখন নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেলেন, মারী তাঁকে নিয়ে চ'লে গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে, বোদলেয়ার নতুন ক'রে আঘাত পেলেন। এ-সব অশান্তি সত্ত্বেও বছরটা বন্ধ্য গেলো না; প্রকাশ করলেন চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা, 'কৃত্রিম স্বর্গ' সমাপ্তপ্রায়, 'লে ফ্ল্যর'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত ক'রে এনেছেন। গোতিয়ে বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশিত হ'লো।

১৮৬০: 'কৃত্রিম স্বর্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লো; আরো একবার সাঁৎ-ব্যভের সমালোচনা প্রার্থনা ক'রে ব্যর্থ হলেন।

'কৃত্রিম স্বর্গে'র বিষয়বস্তু নেশা—প্রধানত আফিম ও সিদ্ধি, ডিকুইন্সির 'অহিফেনসেবক' থেকে অনেক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন তাঁর কাব্যে ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে, তেমনি এই নিবন্ধে বোদলেয়ার তাঁর ক্যাথলিক মানসের পরিচয় দিলেন; মত্ত অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পর, মাদকতাকে নিন্দা করলেন শয়তানের হাতিয়ার ব'লে। এই পক্ষপাতী মনোভাব ফ্লোবেয়ারের ভালো লাগলো না; তাঁর মতে মাদকদ্রব্য স্বগুণে দূষ্য হ'তে পারে না, ব্যবহারে আতিশয্যই নিন্দনীয়। একটি পত্রে, তাঁর এই আপত্তি জানাবার পর, তিনি বোদলেয়ারকে লিখলেন: 'এবারে বলি, আপনার বইখানা আদ্যন্ত আমার কী যে চমৎকার লেগেছে তা পুরোপুরি প্রকাশ করতেও পারবো না। মহৎ আপনার রচনারীতি—তার পৌরুষে ও সচেতন শিল্পিতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের সকলের প্রণয়াস্পদ পরম রোমান্টিক আপনি, অথচ আপনি ক্লাসিক হ'তেও পেরেছেন।···আপনার 'ফ্ল্যর দ্যু মালে'র পরবর্তী সংস্করণের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। তার বেলায় আমার এ-সব আপত্তি অবশ্য টিকবে না। যা ভালো লাগে তা-ই ভাববার পূর্ণ অধিকার আছে কবির—কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর?··· কত কাজ শেষ ক'রে উঠছেন আপনি, আর কী ভালো-ভালো কাজ!' এই পত্রের উত্তরে বোদলেয়ার:

'এই এক অক্ষমতা পেয়ে বসেছে আমাকে; কোনো-এক অশুভ শক্তি, যা মানুষের বাইরে অবস্থিত, তার প্ররোচনাকে প্রকল্পরূপে স্বীকার না-ক'রে মানুষের অনেক স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা ও কর্মের অর্থ আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। জানি, আমার এই স্বীকারোক্তির তাৎপর্য কী, কিন্তু সমস্ত উনিশ শতক আমার বিরুদ্ধে জড়ো হ'লেও আমি এ-জন্য লজ্জিত হবো না। তাই ব'লে মতপরিবর্তন ও স্ববিরোধের সুখও যে আমি ত্যাগ করবো তা নয়।···

'আপনি বলছেন আমি অনেক কাজ শেষ ক'রে উঠছি। এ কি কোনো নিষ্ঠুর বিদ্রূপ? অনেকের মতে—আমার নিজের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—আমার কাজের পরিমাণ অল্পই! সত্যি কাজ করা—তার মানে হ'লো অনবরত পরিশ্রম, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অবকাশ নেই, অবকাশ নেই দিবাস্বপ্নের! তার মানে, প্রতিজ্ঞার নির্বাস হ'য়ে উঠতে হবে, হ'তে হবে নিরন্তর কর্মিষ্ঠ। হয়তো একদিন সেই অবস্থায় পৌছবো আমি!'

ফ্লোবেয়ার, যাঁর পল্লীকুটিরের বাতায়নে তৃতীয় যামেও বাতি নিবতো না; যিনি, পরম রূপকল্পের অন্বেষণে তন্ময় হ'য়ে, একটি উপন্যাস আগুন্ত চারবার পর্যন্ত রচনা করেছেন, তাঁর পক্ষে বোদলেয়ারের সাহিত্যকৃতিকে 'প্রচুর' বলা অসম্ভব ছিলো না; কিংবা হয়তো সতীর্থকে উৎসাহ দেয়াই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো। কিন্তু আমরা জানি, বোদলেয়ার উত্তরে যা লিখেছিলেন সে-কথাও সত্য; অনবরত কর্মিষ্ঠ হ'তে কখনোই পারেননি তিনি, আর পারেননি ব'লেই পত্রাদিতে ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে সে-অবস্থার জন্য হাহাকারের অন্ত নেই। 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'তে একবার তাঁর 'আসেডিয়া'র উল্লেখ করেছেন: 'acedia' —ইচ্ছাশক্তির মারাত্মক অভাব, সংকল্পকে কর্মে পরিণত করার ভয়াবহ অক্ষমতা, মধ্যযুগে যা 'সন্ন্যাসীর ব্যাধি' ব'লে কথিত ছিলো, তার লক্ষণ মাঝে-মাঝে তাঁর চরিত্রে দেখা গেছে। 'আজ থাক, কাল' —এই ভেবে-ভেবে বহু সময় নষ্ট করেছেন। ছেলেমানুষের মতো করুণ কয়েকটি কুসংস্কারে ভুগতেন; তাকিয়ে থাকতেন সপ্তাহের প্রথম দিন ও মাসের প্রথম তারিখটির দিকে, প্রতি নববর্ষে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা নিতেন—তার ব্যর্থতা মনে-মনে অবধারিত জেনেও। মাঝে-মাঝে হয়তো অর্থ- ও স্বাস্থ্যহীনতারও প্রভাবে, এমন অবস্থা হয়েছে যে পুস্তকের প্রুফ দীর্ঘকাল অস্পৃষ্ট প'ড়ে থাকে; আরব্ধ বা সমাপ্তপ্রায় পাণ্ডুলিপিগুলিকে গুছিয়ে রাখাও অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু, যতদিন সজ্ঞান ছিলেন, আত্মশোধনের সংকল্প ছাড়েননি। এবং মোটের উপর, কবিতা, সমালোচনা, অনুবাদ ও চিঠিপত্র মিলিয়ে যে-পরিমাণ রচনা রেখে গেছেন, তাঁর ছিন্নভিন্ন অস্থির জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাকে আমরা কিছুতেই অপ্রচুর বলতে পারি না।

জানুয়ারি মাসে বোদলেয়ার অকস্মাৎ এক 'অদ্ভুত মূর্ছা'য় আক্রান্ত; উপদংশের মারাত্মক অবস্থার সূত্রপাত হ'লো। দারিদ্র্যের শেষ নেই। আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ হ'য়েও জ়ান ও মা-র কথা ভেবে বিরত হলেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত জ়ানকে নিয়ে এলেন নিজের বাসায়, সেখানে অকস্মাৎ জ়ানের এক 'ভ্রাতা'র উদ্ভব হ'লো। বোদলেয়ার দেখলেন, তাঁর এই নতুন গলগ্রহ মধ্যরাত পর্যন্ত জ়ানের ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে; তাঁর সারা জীবনের সঙ্গিনীর সঙ্গে নিভৃতে একটু কথা বলার ফুরশৎ হয় না। অগত্যা নিজের বাড়ি থেকে পালিয়ে এলেন শস্তা হোটেলে।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে হ্বাগনার তাঁর 'টান্‌হয়জার' ও 'লোহেনগ্রিন' পরিবেশন করলেন প্যারিসে, তিন রাত্রি অভিনয় হ'লো। সমালোচকরা ধিক্কার দিলে, কিন্তু বোদলেয়ার বিমুগ্ধ। একটি উচ্ছ্বসিত চিঠিতে, স্বদেশবাসীর মূঢ়তার জন্য লজ্জাপ্রকাশ ক'রে, হ্বাগনারকে অভিনন্দন জানালেন; ইচ্ছে ক'রেই ঠিকানা দেননি চিঠিতে, কিন্তু হ্বাগনার সন্ধান ক'রে উত্তর দিলেন, 'একদিন দেখা করলে সুখী হবো।' কিন্তু কোনো-এক অজ্ঞেয় কারণে বোদলেয়ার এ-আমন্ত্রণ রক্ষা করেননি।

১৮৬১ : 'লে ফ্ল্যর'-এর নতুন সংস্করণ। ছয়টি নিগৃহীত কবিতা বর্জিত হ'য়ে পঁয়ত্রিশটি নতুন কবিতা যুক্ত হ'লো। একটি ভূমিকা আরম্ভ ক'রে শেষ করলেন না। এই সময়ে তাঁর বাসস্থল ছিলো ২২ নম্বর ক্ল্য দাম্‌স্তেরদাম ; এই রাস্তারই ৫০ নম্বর বাড়িতে হাইনের মৃত্যু হয়।

'লে ফ্ল্যর'-এর তৃতীয় সংস্করণ বোদলেয়ার দেখে যাননি, তার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তৃতীয় সংস্করণের জন্যও ভূমিকা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, বক্তব্য প্রায় একই। সব সুদ্ধ তিনটি খশড়া পাওয়া গিয়েছে। ১৯২২-এ প্রকাশিত 'লে ফ্ল্যর'-এর প্রামাণিক ফরাশি সংস্করণে এই অসমাপ্ত ভূমিকাত্রয় মুদ্রিত হয়, সম্প্রতি নিউ ডিরেকশন্সের মার্কিন সংস্করণেও সংযোজিত হয়েছে। তাদের কোনো-কোনো অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

'আমার পত্নীদের জন্য, ভগ্নীদের জন্য বা কন্যাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়নি ; আমার প্রতিবেশীদের পত্নী, কন্যা বা ভগ্নীদের জন্যও নয়। সে-কাজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি তাঁদের উপর, যাঁরা রূপসী ভাষা ও সৎকর্মের প্রভেদ বুঝতে নারাজ।

'আমি জানি, মনে-প্রাণে রূপসী রীতিকে ভালোবাসলে, জনগণের ঘৃণার পাত্র হ'তে হয়। কিন্তু এমন কোনো কারণ নেই যা আমাকে দিয়ে এ-যুগের অকথ্য অপভাষা উচ্চারণ করাবে—না মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, না মিথ্যা বিনয়, না কোনো চক্রান্ত, না সার্বিক ভোটাধিকার।...

'কোনো-কোনো বিখ্যাত কবি, বহুকাল ধ'রে, কাব্যজগতের পুষ্পল প্রদেশগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছেন। আমি কিন্তু **পাপ** থেকেই নিংড়ে বের করেছি **সৌন্দর্য**—তাতে কৌতুক

বেশি, আর দুঃসাধ্য ব'লেই তা অধিক প্রীতিকর। পরম নিষ্পাপ এই গ্রন্থ, কোনো কাজে লাগবে না কখনো— আমি এটি রচনা করেছিলাম আর-কোনো উদ্দেশ্যে নয়, শুধু নিজের বিনোদন জোগাতে, আর দুরূহের প্রতি আমার তীব্র অভিরুচির তৃপ্তির জন্য। …

'শিব ও সুন্দরে প্রভেদ। অশিবে সৌন্দর্য। ছন্দ ও মিল : একনাদ, সৌষম্য ও বিস্ময়ের জন্য মানুষের অমর আকাঙ্ক্ষার উত্তর। …প্রেরণার অহমিকা ও বিপদ। …

'কেমন ক'রে, পর্যায়ক্রমে বিধিবদ্ধ অনুশীলনের ফলে, শিল্পী তাঁর মৌলিকতাকে মাত্রানুরূপ বাড়াতে পারেন ;

'ছন্দশাস্ত্র, যা কবিতা ও সংগীতের সম্বন্ধসূত্র, তার মূল মানবাত্মার এত গভীরে যেখানে ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব পৌঁছতে পারে না ;…

'প্রতিটি শব্দের কয়টি অন্ত্যানুপ্রাস সম্ভব তা যে-কবি নির্ভুলভাবে না জানেন, তিনি যে-কোনো একটি ধারণাপ্রকাশে অক্ষম কেন ;

'যে কবিতার বাক্যবন্ধ, গণিত ও সংগীতের মতো, একটি অনুভূমিক রেখার অনুকরণে সক্ষম, বা একটি আরোহমাণ বা অবরোহমাণ উল্লম্ব রেখার ; যে, রুদ্ধশ্বাস না-হ'য়ে, তা ঋজুভাবে স্বর্গে উঠে যেতে পারে, বা নির্ভার ও নির্বেগ হ'য়ে লম্বভাবে নামতে পারে নরকে ; পারে উপরিন্যস্ত কোণ রচনা ক'রে, কম্বুরেখা, সর্পরেখা বা অধিবৃত্তের অনুসরণ করতে ;

'যে কবিতা, চিত্রণ, রন্ধন বা কৌচুমারশিল্পের মতোই, শুধু একটি বিশেষ্য ও বিশেষণকে যুক্ত ক'রে, সাদৃশ্যবোধ বা বিরোধাভাসের দ্বারা, জাগাতে পারে মাধুর্য বা তিক্ততার, আনন্দ বা আতঙ্কের যে-কোনো, আবেদন।'

হ্বাগনার আবার প্যারিসে ; এবার দু-জনে দেখা হ'লো। ইতিমধ্যে বোদলেয়ার এই গীতকবি বিষয়ে তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন। এখন থেকে, পো-র মতোই আর-একটি উৎসাহ এলো তাঁর জীবনে : হ্বাগনার। শেষ রোগশয্যায়, যখন বুদ্ধি লুপ্তপ্রায়, তখনও হ্বাগনারের সংগীতে সাড়া দিতে পেরেছেন। হ্বাগনার ও পো : এই দু-জনকেই তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন মালার্মে ও ভালেরি।

এ-বছরের ১লা এপ্রিল তারিখে মা-কে লিখলেন : 'অন্তত, আমার

সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি প্রকাশের আগেই যদি আমাকে মরতে হয়— সে বড়ো কঠিন হবে।' ৬ মে তারিখের আর-একটি চিঠিতে হঠাৎ আশার সুর লাগলো— 'আমার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা এখন ভালো বললে কমিয়ে বলা হয়। যা ইচ্ছে হয় তা-ই করতে পারি। সবই প্রকাশিত হবে। আমার মনের গতি জনপ্রিয়তার দিকে নয়, তাই অর্থোপার্জন আমার অল্পই হবে, কিন্তু বিরাট খ্যাতি রেখে যাবো তাতে আমার সন্দেহ নেই — শুধু যদি বেঁচে থাকার মতো সাহস জোটে।' এই চিঠিতেই প্রথম 'উন্মোচিত হৃদয়ে'র উল্লেখ পাওয়া যায় — যার সামনে 'রুসো ম্লান হ'য়ে যাবেন।' এই আত্মকথার কঙ্কালটি (*Mon Coeur mis à nu*) 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র অন্তর্ভূত হয়েছে, তাঁর সমালোচনাও মৃত্যুর পূর্বে গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়নি।

জুলাই মাসে হঠাৎ এক পাগল বুদ্ধি মনে এলো তাঁর. আকাদেমির সভ্য পদের জন্য প্রার্থী হলেন। সাঁ্যাৎ-ব্যভ ভাবলেন তামাশা হচ্ছে। বোদলেয়ার, ফ্রান্সের অদ্ভুত নিয়ম অনুসারে, আকাদেমির সভ্যদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ ক'রে এলেন। এতদিনে — অবশেষে — সাঁ্যাৎ ব্যভকে প্রকাশ্যে একটা মত দিতে হ'লো। যা লিখলেন তার চেয়ে নীরবতাই ঢের ভালো ছিলো। কবিতা বিষয়ে স্বল্প ও সতর্ক প্রশংসার পরে অভিমত দিলেন যে মঁসিয় শার্ল বোদলেয়ারকে লোকে যা ভাবে তা তিনি নন— তিনি রীতিমতো ভদ্রলোক, সুবেশ, নিখুঁত আদব-কায়দা জানেন। প্রতিপত্তিশীল প্রৌঢ় সাহিত্যিকদের মধ্যে একজনও ছিলেন না, যাঁর কাছে এই প্রস্তাব ক্ষণকালের জন্যও বিবেচ্য মনে হ'লো। কৌতুক এই, যে সে-বছর আর যাঁরা ঐ পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নামও উত্তরকাল মনে রাখেনি।

এই ব্যাপারে একটিমাত্র লাভ হ'লো: দ্য ভিন্‌ঈর সঙ্গে ক্ষণিক যোগাযোগ। ভিন্‌ঈ তখন কর্কটরোগে মুমূর্ষু; তবু, বোদলেয়ার সাক্ষাৎ করতে এলে, তাঁকে সাদরে বসিয়ে তিন ঘণ্টা আলাপ করলেন। এই আশাতীত সহৃদয়তার উত্তরে বোদলেয়ার তাঁকে উপহার পাঠালেন কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ, আর 'লে ফ্লার'-এর ভালো কাগজে ছাপা শেষ কপিটি। সঙ্গের চিঠিতে লিখলেন: 'পুরোনো কবিতা সবগুলিরই পরিশোধন করেছি; নতুন গুচ্ছ সূচিপত্রে চিহ্নিত ক'রে দিলাম। এই গ্রন্থের জন্য একটিমাত্র প্রশংসা আমি প্রার্থনা করি: এটি যে

নেহাৎ একটি কাব্যসংগ্রহ নয়, এর যে আরম্ভ আছে এবং শেষ আছে, এই কথাটি স্বীকৃত হ'লেই আমি তৃপ্ত হবো। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি নতুন কবিতা রচনা করা হয়েছে।' ভিন্‌ঈ, তাঁর রচনার অনুরাগী হ'য়েও, নৈরাশ্য অবধারিত বুঝে তাঁকে উপদেশ দিলেন আকাদেমির দেউড়ি থেকে স'রে আসতে।

এ-বছরের প্রারম্ভেই, পরস্পর কলহের পর, জ়ানের সঙ্গে শেষবারের মতো তাঁর বিচ্ছেদ হ'লো। কিন্তু আংশিক বিচ্ছেদমাত্র, কেননা তার ভরণপোষণের দায়িত্ব বোদলেয়ার কখনোই ভুললেন না, শেষ দিন পর্যন্ত যথাসাধ্য পালন ক'রে গেলেন। তাঁর 'কালো ভেনাস' এখন অকালবৃদ্ধ ও অক্ষম; অতএব তাকে একেবারে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। কিছুকাল পরে আবিষ্কার করলেন যে জ়ানের 'ভ্রাতা' আসলে একটি প্রণয়ী, জ়ানের খাদ্যে অর্ধেক ভাগ বসানো তার পেশা। এই ঘটনাকে একটি চিঠিতে উল্লেখ করলেন তাঁর 'মহাদুঃখ' ব'লে। পরবর্তী বছরগুলিতেও জ়ানের উল্লেখ বিরল নয়। বোদলেয়ারকে না-জানিয়ে, তাঁর নাম ক'রে বন্ধুদের কাছে সে ঋণ ক'রে যাচ্ছে; একই চিঠি দেখিয়ে দু-বার অর্থ নিচ্ছে প্রকাশকদের কাছে; হাসপাতালকে ঠকিয়ে ক্রয় করছে মাদকদ্রব্য। তবু বোদলেয়ার, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারলেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে জ়ান দ্যুভালের ইতিহাসেও যবনিকা নামলো। তাকে শেষ দেখেছিলেন আলোকচিত্রকার নাদার (Nadar), যাঁর স্টুডিওতে প্রথম 'ইম্‌প্রেশনিস্ট' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জ়ান দ্যুভাল, তখনও তার কেশের প্রাচুর্য একেবারে লুপ্ত হয়নি, যষ্টিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে রাজপথের জনতার মধ্যে মিলিয়ে গেলো। তখন ১৮৭০ সাল; তারপর তার কী হ'লো কেউ জানে না।

১৮৬২ : বোদলেয়ার 'উন্মোচিত হৃদয়ে' লিখলেন : 'আজ, ১৮৬২-র ২৩ জানুয়ারি তারিখে, আমি পেলাম এক অদ্ভুত সাবধানী ঘোষণা। আমার উপর দিয়ে উন্মত্ততার ডানার বাতাস ব'য়ে গেলো।'

প্রকাশক পুলে মালাসী দেনার দায়ে কারারুদ্ধ হলেন; এঁর কাছে বোদলেয়ারের নিজের ঋণ তখন ৫০০০ ফ্রাঁ। 'লে ফ্ল্যর'-এর দাম ক'মে অর্ধেক হ'লো। দ্য ভিন্‌ঈ একটি চিঠিতে লিখলেন, 'আপনার "ক্লেদজ কুসুম" আমার পক্ষে "মঙ্গলপুষ্পে" পরিণত হয়েছে।'

এ-বছর মাদাম দ্যজয়ে (Madame Desoyes) নামক এক মহিলা প্যারিসে জাপানি শিল্পদ্রব্যের এক দোকান খুললেন। সেখানে ভিড় জমালেন মানে, গঁকুর-ভ্রাতৃদ্বয়, বোদলেয়ার, ও লণ্ডন থেকে বেড়াতে-আসা হুইসলার। বোদলেয়ার দুটি প্রবন্ধে মানে-র বিষয়ে সপ্রশংস উল্লেখ করলেন; দু-জনে বন্ধুতা হ'লো। মানে-র আঁকা বোদলেয়ার ও জ়ান দ্যুভালের প্রতিকৃতি আনুমানিক এই সময়ের। এক স্প্যানিশ নাচের দল প্যারিসে; মানে আঁকলেন 'ললা দ্য ভালেঁস', সে-ছবি দেখে বোদলেয়ার একটি চতুষ্পদী লিখলেন। সুইনবার্ন প্যারিসে আবিষ্কার করলেন 'ফ্ল্যর দ্যু মাল', দেশে ফিরে উচ্ছল সমালোচনা লিখলেন 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায়। সে-কালে যদিও সুইনবার্ন প্রায়ই প্যারিসে আসতেন, দুই কবিতে কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু ইংরেজ কবির সমালোচনাটি বোদলেয়ার পড়েছিলেন; ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩ তারিখে তিনি এক চিঠিতে সুইনবার্নকে লেখেন: 'একবার হ্বাগনার আমাকে বলেছিলেন, **"আমি কখনো ভাবিনি যে একজন ফরাশি লেখক এত বিভিন্ন বিষয়ের বোদ্ধা হ'তে পারেন।"** আমার স্বভাবে সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ নেই ব'লে, ও-কথা শুনে আমি ক্ষুণ্ণ হইনি।…**আমি কখনো ভাবিনি যে একজন ইংরেজ লেখক ফরাশি সৌন্দর্য, ফরাশি ছন্দসূত্র ও ফরাশি অভিপ্রায়ের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করতে পারেন।**…শুধু কবিরাই কবিদের বুঝতে পারেন।' দৈবক্রমে, এই চিঠি সুইনবার্নের হাতে কখনো পড়েনি।

হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে, বহু অনর্থক উদ্বেগভোগের পর, বোদলেয়ার প্রত্যাহার করলেন আকাদেমির সদস্য হবার আবেদন। অসম্মান চরম হ'লো।

১৮৬৩ : মা-কে চিঠিতে লিখলেন: 'বন্ধুতা ও বিলাসিতার অভাবে দুঃসহ কষ্টভোগ করছি।' আর 'উন্মোচিত হৃদয়ে': 'প্রত্যহ ও অবিলম্বে কর্তব্যপালনের শক্তি দাও আমাকে; এমনি ক'রে আমি বীর ও সাধু হ'য়ে উঠবো।'

তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ, 'আধুনিক জীবনের শিল্পী' এই বছরে প্রকাশিত হ'লো। আশ্চর্য এই, রচনাটির স্থান হ'লো 'ফিগারো' পত্রিকায়, ভূমিকা লিখলেন সমালোচক বুর্দ্যাঁ (Bourdin)— সেই 'ফিগারো' ও সেই বুর্দ্যাঁ, যাঁরা বিরুদ্ধতা ক'রে 'লে ফ্ল্যর'-এর নিগ্রহ ঘটিয়েছিলেন। প্রবন্ধের

বিষয় বা উপলক্ষ : ব্যঙ্গচিত্রকর কঁস্তাঁত্যাঁ গী (Coustantin Guys)। অন্য এক সমালোচক মানে-কে বললেন 'গইয়া ও বোদলেয়ারের ছাত্র'।

প্রকাশক মিশেল লেভিকে পাঁচ খণ্ড পো-অনুবাদ পাঁচ বছরের জন্য বিক্রয় করলেন। মূল্য ২০০০ ফ্রাঁর এক পয়সাও নিজে পেলেন না, উত্তমর্ণরা ভাগ ক'রে নিলে। আর-এক প্রকাশককে পাঁচ বছরের জন্য 'লে ফ্ল্যর' ও 'স্প্লীন দ্য পারী' বিক্রয় করলেন, কিছু অগ্রিম হাতে এলো।

পুলে মালাসী, দেনার তাগাদায় অস্থির হ'য়ে, বেলজিয়মে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ বোদলেয়ার স্থির করলেন, তিনিও যাবেন। পাছে অনশনে মরতে হয়, এই আশঙ্কা বিকট হ'য়ে উঠেছে তখন; হয়তো বেলজিয়মে কিছু সুবিধে হ'তে পারে। ললিতকলার মন্ত্রীদপ্তরে পাথেয়র জন্য আবেদন পাঠালেন; নিজের পরিচয় দিলেন শিল্পসমালোচক ব'লে, বেলজিয়মের শিল্পকলা অধ্যয়ন করা তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য। চার দিনের মধ্যে উত্তর না-পেয়ে অধীর হ'য়ে আবার লিখলেন। পনেরো দিন পরে স্পষ্ট জবাব এলো : হবে না।

১৮৬৪ : বহু চেষ্টায় পাথেয় জুটিয়ে এপ্রিল মাসে বেলজিয়মে এলেন। পুলে মালাসী কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন : ২ মে তারিখে ব্রাসেল্‌সে প্রথম বক্তৃতা দিলেন : বিষয়, দ্যলাক্রোয়া। লোক মন্দ হ'লো না। দ্বিতীয় বক্তৃতায় বেশ ভিড় জমলো : বহু শিক্ষিকা, খাশ প্যারিসীয় উচ্চারণে ফরাশি ভাষা শোনার ও শোনাবার আশায়, তরুণী ছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত। সেদিনকার বিষয় : গোতিয়ে। বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে, পূর্বদিনের সৌজন্যের জন্য শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানালেন বোদলেয়ার; প্রসঙ্গত—কিংবা অপ্রাসঙ্গিকভাবে—একটি রসিকতা ক'রে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করলেন। মধ্য-বিশ শতকের ডিলান টমাস যখন বক্তৃতার প্রারম্ভে বলেন, 'প্রথমত, আমি একজন মাতাল; দ্বিতীয়ত, আমি একজন ওয়েলশীয়; আর তৃতীয়ত, আমি মানবজাতির প্রেমিক, বিশেষত নারীজাতির—' তখন য়োরোপীয় শ্রোতৃগণ সকলেই তা উপভোগ করে; কিন্তু মধ্য-উনিশ শতকে বোদলেয়ার যখন বললেন, 'আপনাদের বিশেশভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইজন্যে যে আপনাদের সঙ্গেই বক্তা হিশেবে আমার কৌমার্য নষ্ট হ'লো; আর এটি, অন্য রকম কৌমার্যের মতোই, বিনষ্ট হ'লে আক্ষেপ করার কিছু নেই—' তখন ঐ শিক্ষালাভেচ্ছু শিক্ষিকার দলে কী-রকম স্তব্ধতা নামলো তা অনুমান করা

কঠিন নয়। শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা হ্রাস পেতে-পেতে একজনের বেশি থাকলো না। সেই একজনের নাম কামিল লেমনিয়ে (Camille Lemonnier), তখন কুড়ি বছরের যুবক, দুই দশক পরে বেলজীয় সাহিত্যে তিনি নবজীবন আনেন। লেমনিয়ে-র আসতে দেরি হয়েছিলো; এসে দেখলেন ঘর শূন্য, গোধূলির ছায়া নেমেছে, কিন্তু বক্তা, যেন পরিবেশ বিষয়ে অচেতন অবস্থায় একটি শুভ্র সুন্দর হাত নেড়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করছেন— 'গোতিয়ে, আমার গুরু— আমার গুরু!' তরুণ লেখকের মনে সেদিন যে-আলোড়ন জেগেছিলো তিনি তা সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি।

'কৃত্রিম স্বর্গ' বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতার দিন বোদলেয়ার ভালো ক'রে কিছু বলতেই পারলেন না। পাঁচটি বক্তৃতা হবার কথা ছিলো, কিন্তু শেষ দুটির বিষয়ে কোনো দলিল নেই; হয়তো বা বাতিল করাই হয়েছিলো। সর্বসাকুল্যে পারিশ্রমিক পেলেন ১০০ ফ্রাঁ। বহু ব্যয় ক'রে একটা কবিতাপাঠের ব্যবস্থা করলেন, তাতেও নিমন্ত্রিতেরা অনেকেই অনুপস্থিত থাকলেন। সন্দেহ থাকলো না, বেলজিয়ম-যাত্রা প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে; কিন্তু এক প্রকাশকের দেখা পাবার আশায়, অথবা প্যারিসে আর মুখ দেখাবার উপায় নেই ব'লে, ব্রাসেল্‌সেই থেকে গেলেন।

১৮৬৫: জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন প্যারিসে ফিরে এলেন; সঙ্গে মালপত্র নেই, চেহারা আলুথালু। রেল-স্টেশন থেকে বেরোনোমাত্র দৈবাৎ তাঁকে দেখে ফেললেন তরুণ কবি কাতুল মঁদেস (Catulle Mendès)। তখন রাত; মঁদেস, তাঁকে নিঃসম্বল সন্দেহ ক'রে, নিজের বাসায় নিয়ে এলেন। বোদলেয়ার ব'সে-ব'সে কী যেন হিশেব করতে লাগলেন একমনে। মঁদেসের জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, 'প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে লিখছি, কত উপার্জন করেছি, জানো? আমার সব লেখা—কবিতা, গদ্য, অনুবাদ—সবসুদ্ধ্‌? ... পনেরো হাজার আটশো বিরেনব্বুই ফ্রাঁ, আর ষাট সঁতিম—ঐ ষাট সঁতিমটা ভুলো না!' উগো প্রভৃতির বিরাট উপার্জনের পাশে এই অঙ্ক দাঁড় করিয়ে মঁদেস মনে-মনে শিউরে উঠলেন। পরে বোদলেয়ার বলতে লাগলেন তাঁর কবিতার কথা: ভারতবর্ষ বিষয়ে দীর্ঘ একটি কবিতা লিখবেন, তাতে থাকবে 'চিরন্তন মধ্যদিনের শোচনীয় সৌন্দর্য, সূর্যের খেদময় প্রদীপ্তি, আর দিবালোকের জঘন্য ও পূজনীয়

প্রহারের তলে কুষ্ঠরোগের শব্দময় ত্যুতিপাত!' তাঁর মনোরম, সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে অনেকক্ষণ কথা বললেন; শুতে যাবার সময় হ'লো। রাত্রি যখন গভীর, মঁাদেস হঠাৎ জেগে উঠে শুনলেন পাশের ঘরে রোদন করছেন বোদলেয়ার, বৃথা চেষ্টা করছেন কান্না চাপা দিতে, এক অদম্য আর্তি শুব্ধতা ভ'রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। মঁাদেস কাছে যেতে সাহস পেলেন না; পরদিন সকালে দেখলেন বোদলেয়ার নেই, শুধু টুকরো কাগজে লেখা—'বিদায়।'

মাদাম ওপিক কিছু অর্থ দিলেন ছেলেকে; এক অন্যায় চুক্তিপত্র থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বোদলেয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একটা দিন গোষ্ঠীসুখে কাটালেন। এইটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ সুখের দিন। দু-দিন পরে ফিরে এলেন ব্রাসেল্‌সে, সেখানেও ঋণ জ'মে উঠছিলো। হোটেলে দাম দিতে পারেন না, শুধু আশা দেন। চুল ছাঁটার বা জুতোপালিশের পয়সা থাকে না পকেটে। সপ্তাহ, মাস কেটে যায়, নতুন ঋতু আসে; দারুণ দুশ্চিন্তার অবসান হয় না। আঁসেল টাকা পাঠান না, প্রকাশকরা নীরব। বৎসরান্তে ক্রিসমাসের চিঠিতে মা-কে লিখলেন: 'এককালে আমার উদ্যম ছিলো, বাচন ছিলো স্বাধীন। কখনো যদি সে-অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহ'লে এমন সব রচনায় আমার রোষের পরিতৃপ্তি ঘটাবো যা পাঠকের মনে ভক্তি ও ত্রাস জাগাবে। আমার বাসনা, সমগ্র মানবজাতিকে আমার বৈরী ক'রে তুলি।'

দেশত্যাগী উগো জার্স্‌নি দ্বীপ থেকে ব্রাসেল্‌সে এলেন। উগোর পূর্ব-রচনার ভক্ত ছিলেন বোদলেয়ার, তাঁকে একাধিক কবিতাও উৎসর্গ করেন; কিন্তু প্রবীণ উগোর অহমিকা ও আত্মবিজ্ঞাপনের অভ্যাসে বীতশ্রদ্ধ হন। তত্রাচ, এ-সময়ে উগোর ভবনে, তাঁর পত্নীর স্নেহযত্নের প্রভাবে, কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পান তিনি। এই বছরেই তরুণ মালার্মে, তাঁর একটি গদ্যকবিতায়, বোদলেয়ারকে প্রণাম জানালেন, আর ভের্লেন, এক অজ্ঞাতনামা যুবক, 'লে ফ্ল্যর'-র সমালোচনা-প্রসঙ্গে বোদলেয়ারকে বললেন 'মহাকবি', 'এক ঘন, নমনীয় ও অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন কাব্য-রীতির অধিকারী।' এই সব রচনা বোদলেয়ার দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর 'সন্তান'দের এই সব অভিনন্দন তাঁকে প্রীত করেছিলো এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মা খুশি হবেন ভেবে ভের্লেনের প্রবন্ধ দুটি

মাদাম ওপিককে পাঠিয়ে সঙ্গের পত্রে বোদলেয়ার লিখলেন : 'এ-সব ছোকরাদের প্রতিভা আছে, কিন্তু বড্ড বাজে বকে! কী অতিকথন, কী ছেলেমানুষি মোহগ্রস্ত অবস্থা!... সবচেয়ে ভয়ের কথা হ'লো অনুকারক, আর একা হ'তে সবচেয়ে ভালোবাসি আমি। কিন্তু তা সম্ভব নয়; মনে হয় বোদলেয়ার-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে।' ইতিহাসের একটি কৌতুক এই যে শ্রেষ্ঠ কবিরাও পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদের সব সময় চিনতে পারেন না, অগ্রজ মাঝারি লেখক স্যাঁৎ-ব্যভদের প্রশংসার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন।

প্যারিস থেকে খবর এলো, জ়ান দ্যুভাল অন্ধ হ'য়ে যাচ্ছেন। বোদলেয়ার স্মৃতি থেকে তাঁর একটি রেখাচিত্র আঁকলেন। একটি গন্ত-কবিতা ছাড়া, এ-বছর রচনাকর্ম প্রায় কিছুই হ'লো না। আমোদ-প্রমোদে রুচি হারালেন; 'উন্মোচিত হৃদয়ে'র কয়েকটি অংশ লেখা হ'লো।

'অন্তরঙ্গ ডায়েরি' তিন খণ্ডে বিভক্ত; তার মধ্যে 'স্ফুলিঙ্গ' অংশের আনুমানিক রচনাকাল ১৮৫৫ থেকে '৬২; 'উন্মোচিত হৃদয়ে'র, ১৮৫৯ থেকে '৬৪; আর 'প্রণয়বিষয়ে' অংশটি তাঁর প্রথম পর্যায়ের অন্ততম রচনা।

১৮৬৬ : বেলজিয়মে 'বেওয়ারিশ মাল' (*Les Épaves*) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। নতুন রচনাগুচ্ছের সঙ্গে ফ্রান্সে দণ্ডিত ছয়টি কবিতা সংযুক্ত হ'লো। 'লে ফ্ল্যর'-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রস্তুতিতে হাত দিলেন। 'ল্য পার্নাস কঁতেঁপরেন'-এ পনেরোটি কবিতার প্রকাশ, তার মধ্যে ছিলো 'গহ্বর', 'ঢাকনা' ও 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা'।

জানুয়ারি মাসে পীড়ায় শয্যাশায়ী; সাময়িক আরোগ্য। ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে রোগলক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে মা-কে লিখলেন : 'ডাক্তার "হিস্টিরিয়া" শব্দটি উচ্চারণ করলেন। তার মানে : আমি হাল ছাড়লাম।' প্যারিসের বিখ্যাত প্রকাশক গার্নিয়ে, বহুদিন অপেক্ষায় রাখার পর, জানালেন যে বোদলেয়ারের কোনো গ্রন্থ তিনি গ্রহণ করবেন না। মার্চ মাসে প্যারিসে ফিরে যাওয়া স্থির ক'রে, বোদলেয়ার দুই বন্ধুর সঙ্গে নামুর-এ এলেন, সেখানকার বিখ্যাত গির্জে আর-একবার দেখার জন্ত। মন্দিরের শিল্পকর্ম বিষয়ে আবেগভরে কথা বলতে-বলতে, হঠাৎ ট'লে উঠে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে ব্রাসেলসে ফিরিয়ে আনা হ'লো, ২০ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত পক্ষাঘাতে অচল। শুয়ে-শুয়ে, মৌখিক

নির্দেশের সাহায্যে, 'ল্য পার্নাস কঁতেঁপরেন'-এ প্রকাশিতব্য কবিতাগুচ্ছের প্রুফে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংশোধন করালেন। ৩০ মার্চ তারিখে জীবনের শেষ পত্র দুটি লিখিয়ে নিলেন একই উপায়ে। একটি আঁসেলকে, অন্যটি মা-কে পাঠানো হ'লো। দ্বিতীয় আঘাতে বাক্‌শক্তি রহিত।

৩ এপ্রিল: আঁসেল, খবর পাওয়ামাত্র, ব্রাসেল্‌সে ছুটে এলেন; বোদলেয়ারকে একটি নার্সিং হোমে সরানো হ'লো। নার্সিং হোমটির রাস্তার নাম 'ভস্ম-পথ' (rue des cendres), তার পরিচালক এক ধর্মভীরু সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়। এখানে এসে বোদলেয়ারের অঙ্গাদি কিছু সচল হ'লো, কিন্তু বাক্‌শক্তির ব্যবহার ফিরে পেলেন না। একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন—'sacré nom' ('পুণ্য নাম') —শব্দটি একটি ব্যবহারিক শপথবুলি, যার মূল অর্থ, ইংরেজি 'bloody' শব্দের অর্থের মতোই, অতি মহান। সন্ন্যাসিনীরা সাহিত্যের কোনো খবর না-রাখলেও, শয়তানের চেলা হিশেবে বোদলেয়ারের কুখ্যাতি শুনেছিলেন; ঐ শব্দটি শোনামাত্র বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে নতজানু হ'য়ে কাঁপতে থাকেন তাঁরা। বোদলেয়ার ঐ আবাস ছেড়ে যাবার পরে সেটিকে পূত সলিলে প্রক্ষালন করা হয়েছিলো—যাতে শয়তানের কোনো প্রভাব সেখানে টিকে না থাকে।

ওখান থেকে তাঁকে হোটেলে সরালেন মাদাম ওপিক, আঁসেল প্যারিসে ফিরে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হোটেলে এসে বোদলেয়ার আর-একটু সুস্থ হলেন; লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেও পারেন আস্তে-আস্তে। বন্ধুরা চাঁদা তুলে ট্রেনের কামরা রিজার্ভ ক'রে দিলেন; দোসরা জুলাই ফিরে এলেন প্যারিসে। পুরোনো বন্ধুরা স্টেশনে উপস্থিত; আসলিনো বোদলেয়ারকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বোদলেয়ার, বাক্যহারা, হেসে উঠলেন হো-হো ক'রে; কণ্ঠের আর-কোনো ব্যবহার তাঁর জানা নেই তখন। 'কখনও প্রীত হ'তে শিখিনি, তাই / আমার আছে শুধু অট্টহাসি—' এই দারুণ উক্তি এইভাবে সত্য হ'লো।

একটি নার্সিং হোমের একতলার ঘরে তাঁকে রাখা হ'লো—সে-ই তাঁর শেষ আবাস। তাঁর প্রিয় বইগুলিকে আনিয়ে নেয়া হ'লো, দেয়ালে ছবি, সামনে বাগান। রোজ আসেন আসলিনো, বাঁভিল, নাদার; এক স্নেহপ্রবণ মধ্যবয়সী মহিলা মাঝে-মাঝে হ্বাগনারের

সংগীত শুনিয়ে যান। নিজে কিছু বলতে না-পারলেও, সাগ্রহে শোনেন বন্ধুদের কথাবার্তা; কদাচিৎ হেঁটেও বেড়াতে যান বাইরে, কোনো বন্ধু হয়তো তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। ইঙ্গিতে বোঝান, নার্সিং হোমে তাঁর দৈহিক সংস্কার যথোপযুক্ত হয় না; বন্ধুরা তাঁর হাত ধুইয়ে দিয়ে আঙুলের নখ কেটে ও পালিশ ক'রে দিলে প্রীতিপ্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ড্যাণ্ডীজ্‌ম তাঁকে ত্যাগ করেনি; তাঁর মনীষিতাও না। পো, হ্বাগনার, দ্যলাক্রোয়া, মানে—এঁদের বিষয়ে এখনো যে তাঁর উৎসাহ উজ্জ্বল, বন্ধুরা তা বুঝতে পারেন। নাদার লিখে গেছেন, একবার তাঁর সঙ্গে আত্মার অমরতা বিষয়ে 'নিঃশব্দে' দীর্ঘ আলাপ করেছিলেন বোদলেয়ার। চিকিৎসকগণ আরোগ্যের আশা দিচ্ছেন।

সাহিত্যিক বন্ধুরা যৌথভাবে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন করলেন: বোদলেয়ারকে সরকারি তহবিল থেকে কিছু অর্থসাহায্য করা হোক। আবেদনের সমর্থনস্বরূপ উল্লেখ করা হ'লো—তাঁর কবিতা নয়, প্রবন্ধ ও পো-অনুবাদ। সঁ্যাৎ-ব্যভ শংসাপত্রে এ-কথাটিও উল্লেখ করতে ভুললেন না যে আবেদনকারীর মাতা এক ভূতপূর্ব রাজদূতের বিধবা। মেরিমে লিখলেন—'কোনো সাহিত্যিক কখনো এত কষ্ট পাননি, এখন মন্ত্রীমশায়ের যদি দয়া হয়।' মন্ত্রীমশায়ের দপ্তর থেকে মঞ্জুর করা হ'লো—৫০০ ফ্রাঁ!

১৮৬৭: মে মাসে অবস্থা খারাপ হ'লো। ব্রাসেল্‌স থেকে ফেরার পর, বোদলেয়ার তাঁর মা-কে যেন সহ্য করতে পারছিলেন না, ডাক্তারের উপদেশমতো তিনি অঁফ্লারে ফিরে গিয়েছিলেন। এবার খবর পেয়ে প্যারিসে এসে কাছাকাছি এক হোটেলে উঠলেন। তখন বোদলেয়ার আয়নায় নিজের মুখ চিনতে পারেন না, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি ভেবে বিনীত নমস্কার করেন। নিজের নাম ভুলে গেছেন, স্বরচিত কোনো গ্রন্থ দেখে-দেখে বহু কষ্টে আঁকতে চেষ্টা করেন অক্ষরগুলি; কখনো নিজেকে কল্পনা করেন নের্ভাল ব'লে। দাড়ি কামান না, চুল আঁচড়ান না, শুভ্র হাত দুটি কোলে রেখে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকেন সারাদিন। গাল ভাঙা, গাত্রবর্ণ ধূসর, শুধু চক্ষু দুটি দীপ্যমান। জুন মাসে শয্যা নিলেন।

মৃত্যু আসন্ন ব'লে বোঝা গেলো, কিন্তু অগস্ট মাস পর্যন্ত আয়ুর অবসান হ'লো না। শেষ সপ্তাহটিতে, মাদাম ওপিক নিরন্তর কাছে

থাকলেন। তখন আর বোদলেয়ারের জ্ঞান নেই, খোলা চক্ষু দৃষ্টিহীন। কেউ-কেউ বলেন, মৃত্যুর দু-দিন আগে জ্ঞান ফিরে আসে, ধর্মীয় শেষ সংস্কার প্রার্থনা করেন। সংক্রিয়ার পরে, নিজের সর্বাঙ্গে ক্রুশচিহ্ন এঁকে বার-বার 'সাক্রে নঁ' শব্দটি উচ্চারণ করেন, এই রকমও কথিত আছে। কোনো-কোনো সমালোচক মুমূর্ষুর এই আচরণকে খুব বড়ো ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, যেন এই শেষ মুহূর্তের 'ধর্মভাবে'র উপর তাঁর সাহিত্যের মূল্য নির্ভর করছে। কিন্তু আমরা যারা ধর্মতত্ত্ব জানি না, শুধু কবিতা ভালোবাসি, আমাদের মনে হয় যে বোদলেয়ার স্বভাবতই ছিলেন গভীরতম অর্থে ধর্মপ্রবণ : যিনি শয়তানে বিশ্বাস করেন তাঁর পক্ষে ভগবানে বিশ্বাস কি অনিবার্য নয়?

৩১ অগস্ট তারিখে বেলা প্রায় এগারোটার সময়, মা-র কোলে মাথা রেখে তাঁর মৃত্যু হ'লো। মৃতের মুখে সরল হাসি, মাতা বহুকাল পরে পুত্রকে ফিরে পেলেন। ছেচল্লিশ বছর চার মাস তাঁর বয়স তখন; সমগ্র রচনার অর্ধাংশমাত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গির্জেয় পারলৌকিক ক্রিয়ায় একশো জনও উপস্থিত থাকলেন না, মঁপার্নাসের কবরখানায় পঞ্চাশ জনও জুটলো কিনা সন্দেহ। এর কারণস্বরূপ কেউ-কেউ বলেছেন যে বোদলেয়ারের মৃত্যু হয়েছিলো শনিবারে, এবং অগস্ট মাস গ্রীষ্মাবকাশের সময়—তখন অনেকেই প্যারিসের বাইরে চ'লে যান। কিন্তু ১৯৫৪ সালের অগস্ট মাসে ঔপন্যাসিকা কলেৎ-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন, তুমুল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও, পাঁচ হাজার প্যারিসবাসী একত্র হয়েছিলো কবরখানায়। অমরতা ও লৌকিক খ্যাতিতে প্রভেদ দুস্তর।

দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখে মৃতের সৎকার। সে-উপলক্ষে বক্তৃতা করার জন্য সাঁাৎ-ব্যভকে অনুরোধ করা হ'লো: তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। প্যারিসের সাহিত্য-পরিষদ (Le Société des Gens de Lettres) কোনো প্রতিনিধি পাঠালেন না। গোতিয়ে, বোদলেয়ার মুমূর্ষু জেনেও, এক প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চ'লে গিয়েছিলেন জেনিভায়। সাহিত্যিকদের উদাসীনতায় কুপিত হ'য়ে, শোকার্ত বাঁভিল গলদশ্রুস্বরে নিবেদন করলেন তাঁর প্রেম, শ্রদ্ধা ও বন্ধুতা। বললেন, '"লে ফ্ল্যর দ্যু মাল" এক প্রতিভার প্রসূন; তা নিতান্ত ফরাশি, নিতান্ত মৌলিক ও নিতান্ত নূতন।' তারপর আসলিনো, বহু কষ্টে অশ্রুবেগ সংবরণ ক'রে, আরম্ভ করলেন বন্ধুর গুণগান—কত ভুল বুঝেছে তাঁকে

লোকেরা, কী উদার ও কোমল ছিলো তাঁর হৃদয়, কী মহৎ ছিলো চরিত্র, তাঁর অভাবে কেমন শূন্য ও অর্থহীন হ'য়ে যাবে তাঁর বন্ধুদের জীবন। কিন্তু বলতে-বলতে হঠাৎ লক্ষ করলেন ক্ষীণ জনতা ক্ষীণতর হয়েছে, গুমোট ভেঙে শুরু হয়েছে মুষলধারা, লোকেরা ব্যস্ত হ'য়ে উঠছে পাছে রেশমি টুপি বৃষ্টিতে নষ্ট হয়। শোকে ও লজ্জায় অভিভূত, আসলিনো অকস্মাৎ বক্তৃতা থামালেন, কফিনের উপর মাটি চাপা দিতে তারপর আর বেশিক্ষণ লাগলো না। পরের দিন 'লা প্রেস' পত্রিকায় যে-'শোকসংবাদ' বেরোলো তাও নির্বুদ্ধিতার একটি উদাহরণ।

নবেম্বর মাসে বোদলেয়ারের গ্রন্থসমূহ নিলেমে উঠলো। মিশেল লেভি সমগ্র রচনাবলি কিনে নিলেন; মেয়াদ, পঞ্চাশ বৎসর। মূল্য দিলেন ১৭৫০ ফ্রাঁ, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ন-শো টাকা মাত্র।

১৮৬৮: লেভির সমগ্র-সংস্করণের প্রকাশ আরম্ভ। ভূমিকা লিখলেন গোতিয়ে। 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল'-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো, এবং একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ।

১৮৬৯: আসলিনো তাঁর বোদলেয়ার-জীবনী প্রকাশ করলেন। গদ্যকবিতার সংগ্রহ প্রকাশিত হ'লো, তাতে কবির স্বদত্ত 'স্প্লীন দ্য পারী' নাম রাখা হ'লো না। নূতন নামকরণ—'ছোটো-ছোটো গদ্যকবিতা' (*Petits Poèmes en prose*)।

১৮৭১: আর্তুর র‍্যাঁবো ১৫ মে তারিখে এক পত্রে লিখলেন, 'বোদলেয়ার ··· প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, এক **সত্য দেবতা**!'

১৮৯১: ইয়েটস ও আর্নেস্ট রীস লণ্ডনে 'রাইমার্স ক্লাব' স্থাপন করলেন: তাঁদের উদ্দেশ্য—'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে, লিখতে হবে কাতুল্লুস, ভের্লেন ও বোদলেয়ারের মতো।'

১৯০২: মঁপার্নাস কবরখানায় বোদলেয়ারের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত।

কবিতার সূচি

(বোদলেয়ার যে-সব কবিতার নামকরণ করেননি তার প্রথম পঙক্তি উদ্ধৃত হ'লো)